আনন্দ

গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক—

রাহুল চরিত

অজাতশত্রু

বিমান বত্থু

ধর্মপদার্থকথা

বিনয় পরাজিকা

বিশাখা

জীবক

বৌদ্ধ-নীতিমঞ্জরী

Printed for free distribution by
The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation
11F., 55 Hang Chow South Road Sec 1, Taipei, Taiwan, R.O.C.
Tel: 886-2-23951198 , Fax: 886-2-23913415
Email: overseas@budaedu.org
Website:http://www.budaedu.org
This book is strictly for free distribution, it is not for sale.
এই বই সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বিতরণের জন্য, বিক্রয়ের জন্য নহে।

উৎসর্গ

পরমারাধ্য গুরু-আচার্য প্রবর
রেঙ্গুন ষষ্ঠ সঙ্গীতি-কারক
ত্রিপিটক বিশোধক
শ্রীমৎ প্রজ্ঞালোক মহাস্থবিরকে
১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে বার্মা সরকার
কর্তৃক সগৌরবে প্রদত্ত
'অগ্রমহাপণ্ডিত'
অভিধা স্মরণে

শীলালঙ্কার মহাস্থবির

প্রাপ্তিস্থান

শ্রী শীলালঙ্কার মহাস্থবির
বৈদ্যপাড়া শাক্যমুনি বিহার
পোঃ সরোয়াতলী, চট্টগ্রাম।

শ্রীমৎ লোকানন্দ স্থবির
সাং জাঁহাপুর (কোর্টের পাড়)
পোঃ ফতেপুর, চট্টগ্রাম।

শ্রীমৎ শীলানন্দ ভিক্ষু
সাং রাউজান
পোঃ রমজান আলী হাট, চট্টগ্রাম।

শ্রীমৎ গিরিমানন্দ স্থবির
বিনাজুরী শান্তিনিকেতন
পোঃ বিনাজুরী, চট্টগ্রাম।

শ্রীমৎ সুবিমল মহাস্থবির
সৈদবাড়ী ধর্মচক্র বিহার
পোঃ রাঙ্গুনীয়া, চট্টগ্রাম।

শ্রীমৎ ধর্মসেন স্থবির
উনাইনপুরা লঙ্কারাম
পোঃ মৌলবীহাট, চট্টগ্রাম।

শ্রীমৎ ধর্মরক্ষিত স্থবির
পূর্ব সাতবাড়ীয়া
পোঃ হাজিরপাড়া, চট্টগ্রাম।

শ্রীমৎ জিনরত্ন স্থবির
ফতেনগর বিহার
পোঃ জোয়ারা, চট্টগ্রাম।

পাকিস্তান কো-ওপারেটিব বুক-
সোসাইটি লিঃ, জুবিলি রোড, চট্টগ্রাম।

শ্রীযুত বিধুভূষণ বড়ুয়া (মার্চেন্ট)
আছদগঞ্জ, লামার বাজার, চট্টগ্রাম।

শ্রীমৎ সত্যপ্রিয় স্থবির
মেরংলোয়া সীমাবিহার
পোঃ রামু, চট্টগ্রাম।

শ্রীমৎ আনন্দ স্থবির
দমদমা অভয় বিহার
পোঃ কমলদহ, চট্টগ্রাম।

শ্রীমৎ জ্ঞানশ্রী স্থবির
বোয়ালখালী দশবল রাজ বিহার
পোঃ দীঘিনালা, পার্বত্য চট্টগ্রাম।

শ্রী ভূপতি রঞ্জন বড়ুয়া
ম্যানেজার ষ্টুডেন্ট লাইব্রেরী
পোঃ তবলছরী, রাঙ্গামাটী।

ভূমিকা

নমো তস্স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্স

১

ভগবান গৌতমবুদ্ধ বলিয়াছেন---

"কোলিতো উপতিস্সো চ দ্বে ভিক্খূ অগ্গসাবকা,
আনন্দ নামুপট্ঠাকো সন্তিকাবচরো মম।"

(বুদ্ধ বংসো)

কোলিত (মৌদ্গল্যায়নের পূর্বাশ্রমের নাম) ও উপতিষ্য (সারীপুত্রের পূর্বাশ্রমের নাম)---এই দুইজন ভিক্ষু আমার অগ্রশ্রাবক। আর ভিক্ষু আনন্দ আমার সহচর-সেবক (উপস্থায়ক)।

ভগবান বুদ্ধের অগণিত শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে ৮০ জন ছিলেন 'মহাশ্রাবক'। বৌদ্ধশাস্ত্রে তাঁহাদের নামের তালিকা পাওয়া যায়। ইঁহারা সকলেই বুদ্ধপ্রদর্শিত 'আর্য অষ্টাঙ্গিকমার্গ' অনুসরণে আশ্রব বা বাসনাক্ষয় করিয়া 'অর্হৎ' পদবাচ্য হইয়াছিলেন। মহাশ্রাবকগণের সকলেই অর্হত্ত্ব লাভ করিলেও ইঁহাদের মধ্যেও আবার গুণোৎকর্ষের তারতম্য হেতু প্রভেদ দৃষ্ট হয়। উক্ত অশীতি মহাশ্রাবকের মধ্যে সারীপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন 'অগ্রশ্রাবক' নামে খ্যাত। সুদীর্ঘকালব্যাপী জন্মান্তরীণ সাধনাদ্বারা ক্রমে ক্রমে পরিপক্বতা লাভ না করিয়া কেহ অগ্রশ্রাবকের পদলাভ করিতে পারেন না। বৌদ্ধ-শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে---আনন্দও বহু জন্ম-জন্মান্তর সাধনা করিয়া ভগবান গৌতম বুদ্ধের 'উপস্থায়ক' বা সহচর সেবকের পদাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ভগবান তথাগত জেতবনে আর্যভিক্ষুসংঘের অধিবেশনে শিষ্য আনন্দকে

নিম্নোক্ত পাঁচটি বিষয়ে ভিক্ষুগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া ঘোষণা করেন---
"পাণ্ডিত্য, অপ্রমাদ, গতি, ধৃতি ও সেবাপরায়ণতায় আনন্দ অদ্বিতীয়।"
(অঙ্গুত্তর নিকায়, ১ | ২৪)

মহাস্থবির আনন্দের পরিনির্বাণ উপলক্ষ্যে ভিক্ষুসংঘ প্রশস্তিমূলক যে গাথা ভাষণ করিয়াছিলেন, তাহাতে তদীয় জীবন ও চরিতের সুন্দর সুস্পষ্ট পরিচয় রহিয়াছে---

"বহুস্সুতো ধম্মধরো কোসারক্খো মহেসিনো,
চক্খু সব্বস্স লোকস্স আনন্দ পরিনিব্বুতো।"

যিনি ছিলেন বহুশ্রুত, ধর্মধর, মহর্ষি বুদ্ধের জ্ঞান-ভাণ্ডারের রক্ষক, যিনি ছিলেন সর্বলোকের চক্ষুস্বরূপ, সেই আনন্দ পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

"গতিমন্তো সতিমন্তো ধিতিমন্তো চ যো ইসি,
সদ্ধম্মধারকো থেরো আনন্দো রতনাকরো।"

যে ঋষি ছিলেন গতিমান* স্মৃতিমান, ধৃতিমান ও সদ্ধর্মের ধারক এবং যিনি ছিলেন ধমরত্নের আকর, সেই স্থবির আনন্দ পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন।
(থেরগাথা)

২

আনন্দ ছিলেন গৌতম বুদ্ধের পিতৃব্যপুত্র। তাঁহার জন্মগ্রহণে জ্ঞাতিবর্গের অন্তরে বিশেষ আনন্দ উৎপন্ন হওয়ায় নাম রাখা হয় 'আনন্দ'।

গৌতম বুদ্ধ সম্বোধিলাভ ও ধর্মচক্র প্রবর্তন করিয়া যখন কপিলবাস্তুতে উপস্থিত হন, সেই সময় ভদ্রিক, অনুরুদ্ধ, ভৃগু, কিম্বিল, দেবদত্ত প্রভৃতি

*"অযমেব চাযস্মা একপদে ঠত্বা সঠ্ঠিপদ সহস্সানি গণ্হন্তো সত্থারা কথিত নিযমেনেব সব্বপদানি জানাতি, তস্মা গতিমন্তানং অগ্গো নাম জাতো।" এই আয়ুষ্মানই (আনন্দই) একপদে (বাক্যে) স্থিত হইয়া ষাটি হাজার পদ গ্রহণ (উপলব্ধি) করত: শাস্তার কথিত নিয়মেই (শাস্তার উদ্দেশ্য বা মনোভাব অনুযায়ীই) সর্বপদ (দ্রুতগতিতে) জ্ঞাত হইতেন, তাই তিনি 'গতিমানদের অগ্র' এই অভিধায় অভিহিত হইয়াছেন।

(মনোরথ পূরণী)

শাক্যরাজকুমারগণের সহিত আনন্দও ভগবান তথাগতের নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বুদ্ধাঙ্কুর গৌতম বুদ্ধত্ব লাভের পর বিশবৎসর পর্যন্ত তাঁর নির্দিষ্ট সেবক কেহই ছিলেন না। ভিক্ষু নাগসমাল, নাগিত, উপবান, সুনক্ষত্ত, চুন্দ, সাগত, মেঘিয় প্রভৃতি ভিক্ষুগণ---একের পর আর একজন তাঁহার সেবা করিতেন বটে, কিন্তু পুনঃ পুনঃ সেবক পরিবর্তনের দ্বারা সেবাকার্য সুষ্ঠুরূপে চলিত না। শাস্তা এই সময় ৫৬ বৎসর বয়সে পদার্পণ করিয়া একজন স্থায়ী সেবকের প্রয়োজন অনুভব করিতেছিলেন। একদা মূলগন্ধ কুটীরে ভিক্ষুগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় শাস্তা তাঁহাদিগকে জানাইলেন---"ভিক্ষুগণ, আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, এখন আমার একজন স্থায়ী সেবকের প্রয়োজন।" সারীপুত্র, মৌদ্‌গল্যায়ন প্রভৃতি প্রধান শিষ্যগণ একে একে স্থায়ী সেবকের পদ প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু সুগত তাঁহাদের কাহাকেও অনুমতি দিলেন না। আনন্দ নীরবে এককোণে বসিয়াছিলেন, তিনি প্রার্থী হন নাই। ভিক্ষুগণ আনন্দকে ঐ পদের জন্য প্রার্থনা করিতে অনুরোধ করিলে তিনি উত্তর দিলেন---"আমি কেন যাচ্ঞা করিয়া সেবক হইতে যাইব? শাস্তা কি তাঁহার উপযুক্ত সেবক বাছিয়া নিতে জানেন না?" তখন তথাগত শিষ্যগণকে বলিলেন---"ভিক্ষুগণ, আনন্দকে পীড়া-পীড়ি করিবার প্রয়োজন নাই, সে নিজে বুঝিয়াই আমার সেবা করিবে।"

গৌতম বুদ্ধের নিত্য সেবার দুর্লভ অধিকার লাভ করিয়া আয়ুষ্মান আনন্দ ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সহিত তাহা পরিপালন করিতে লাগিলেন। কথিত আছে—তিনি প্রত্যহ তথাগতের ব্যবহারের জন্য দ্বিবিধ জল (উষ্ণোদক ও শীতোদক) ও ত্রিবিধ দন্তকাষ্ঠ যোগাইতেন, চরণ-যুগল প্রক্ষালন করিয়া দিতেন, পৃষ্ঠ পরিকর্ম করিতেন এবং গন্ধকুটী বিহার সম্মার্জন করিতেন। কোন্ সময় শাস্তার কোন্ দ্রব্যের প্রয়োজন হইবে, তাহা ভাবিয়া-চিন্তিয়া যথাস্থানে যথাকালে রাখিয়া দিতেন। দিবসে নিকটে অবস্থান করিতেন এবং রাত্রিকালে গন্ধকুটী বিহারের চতুর্দিকে দণ্ড ও প্রদীপ হস্তে নয়বার প্রদক্ষিণ করিতেন, ভগবান যখন ডাকিবেন,

তখনই যেন উপস্থিত হইতে পারেন এবং যাহাতে তন্দ্রাভিভূত হইয়া না পড়েন, সেজন্যই পরিক্রমা করিতেন।

শাস্তা ৮০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে পরিনির্বাণ লাভ করেন। আনন্দ দীর্ঘ ২৫ বৎসর কাল অতন্দ্রিত ভাবে যেরূপ ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সহিত তথাগতের সেবা-পরিচর্যা করিয়াছিলেন, তাহার দৃষ্টান্ত বিরল। স্বরচিত তিনটি গাথায় আনন্দ তাঁহার কায়মনোবাক্যে গুরুসেবার কথা এই ভাবে প্রকাশিত করিয়াছেন---

"পন্নবীসতি বস্সানি ভগবন্তং উপট্ঠহিং,
মেত্তেন কাযকম্মেন ছাযা'ব অনুপাযিনী।"

আমি পঞ্চবিংশতি বর্ষ যাবৎ মৈত্রীপূর্ণ কায়িক কর্মদ্বারা ভগবানের সেবা করিয়াছি এবং ছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুগমন করিয়াছি।

"পন্নবীসতি বস্সানি ভগবন্তং উপট্ঠহিং,
মেত্তেন বচীকম্মেন ছাযা'ব অনুপাযিনী।"

আমি পঞ্চবিংশতি বর্ষ যাবৎ মৈত্রীপূর্ণ বাচিক-কর্মদ্বারা ভগবানের সেবা করিয়াছি এবং ছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুগমন করিয়াছি।

"পন্নবীসতি বস্সানি ভগবন্তং উপট্ঠহিং,
মেত্তেন মনোকম্মেন ছাযা'ব অনুপাযিনী।"

আমি পঞ্চবিংশতি বর্ষ যাবৎ মৈত্রীপূর্ণ মানস-কর্মদ্বারা ভগবানের সেবা করিয়াছি এবং ছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুগমন করিয়াছি।

(থেরগাথা)

পরিনির্বাণ শয্যায় শায়িত স্বয়ং তথাগত বুদ্ধ আনন্দের গুরুসেবার মাহাত্ম্য ঘোষণা করিয়া বলিয়াছেন---"দীঘরত্তং খো তে আনন্দ, তথাগতো পচ্ছুপট্ঠিতো মেত্তেন কাযকম্মেন হিতেন সুখেন অদ্বযেন অপ্পমানেন, মেত্তেন মনোকম্মেন হিতেন সুখেন অদ্বযেন অপ্পমানেন। কতপুঞ্ঞো'সি ত্বং আনন্দ, পধানং অনুযুঞ্জ, খিপ্পং হোহিসি অনাসবো'তি।"

(মহাপরিনির্বাণ সূত্র ৫ | ১৪)

আনন্দ, তুমি দীর্ঘকাল আমার নিকট অবস্থান করিয়াছ, দীর্ঘকাল প্রেমপূর্ণ হিত-সুখকর দ্বিধাভাব রহিত অপরিমেয় কায়িক, বাচনিক ও মানসিক কর্মদ্বারা আমার পরিচর্যা করিয়াছ। আনন্দ, তুমি কৃতপুণ্য, সাধনে একনিষ্ঠ হও, অচিরে তুমি আশ্রবসমূহ হইতে মুক্ত হইবে (অর্থাৎ অর্হত্ব লাভ করিবে)।

অনন্তর ভগবান বুদ্ধ ভিক্ষুসংঘকে সম্বোধন করিয়া সর্বজন সমক্ষে আয়ুষ্মান আনন্দের গুণানুবাদ করিতে লাগিলেন---"ভিক্ষুগণ, আমি যেমন আনন্দকে সেবকরূপে লাভ করিয়াছি, অতীত কালে যেসমুদয় অর্হৎ সম্যক্ সম্বুদ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহাদেরও এইরূপ এক একজন সেবক ছিল। ভবিষ্যতে যে সকল অর্হৎ সম্যক্ সম্বুদ্ধ হইবেন, তাঁহাদেরও এইরূপ এক একজন সেবক থাকিবে।

ভিক্ষুগণ, আনন্দ পণ্ডিত ও মেধাবী। তথাগতের দর্শনজন্য কাহার পক্ষে কোন্ সময়টি উপযুক্ত, তাহা আনন্দ বিশেষ ভাবে অবগত আছে। তদনুসারে ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, উপাসক, উপাসিকা, রাজা, রাজামাত্য, তৈর্থিক এবং তৈর্থিকশিষ্যগণকে তথাগতের নিকট যথাসময়ে সে উপস্থিত করিয়াছে।

ভিক্ষুগণ, আনন্দের চারিটি আশ্চর্য অদ্ভুতগুণ আছে। কি কি? যদি ভিক্ষুপরিষদ আনন্দকে দর্শন করিতে আসে, তবে তাহাকে দর্শন করিয়াই তাহারা প্রীত হয়; তদুপরি আনন্দ যদি ধর্মভাষণ করে, তবে তাহার ভাষণ শ্রবণেই তাহারা প্রীত হয়। তাহাকে দর্শনে, তাহার ভাষণ শ্রবণে ভিক্ষুদের সাধ মিটে না। তাহাদের অতৃপ্ত অবস্থাতেই আনন্দ নীরবতা অবলম্বন করে। তথা ভিক্ষুণী, উপাসক ও উপাসিকা পরিষদও তাহার উক্ত চারিটি আশ্চর্য-অদ্ভুতগুণে আকৃষ্ট। ভিক্ষুগণ, রাজচক্রবর্তীর নিকটই শুধু এই আশ্চর্য-অদ্ভুতগুণ চতুষ্টয় বিদ্যমান থাকে।"

ভগবান তথাগত কর্তৃক এইভাবে প্রশংসিত হইয়া আয়ুষ্মান আনন্দ চিরকালের জন্য বিশ্ববাসীর নিকট প্রশংসনীয় হইয়া রহিলেন। আনন্দ এতকাল নীরবে অতন্দ্রিতভাবে যে গুরুসেবা করিয়া আসিয়াছেন, তজ্জন্য

পরিনির্বাণ লাভের প্রাক্কালে সম্বুদ্ধ স্বয়ং প্রকাশ্যভাবে আনন্দের মহিমা ঘোষণা করিয়া তাঁহাকে বিশ্বজগতে অমরত্ব দান করিয়া গেলেন।

৩

সম্যক্ সম্বুদ্ধের তিরোধানে আনন্দের অন্তররাজ্যে এবং বাহ্যজগতে যে দারুণ বিপ্লব ও বিপর্যয় সৃষ্টি হইয়াছিল, তিনি একটি মাত্র গাথায় সুনিপুণ শিল্পীর মত তাহার একটি রেখাচিত্র আঁকিয়া দিয়াছেন---

"তদাসি যং ভীসনকং তদাসি লোমহংসনং,
সব্বাকারবরূপেতে সম্বুদ্ধে পরিনিব্বুতে।"

সর্ববিধ শ্রেষ্ঠগুণসম্পন্ন সম্যক্ সম্বুদ্ধ যৎকালে পরিনিবাণ প্রাপ্ত হইলেন, সে সময় ভীষণ ভূমিকম্প ও অশনিপাতে সকলেরই লোমহর্ষণ হইয়াছিল।

(থেরগাথা)

নিত্য সেবক ও সহচর আনন্দ ভগবানের পরিনির্বাণে অনাথ বালকের মত ক্রন্দন করিয়াছিলেন---

"অহং সকরণীযোম্হি সেক্খো অপ্পত্ত মানসো,
সত্থু চ পরিনিব্বানং যো অম্হং অনুকম্পকো।"

এখনও আমার কর্তব্য অসমাপ্ত রহিয়াছে, এখনো আমি অপরিণতমনাঃ শিষ্যমাত্র। যিনি সর্বদা আমার প্রতি অনুগ্রহ পরায়ণ ছিলেন, সেই শাস্তা পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইলেন।

"বুদ্ধস্স চংকমন্তস্স পিট্ঠিতো অনুচংকমিং,
ধম্মে দেসিযমানম্হি ঞাণং মে উদপজ্জথ।"

যখন ভগবান পায়চারি করিতেন, আমিও তাঁহার পিছনে পিছনে পায়চারি করিতাম। যখন তিনি ধর্মদেশনা করিতেন, তখন আমার জ্ঞান উৎপন্ন হইত।

(থেরগাথা)

সম্বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর হইতে প্রথম সঙ্গীতির অধিবেশনের পূর্বদিন পর্যন্তও আনন্দ 'শৈক্ষ্য' অবস্থা অতিক্রম করিয়া সিদ্ধি বা অর্হত্ত্ব লাভ করিতে পারেন নাই। এদিকে ভিক্ষুগণ তাঁহাকে সঙ্গীতিতে যোগদানের জন্য নিমন্ত্রণ পাঠাইয়াছেন। আনন্দ চিন্তা করিলেন---"আমি এখনও তো অসিদ্ধ অবস্থাতেই আছি, আমার পক্ষে সঙ্গীতিতে উপস্থিত হইয়া ধর্মসংগায়ন করা কি উচিত হইবে?" তিনি সঙ্গীতিতে যোগদান করিবেন না স্থির করিলেন।

বৌদ্ধশাস্ত্রে কথিত আছে---আনন্দ ঐ রাত্রিতে দেবগণ কর্তৃক বিশেষ ভাবে উৎসাহিত হইয়া 'কর্মস্থান' ভাবনায় রত হন। দীর্ঘরাত্রি পর্যন্ত চংক্রমণে বিদর্শন ভাবনা করিতে করিতে শেষ যামে যখন শ্রান্ত-ক্লান্তদেহে একটু বিশ্রামের জন্য শয্যাগ্রহণ করিতে যাইতেছিলেন, যখন পদদ্বয় ভূমি হইতে উঠাইয়া মঞ্চোপরি উপাধানে মস্তক স্থাপন করিয়া শয়ন করিবেন, এমন সময় হঠাৎ তাঁহার অন্তরাকাশ দিব্য আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া গেল, তিনি বহু আকাঙ্ক্ষিত অর্হত্ত্ব লাভ করিয়া ধন্য হইলেন। কৃতকৃতার্থ আনন্দ সেই শুভ মুহূর্তে নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিয়াছিলেন---

"বহুস্সুতো চিত্তকথী বুদ্ধস্স পরিচারকো,
পন্নভারো বিসংযুত্তো সেয্যং কপ্পেতি গোতমো।"

বহুশ্রুত বিচিত্র কথিক, বুদ্ধের পরিচারক, গৌতম-গোত্রীয় আনন্দের পৃষ্ঠ হইতে আজ পঞ্চস্কন্ধের গুরুভার নামিয়া গেল। এখন তিনি বিমুক্ত হইয়া শয্যা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

পরদিন অর্হৎ আনন্দ যথাসময় সঙ্গীতিতে যোগদান করিয়া ধর্মসংগায়ন করিয়াছিলেন।

সম্বুদ্ধের পরিনির্বাণ লাভের পরেও আনন্দ ৪০ বৎসর কাল জীবিত ছিলেন। শাক্যমুনির তিরোধানের পূর্বে ও পরে ক্রমশঃ গুরুভ্রাতাগণ দেহরক্ষা করিতে লাগিলেন। দীর্ঘ-জীবনের শেষপ্রান্তে উপনীত হইয়া আনন্দ যেন নিজকে একান্ত নিঃসঙ্গ ও পরিত্যক্ত বোধ করিতেছিলেন। তাই বলিয়াছেন---

"যে পুরাণা অতীতা তে, নবেহি ন সমেতি মে,
স্বজ্জ একো'ব ঝাযামি বস্সুপেতো'ব পক্খিমা।"

যাহারা পুরাতন কল্যাণমিত্র তাঁহারা একে একে চলিয়া গেলেন, নূতনদের সহিতও আমার মনের মিল হইতেছে না। বর্ষাক্লিষ্ট নীড়গত পক্ষীর ন্যায় আজ আমি একাকী বসিয়া ভাবিতেছি।

মহাস্থবির আনন্দ ১২০ বৎসর বয়সে অন্তিম মুহূর্তে নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করিতে করিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার সাধন-পূত দিব্যজীবনের ইহাই অন্তিম বাণী—

"পরিচিন্নো মযা সত্থা কতং বুদ্ধস্স সাসনং,
ওহিতো গরুকো ভারো নত্থিদানি পুনব্ভবো'তি।"

আমাকর্তৃক শাস্তা সুপরিচিত হইয়াছেন, বুদ্ধের অনুশাসন আমি সম্পাদন করিয়াছি, পঞ্চস্কন্ধের যে গুরুভার আমার উপর চাপানো ছিল, তাহা আমি নামাইয়া ফেলিয়াছি, আমার আর পুনর্জন্ম হইবে না।

৪

মহামতি আনন্দ অগাধ শাস্ত্রজ্ঞানের অধিকারী ছিলেন, এই জন্য তিনি বৌদ্ধশাস্ত্রে 'বহুশ্রুত' ও 'ধর্ম-ভাণ্ডারিক' উপাদিতে বিভূষিত। একদা গোপক মোদ্গলায়ন নামক জনৈক ব্রাহ্মণ আনন্দকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে তিনি ধর্মশাস্ত্র কতটা অধিগত করিয়াছেন, তাহা জানিতে চাহেন। আনন্দ তদুত্তরে ঐ ব্রাহ্মণকে বলিয়াছিলেন---

"দ্বাসীতি বুদ্ধতো গণ্হিং দ্বে সহস্সানি ভিক্খুতো,
চতুরাসীতি সহস্সানি, যে মে ধম্মা পবত্তিনো।"

আমি বুদ্ধ হইতে ৮২ হাজার ধর্মসূত্র শিক্ষা করিয়াছি, ধর্মসেনাপতি সারীপুত্র প্রমুখ ভিক্ষুগণ হইতে আরও ২ হাজার শিক্ষা করিয়াছি; মোট ৮৪ হাজার ধর্মসূত্র আমি অধিগত করিয়াছি।

মহাস্থবির আনন্দ সময় সময় ভিক্ষুগণকে উপদেশ প্রসঙ্গে যে সকল

গাথা দেশনা করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত সংগৃহীত হইয়া 'সুত্তপিটকের খুদ্দক-নিকায়' সংগায়ন কালে 'থেরগাথা'র অন্তর্ভুক্ত করা হয়। 'থেরগাথা' গ্রন্থে ২৬৪ জন স্থবিরের ভাষিত গাথাসমূহ সঙ্কলিত হইয়াছে। এই সকল গাথা গম্ভীরার্থ ও কবিত্বপূর্ণ। আচার্য ধর্মপাল 'পরমার্থদীপনী' নামে থেরগাথার অর্থকথা রচনা করেন। ইহাতে স্থবিরগণের জীবন চরিতও সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে।

প্রথম সঙ্গীতিকালে আয়ুষ্মান্ আনন্দ স্থবিরগণের গুণবর্ণনা করিয়া যে নিদান-গাথা ভাষণ করিয়াছিলেন, তাহাই 'থেরগাথা' গ্রন্থের উপক্রমণিকারূপে দৃষ্ট হয়---

''সীহানং ব নদন্তানং দাঠীনং গিরিগহ্বরে,
সুণাথ ভাবিতত্তানং গাথা অত্তূপনাযিকা।''

দংষ্ট্রায়ুধ সিংহগণ যেমন গিরিগুহাতে গর্জন করিয়া থাকে, তেমনি ভাবিত-চিত্ত স্থবিরগণের স্বস্ব ভাষিত গাথা শ্রবণ করুন।

যথা নামা যথা গোত্তা যথা ধম্মা বিহারিনো,
যথাধিমুত্তা সপ্পঞ্ঞা বিহরিংসু অতন্দিতা।''

তাঁহাদের যে-নাম, যে-গোত্র, যে-প্রকারে তাঁহারা ধর্মজীবন যাপন করিয়াছেন, যে-প্রকারে তাঁহারা অধিমুক্তি (নির্বাণ) লাভ করিয়াছেন এবং যে প্রকারে তাঁহারা প্রজ্ঞাবান হইয়া অতন্দ্রিতভাবে বিহার করিয়াছেন, (তাহা শ্রবণ করুন)।

''তথ তথ বিপস্সিত্বা ফুসিত্বা অচ্চুতং পদং,
কতন্তং পচ্চবেক্খন্তা ইমমথং অভাসিংসু।''

সেই স্থবিরগণ অরণ্য, বৃক্ষমূল বা শূন্যাগারে---যত্রতত্র সত্যের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া, অচ্যুতপদ (নির্বাণ) স্পর্শ করিয়া অর্থাৎ অপরোক্ষানুভূতি লাভ করিয়া এবং কৃত-কৃতার্থ হইয়া এই সকল পরমার্থ সংযুক্ত গাথা ভাষণ করিয়াছিলেন।

মহাস্থবির আনন্দ মূর্খের নিন্দা এবং পণ্ডিতের প্রশংসা করিয়া এইরূপ

গাথা ভাষণ করিয়াছেন---

"অপ্পস্সুতায়ং পুরিসো বলিবদ্দো'ব জীরতি,
মংসানি তস্স বড্ঢন্তি পঞ্ঞা তস্স ন বড্ঢতি।"

অল্পশ্রুত ব্যক্তি অর্থাৎ মূর্খজন বলীবর্দের ন্যায় কেবল বৃদ্ধি পায় মাত্র; তাহার মাংসপিণ্ডই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, প্রজ্ঞা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না।

"বহুস্সুতং ধম্মধরং সপ্পঞ্ঞং বুদ্ধসাবকং,
ধম্মবিঞ্ঞাণমাকংখং তং ভজেথ তথাবিধং।"

যিনি বহুশ্রুত, ধর্মধর, প্রজ্ঞাবান এবং ধর্মজ্ঞান লাভের জন্য আগ্রহশীল ঈদৃশ বুদ্ধশিষ্যকে ভজনা করিবে।

ইন্দ্রিয়ারাম হীনবীর্য সাধককে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য আনন্দ এই অগ্নিমন্ত্র শুনাইয়া গিয়াছেন---

"কাযমচ্ছের গরুনো হিয্যমানো অনুট্ঠহে,
সরীর-সুখগিদ্ধস্স কুতো সমণ-ফাসুতা ?"

যে ভিক্ষু কায়িক-সুখে মত্ত হইয়া কায়-জীবন যে, ক্ষণে ক্ষণে পরিক্ষয় হইতেছে, তাহা না ভাবিয়া শীলাদি পূর্ণ করিবার জন্য সচেষ্ট হয় না, যে ভিক্ষু আপন শারীরিকসুখে লোভী বা আসক্তি পরায়ণ, সে কোথা হইতে শ্রামণ্য-সুখ লাভ করিবে ?

(থেরগাথা)

৫

ভগবান সম্যক্সম্বুদ্ধ একদা বেণুবন বিহারে সারীপুত্র স্থবিরের মাতুল ব্রাহ্মণকে উপলক্ষ্য করিয়া এইরূপ দেশনা করিয়াছিলেন---

"মাসে মাসে সহস্সেন যো যজেথ সতং সমং,
একঞ্চ ভাবিতত্তানং মুহূত্তমপি পূজযে ;
সা যেব পূজনা সেয্যো যঞ্চে বস্স সতং হুতং।"

যদি কেহ শত বৎসর ধরিয়া প্রতিমাসে সহস্রমুদ্রা ব্যয়ে যজ্ঞানুষ্ঠান করে

এবং যদি অপর কেহ বিদর্শন ভাবনাসিদ্ধ শুদ্ধাত্মা মহাপুরুষকে এক মুহূর্তের জন্যও পূজা করে, তাহা হইলে শতবর্ষের হোম অপেক্ষা ঐ মুহূর্তকালীন পূজাই শ্রেষ্ঠ।

(ধম্মপদ- ১০৬)

শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ শীলালঙ্কার মহাস্থবির মহোদয় যখন আমাকে তাঁহার সঙ্কলিত 'আনন্দ' নামক বৃহৎ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া ইহার ভূমিকা লিখিতে অনুরোধ করেন, তখন পূর্বোদ্ধৃত বাণীটি আমাকে এই গুরুত্বপূর্ণ দুরূহ কার্যভার গ্রহণে সাহস ও অনুপ্রেরণা যোগাইয়াছিল। ভূমিকা লেখা উপলক্ষ্য করিয়া ভগবান তথাগতের লীলাসঙ্গী ভাবিতাত্মা মহাপুরুষ আনন্দের পুণ্য-চরিত স্মরণ-মননের দুর্লভ সুযোগ হইবে এই আকুতিতেই উক্ত আহ্বান ও আমন্ত্রণ শ্রদ্ধাবনতচিত্তে গ্রহণ করিয়াছি।

শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ শীলালঙ্কার মহাস্থবির মহোদয় বঙ্গীয় বৌদ্ধ সাহিত্য-সমাজে সুপরিচিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত। প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বে বিনয়াচার্য পণ্ডিত প্রবর শ্রীমৎ প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির মহোদয় বৌদ্ধমিশন ও রেঙ্গুন বৌদ্ধমিশন প্রেস প্রতিষ্ঠা করিয়া বঙ্গাক্ষরে ত্রিপিটকের মূলপালি ও বঙ্গানুবাদ ক্রমশঃ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। বঙ্গাক্ষরে ত্রিপিটক প্রচাররূপ মহৎ কার্যে যে সকল সুযোগ্য শিষ্য ও কর্ম্মী তাঁহার সহযোগিতা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে শ্রীমৎ শীলালঙ্কার স্থবির উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। ইনি ব্রহ্মদেশে ও লঙ্কায় বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া সদ্ধর্মে বিশেষ বুৎপন্ন হন এবং স্বীয় গুরুদেবের আদেশে ত্রিপিটক গ্রন্থমালা প্রকাশের কার্যে তাঁহার সহযোগিতা করিতে থাকেন। ক্রমে ক্রমে ইনি রেঙ্গুন বৌদ্ধমিশন ও তাহার মুখপত্র 'সঙ্ঘশক্তি' পত্রিকার সম্পাদকপদে বৃত হইয়া বিশেষ যোগ্যতা সহকারে উভয় কার্য পরিচালনা করিতে থাকেন। সেই সময় 'সঙ্ঘশক্তি' পত্রিকায় আমি ধারাবাহিক ভাবে বৌদ্ধদর্শন এবং বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস সম্পর্কে কতগুলি প্রবন্ধ লিখি। তাহা হইতেই শীলালঙ্কার স্থবির মহোদয়ের সহিত আমার পরিচয়ের সূত্রপাত হয়।

ত্রিপিটক গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত হইয়া শ্রীমৎ শীলালঙ্কার স্থবির মহো-

দয়ের ধমপদার্থকথা (যমকবর্গ), বিমান বত্থু, বিনয় পারাজিকা প্রভৃতি পালিগ্রন্থের মূল ও বঙ্গানুবাদ ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতে থাকে। এতদ্ব্য-তীত রেঙ্গুন বৌদ্ধমিশন প্রেস হইতে তাঁহার রচিত রাহুল চরিত, অজাতশত্রু প্রভৃতি পুস্তকও প্রকাশিত হইয়া বৌদ্ধ শাস্ত্রানুরাগী বাঙ্গালী পাঠক সমাজে তাঁহাকে সুপরিচিত করিয়া দেয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৪১ ইং সনের মধ্যভাগে অনিবার্য কারণে শ্রীমৎ শীলালঙ্কারকে রেঙ্গুন ত্যাগ করিয়া চট্টলাভিমুখে যাত্রা করিতে হয়। ইহার কিছুকাল পরে বিশ্বযুদ্ধের এক সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে রেঙ্গুন শহরস্থিত বৌদ্ধমিশন প্রেস বোমার আঘাতে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় এবং তৎসঙ্গে ত্রিপিটক প্রচারার্থ সঞ্চিত অমূল্য পাণ্ডুলিপি সমূহও বিনষ্ট হইয়া যায়।

এই কারণে শ্রীমৎ শীলালঙ্কারের বৌদ্ধশাস্ত্র প্রচার-সাধনা ভীষণভাবে বাধাপ্রাপ্ত হইলেও তিনি নিরস্ত হন নাই। চট্টলে প্রত্যাগমনের পর নানা-বিধ প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও তাঁহার গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশনের চেষ্টা চলিতে থাকে। সম্প্রতি শ্রীমৎ শীলালঙ্কার মহাস্থবির ও দশবল (চাকমা) রাজবিহারের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ জ্ঞানশ্রী স্থবিরের সহযোগিতায় ১৩৭১ বাং, আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে চট্টগ্রামে 'ত্রিপিটক প্রচার বোর্ড' প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ত্রিপিটকের অন্তর্গত জনহিতকর ধর্মগ্রন্থ মুদ্রণ ও প্রচারই এই বোর্ডের উদ্দেশ্য। এতদ্দ্বারা বৌদ্ধশাসনের তথা বৌদ্ধশাস্ত্রানুরাগী বাঙ্গালী জনগণের মহদুপকার সাধিত হইবে সন্দেহ নাই। অধুনা ত্রিপিটক প্রচার বোর্ড হইতে শ্রীমৎ শীলালঙ্কার মহাস্থবির রচিত 'বিশাখা' (বুদ্ধের প্রধান দায়িকা), 'জীবক' (ভিষগাচার্য, বুদ্ধের প্রধান চিকিৎসক) ও 'বৌদ্ধ-নীতি-মঞ্জরী' (বৌদ্ধের একান্ত পালনীয়-মননীয় বিষয়-সম্ভার পূর্ণ গ্রন্থ) প্রকাশিত হইয়াছে।

৬

তিনি বর্তমানে ভগবান বুদ্ধের প্রিয়তম শিষ্য আনন্দের পুণ্যচরিত অবলম্বনে যে বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পালি ত্রিপিটকের অন্তর্গত বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে বিক্ষিপ্ত উপকরণমালা সংগ্রহ ও সুবিন্যস্ত করিয়া তিনি আনন্দের পূর্বজন্ম ও অন্তিম-জন্মের স্মরণীয় ঘটনা তাঁহার জীবন-সাধনা, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, বাণী ও উপদেশ সমূহ অতিশয় নিপুণতার সহিত বিবৃত করিয়াছেন। মহাযানী সংস্কৃত বৌদ্ধশাস্ত্র হইতেও স্থানে স্থানে উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে। গ্রন্থকারের বিষয়বস্তু বিন্যাস-প্রণালী ও রচনাশৈলী উভয়ই বিশেষ প্রশংসনীয়। স্থানে স্থানে বৌদ্ধ-ধর্মনীতি ও জটিল দার্শনিক-তত্ত্ব এরূপ প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যাত হইয়াছে যে, তাহা সাধারণ পাঠকেরও বোধগম্য হইবে। ভগবান বুদ্ধের জীবনের অনেক প্রসিদ্ধ ঘটনা আনন্দের সহিত জড়িত রহিয়াছে। সুতরাং আনন্দের এই জীবন-চরিত পাঠ করিয়া পাঠকগণ বুদ্ধচরিতের বিশেষ বিশেষ অংশের বিশদ অনুধ্যানে সার্থক হইবেন সন্দেহ নাই। সুবিজ্ঞ গ্রন্থকার এই পুস্তকের মুখবন্ধে আনন্দের জীবন চরিতের উপাদান ও ঘটনার কাল নিরূপণ সম্পর্কে যে তথ্যপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন, তাহা বিশেষজ্ঞ-গণের মনোযোগ আকর্ষণ করিবে। তিনি আনন্দের জীবনের ঘটনা সমূহের যে কালানুক্রমণী (Chronology) নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন, তাহা অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। কি তত্ত্বজ্ঞ, কি রসজ্ঞ, ঐতিহাসিক ও সাধারণ পাঠক—প্রত্যেকেরই জিজ্ঞাসা ও কৌতূহল নিবৃত্তির যথেষ্ট উপকরণ এই গ্রন্থের মধ্যে রহিয়াছে। তাঁহার প্রকাশভঙ্গি ও রচনা-নৈপুণ্যে নীরস-শুষ্ক তথ্যরাশিও রসোত্তীর্ণ-সাহিত্যে রূপায়িত হইয়াছে। বস্তুতপক্ষে শ্রীমৎ শীলালঙ্কার মহা-স্থবির রচিত 'আনন্দ' বঙ্গীয় বৌদ্ধ-সাহিত্যভাণ্ডারে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন বলিয়া স্বীকৃতি লাভ করিবে---এই বিশ্বাস ও আশা পোষণ করি-তেছি।

"ধম্মদানং সব্বদানং জিনাতি"---শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকার মহোদয় নিরাময় দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া এইরূপ আরও বহুগ্রন্থ প্রণয়নের দ্বারা ধর্মদানরূপ

সর্বোত্তম দানব্রত অনুষ্ঠান করুন, ভগবান তথাগতের শ্রীচরণে ইহাই ঐকান্তিক প্রার্থনা। ইতি—

সব্বে সত্তা ভবন্তু সুখিতত্তা

৫ই বৈশাখ, ১৩৭২ বাং,
রামমালা গ্রন্থাগার,
কুমিল্লা।

শ্রীরাসমোহন চক্রবর্ত্তী

মুখবন্ধ

মহামান্য স্থবির আনন্দ তথাগত বুদ্ধের একনিষ্ঠ প্রধান সেবক। তিনি মহাপুণ্যবান অর্হৎ। তাঁর পবিত্র পুণ্যাবদান-মণ্ডিত জীবনী বৌদ্ধ মাত্রেরই সম্যক্ অবগত থাকা একান্ত প্রয়োজন। ক্ষণজন্মা বিশুদ্ধাত্মা ক্ষীণাস্রবগণ বহুবিধ সদ্‌গুণে দীপ্যমান হন। তাঁদের পীযূষ-বর্ষিণী বাণী তাপিতের হরণ করে সন্তাপ, দান করে শান্তিময় জীবন। তাঁদের আচরণ মণির ন্যায় বিশুদ্ধ ও আনন্দ-দায়ক এবং কার্যাবলী সংস্কারমুক্ত ও বিশ্ব-কল্যাণে নিয়োজিত। এক কথায় বল্‌তে গেলে, মুক্ত-পুরুষ মহামানবদের জীবনীই তাঁদের বাণী। এরূপ পুণ্য-পুরুষের পবিত্র জীবন-চরিত পাঠে মন পবিত্র ও প্রীতিপূর্ণ হয়, শান্ত হয়ে পড়ে অশান্ত চিত্ত, অন্তরের কলুষ হয় বিদূরিত এবং তৎসঙ্গে পাঠকের জীবনও যে পুণ্যময় হয়, একথা বলাই বাহুল্য।

১৩৬৬ বাংলার জ্যৈষ্ঠ মাসে পরম স্নেহাস্পদ শ্রীমান রাষ্ট্রপাল ভিক্ষুর সহিত একদিন কথা প্রসংগে আনন্দের পবিত্র জীবনের পুণ্যাবদান সমূহের আলোচনা হয়। শুনে সে অত্যধিক চমৎকৃত ও আনন্দিত হয়। তখন সে ক্ষোভের সহিত বল্‌ল---"এ যাবৎ আমি, তথা বাংগালী বিদ্বজ্জন মাত্রেই আনন্দের ধারাবাহিক জীবনীর অভাব অনুভব করে আসছি। আমার একান্ত অনুরোধ আপনি এ অভাবটা পূর্ণ করুন।" এ বলে সে আমাকে তজ্জন্য অত্যন্ত উৎসাহ ও প্রেরণা দান করতে লাগল। ইতিপূর্বে আমি কয়েকবার

এ বিষয় চিন্তা করেছিলাম। এখন ওর কথা আমার অন্তর্নিহিত বাসনার ইন্ধন যোগাল। আমি সানন্দে রাজি হলাম। উপরন্তু, সে আরও অনুরোধ করল, বইটা যেন চল্‌তি ভাষাতেই রচিত হয়। কিন্তু, চল্‌তি ভাষায় যে, আমি নিতান্ত অপটু এবং সাহিত্যিক ভাষা থেকে তা যে সমধিক কঠিন, এর কোনও বিচার না করে, উদ্দীপনার আতিশয্যে পঙ্গুর গিরি লংঘনের মতো, পুণ্য-পূত আনন্দের মহাপুণ্য স্মরণ করে চল্‌তি ভাষাতেই লেখনী ধারণ করলাম।

উক্ত সনের ১২ই জ্যৈষ্ঠ আরম্ভ করে পাঁচ মাসের পর ১৫ই কার্তিক সংগ্রহ কার্য শেষ করলাম। এর প্রতিপাদ্য বিষয় সমূহ চয়ন করতে--- জাতক, অঙ্গুত্তর নিকায়, মধ্যম নিকায়, সংযুক্ত নিকায়, দীর্ঘ নিকায়, ধর্ম-পদার্থকথা, মনোরথ পূরণী, উদান, ধর্মপদ, থেরগাথা, বিনয় চুল্লবর্গ, অবদান, সূত্র সংগ্রহ, হিউ এন্ চাঙ ও ফা-হিয়ানের ভ্রমণ বৃত্তান্ত, বৌদ্ধ গ্রন্থ কোষ এবং জগজ্জ্যোতিঃ পত্রিকার আশ্রয় নিতে হয়েছে।

অনন্যসাধারণ আনন্দের ইতিহাস ঘটনা বহুল। সমগ্র ধর্ম-বিনয়ে ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত রয়েছে তাঁর জীবন-বৃত্তান্ত। এ পুস্তকে তাঁর জীবনের সম্পূর্ণ ঘটনা বা বিষয় সংযোগ করা সম্ভব নয়। তাই তাঁর অতীত ও বর্তমান জীবনের ছোটো-খাটো কয়েকটা মাত্র বিষয়, যা সর্বসাধারণের প্রয়োজনীয়, হৃদয়গ্রাহী ও শিক্ষনীয়, কেবল তাই সংগ্রহ ও সংযোজিত করে পুস্তক খানা সমাপ্ত করেছি।

পুস্তকে অবধারিত বিষয়ের মধ্যে অবদান গ্রন্থের 'শার্দূল কর্ণাবদান' নামক কাহিনীটির ছায়াবলম্বনে লেখা হয়েছে 'আনন্দ ও চণ্ডালকন্যা' নাম দিয়ে। 'ধর্ম সংবেগ' নিবন্ধে উত্তরা উপাসিকাকে লক্ষ্য করে আনন্দ যা উপদেশ দিয়েছেন, এর সহিত চণ্ডালকন্যার প্রতি উপদেশ ও বিষয়বস্তুর হুবহু সামঞ্জস্য রয়েছে দেখা যায়। এ উত্তরাই চণ্ডালকন্যা কি না সন্দেহ হয়।

আনন্দের জন্ম, প্রব্রজ্যা, স্রোতাপত্তি ও পরিনির্বাণ নিয়ে তথ্যানুসন্ধানী পণ্ডিতদের মধ্যে নানা প্রকার মতভেদ দেখা যায়। সুতরাং এ ক্ষেত্রে

পিটক-গ্রন্থোক্ত বিষয় ও ঐতিহাসিকদের প্রমাণীকৃত বিষয় সমূহ আলোচনা করে কতদূর সঠিকত্বে পৌঁছান যায়, তা একবার চেষ্টা করা যাক।

১। অধ্যাপক সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ কৃত 'বুদ্ধদেব' নামক পুস্তকের 'অনুরুদ্ধ, আনন্দ প্রভৃতি' নিবন্ধে উল্লেখ আছে---"তথাগতের বুদ্ধত্ব লাভের বিংশতি বর্ষ পরে আনন্দ উপসম্পদা গ্রহণ করতঃ বৌদ্ধভিক্ষু শ্রেণী মধ্যে প্রবেশ করেন। .....এই সময়ে তথাগত আনন্দকে উপস্থায়ক পদে নিযুক্ত করেন।"

আনন্দের জন্ম সম্বন্ধে যোগীন্দ্র নাথ সমাদ্দার লিখিত ফা-হিয়ান ভ্রমণ বৃত্তান্তের ষড়বিংশ অধ্যায়ের পাদটীকায় দেখা যায়—"যে দিবস শাক্য বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হন, আনন্দ সেই দিন জন্ম গ্রহণ করেন।"

সমাধান—বিদ্যাভূষণ ও সমাদ্দার মহোদয়দ্বয় এ তথ্য কোথা হতে সংগ্রহ করলেন জানি না। কিন্তু, বুদ্ধের বিধান মতে বিংশতি বৎসর বয়সই উপসম্পদা লাভের উপযুক্ত সময়। বিদ্যাভূষণ মহোদয়ও হয়তঃ এটাই প্রমাণ করতে চান যে, তথাগতের বুদ্ধত্ব লাভ দিবসেই আনন্দের জন্ম হয়। যে হেতু, বুদ্ধত্ব লাভের বিংশতি বর্ষ পরে যখন তাঁর বিংশ বৎসর পূর্ণ হয়েছে, তখনই তিনি গ্রহণ করেছেন উপসম্পদা এবং উপস্থায়ক পদেও হয়েছেন নিযুক্ত। তা হলে, উক্ত মতের বহু আপত্তির কারণ বিদ্যমান রয়েছে। চুল্লবর্গ, ধর্মপদার্থকথা, বুদ্ধবংশের অর্থকথা ও মনোরথ পূরণী প্রভৃতি গ্রন্থে উল্লেখ আছে---

(১) তথাগত বুদ্ধত্ব লাভের পর দশম মাসে ফাল্গুনী পূর্ণিমা দিবসেই রাজগৃহ থেকে কপিলবাস্তু অভিমুখে যাত্রা করেন প্রথম বার। পথে দু'মাস সময়ের প্রয়োজন হয়েছিল। সুতরাং বোঝা যায়, বুদ্ধত্ব লাভের পরবর্তী বৈশাখী পূর্ণিমা দিবসেই অর্থাৎ পূর্ণ এক বৎসর পরেই শাক্যমুনি শাক্যরাজ্যে পদার্পণ করেছিলেন। তখন তাঁর বয়ঃক্রম ছত্রিশ বৎসর। তিনি কপিলপুরে আগমনের পর সপ্তম দিবসে রাহুলকে প্রব্রজ্যা প্রদানান্তর রাজগৃহ অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করেন।* পথে মল্ল দেশস্থ অনুপ্রিয় নামক

*উক্ত আছে, বুদ্ধ কপিলবাস্তুতে প্রথমবার এসে ন্যূনাধিক সপ্তাহকাল ছিলেন।

গ্রামে আম্রকাননে কিয়দ্দিন অবস্থান করেছিলেন। সেখানেই ভদ্রিয়, অনুরুদ্ধ, আনন্দ, ভৃগু, কিম্বিল, দেবদত্ত ও উপালিকে প্রব্রজ্যা প্রদান করেন।

যে দিবস শাক্যমুনি বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হন, আনন্দের যদি সে দিবসেই জন্ম হয়, তা হলে প্রব্রজ্যার সময় তাঁর বয়স কতো হয়েছিল? মাত্র এক বৎসর, একমাস ন্যূনাধিক নয় কি?

আরও দেখা যায়, বুদ্ধত্ব লাভের দ্বিতীয় কি তৃতীয় বৎসর মহাপ্রজাপতী গৌতমী স্বীয় নির্মিত বস্ত্র দান করেন। এ বস্ত্র গ্রহণের জন্য আনন্দ বুদ্ধকে অনুরোধ করেছিলেন। তা হলে, তখন আনন্দ দু'তিন বৎসরের শিশু মাত্র! এ ক্ষেত্রে বিদ্যাভূষণ ও সমাদ্দার মহোদয়ের উক্তি কতদূর সত্য, সুধী সমাজের বিচার্য।

(২) তৃতীয় কিম্বা চতুর্থ বর্ষা রাজগৃহের গৃধ্রকূট পর্বতে অবস্থান কালীন বুদ্ধ অসুস্থতা নিবন্ধন বিরেচন নেওয়া প্রয়োজন বোধে আনন্দ স্থবিরকে আদেশ করলেন—"আনন্দ, আমাকে বিরেচন নিতে হবে, তুমি জীবককে ডেকে দাও।" আনন্দ জীবককে এ সংবাদ দিলে, জীবক এসে ঔষধ প্রয়োগ করলেন। ঊনত্রিশ বার বাহ্য হবার পর বুদ্ধ আনন্দকে আদেশ করলেন—"আনন্দ, উষ্ণ জলের প্রয়োজন, আমি স্নান করবো।" আনন্দ উষ্ণ জলের ব্যবস্থা করে দিলেন।

(বিনয় মহাবর্গ)

সে বৎসরই তথাগত বৈশালীতে পদার্পণ করেছিলেন দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও অমনুষ্য ভয়ের শান্তি বিধান মানসে। সুগত কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে আনন্দ রাত্রির তৃতীয় যাম পর্যন্ত রত্নসূত্র পাঠ করতে করতে সমগ্র বৈশালী প্রদক্ষিণ করেছিলেন।

(পরমার্থ জ্যোতিকা)

(৩) পঞ্চম বর্ষায় বুদ্ধ বৈশালীর মহাবনে অবস্থান করছিলেন। তখন ৯৭ বৎসরের বৃদ্ধ অনাগামী ফল লাভী রাজর্ষি শুদ্ধোদনের মুমূর্ষু অবস্থার সংবাদ পেয়ে কপিলপুরের রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হন সুগত এবং অনিত্যত্ব

ব্যাখ্যা করে পিতাকে প্রতিষ্ঠাপিত করেন অর্হত্বে। এর সপ্তাহ পরে মহা-প্রজাপতী গৌতমী বুদ্ধের নিকট প্রার্থনা করলেন প্রব্রজ্যা। এতে তিনি সম্মত না হয়ে প্রত্যাবর্তন করলেন বৈশালীতে। গৌতমীও সেখানে আগমন করলেন পঞ্চশত শাক্যমহিলা সহ। সেই স্মরণীয় পুণ্য-তীর্থেই আনন্দের সনির্বন্ধ অনুরোধে তথাগত নারীজাতিকে প্রব্রজ্যার অনুমতি দেন।

(চুল্লবর্গ)

(৪) অষ্টম বর্ষায় ভগবান অবস্থান করছিলেন ভর্গদেশস্থ ভেসকলাবনে সুংসুমার গিরিতে। তত্রত্য বোধিরাজ কুমারের 'কোকনদ' নামক প্রাসাদে একদিন সশিষ্য বুদ্ধ নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়েছিলেন। রাজকুমার ছিলেন অপুত্রক। তাই তিনি অন্তরে পুত্র কামনা পোষণ করে পাদ প্রক্ষালনের স্থান থেকে প্রাসাদের সপ্ততলে গমন পথে শ্বেতবস্ত্র বিস্তার করে দিয়েছিলেন। পূর্ব জন্মের অকুশল কর্ম-নিবন্ধন কুমার সন্তান লাভে বঞ্চিত থাকবেন দেখে, বস্ত্রের উপর দিয়ে যেতে অনিচ্ছুক হলেন বুদ্ধ। কুমার যখন তিনবার অনুরোধ করলেন, তখন তিনি আনন্দের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি আনন্দ বুদ্ধের মনোভাব বুঝতে পেরে রাজপুত্রকে বললেন—"কুমার, ভগবান বস্ত্রের উপর দিয়ে যাবেন না, বস্ত্র অপসারণ করুন।" রাজকুমার ক্ষুণ্নমনে বস্ত্র সরিয়ে নিলেন। সশিষ্য বুদ্ধ তখন প্রাসাদে প্রবেশ করলেন। আহার কৃত্যের অবসানে বস্ত্রের উপর দিয়ে না আসার কারণ জানতে চাইলে, সম্বুদ্ধ প্রকাশ করলেন কুমারের অপুত্রক হবার জন্মান্তরীণ প্রাণীহত্যা পাপ-কর্মের কাহিনী।

(ধর্মপদার্থকথায় বোধিরাজকুমার)

(৫) নবম বর্ষা—'পারিলেয়্যক' বনে তিনি অবস্থান করেছিলেন। বর্ষান্তে আনন্দ সেখানে গিয়ে তাঁকে অরণ্য পরিত্যাগের জন্য প্রার্থনা করলে, ভগবান জেতবন বিহারে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

(ধর্মপদার্থকথায় কৌশাম্বীক কাহিনী)

(৬) দ্বাদশ বর্ষা—বৈরঞ্জগ্রামে। তখন সেখানে দুর্ভিক্ষ হেতু ভিক্ষুগণ আহার্য লাভে বঞ্চিত হলে, জনৈক অশ্ববণিক ভিক্ষুগণকে প্রত্যহ দান করতে লাগলেন ছোলা(মটর)। ভিক্ষুগণ তা কণ্ডন করার সময় উদূখলের শব্দ শুনে বুদ্ধ আনন্দকে জিজ্ঞাসা করলেন—"আনন্দ, এশব্দ কিসের?" প্রত্যুত্তরে আনন্দ বললেন---"প্রভু, এ উদূখলের শব্দ।" ভগবান ভিক্ষুগণের অল্পেচ্ছা ও স্বল্পে সন্তুষ্টিভাব চিন্তা করে সপ্রশংস বাক্যে বললেন—"সাধু, সাধু আনন্দ! তোমাদের মতো সৎপুরুষদের এ উপমা গ্রহণ করে ভবিষ্যতে ভিক্ষুগণ উৎকৃষ্ট অন্ন-ব্যঞ্জনের প্রতি উপেক্ষা ও অনাসক্ত হবে।"

(বিনয় পারাজিক—বৈরঞ্জভাণবার)

শাক্যমুনির বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির এক বৎসর পর থেকেই বার বার আনন্দের সাক্ষাৎ পাচ্ছি; এমতাবস্থায় আনন্দের 'জন্ম ও প্রব্রজ্যা বা উপসম্পদা' বিচার সাপেক্ষ তথ্যানুসন্ধানী পণ্ডিতদের।

২। ***সহজাত***—আনন্দের জন্ম সম্বন্ধে যোগীন্দ্র নাথ সমাদ্দার লিখিত ফা-হিয়ান ভ্রমণ বৃত্তান্তের ষড়বিংশ অধ্যায়ের পাদটীকায় দেখা যায়---"যেদিবস শাক্য বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হন, আনন্দ সেই দিন জন্ম গ্রহণ করেন।" শ্রদ্ধেয় ধর্মরত্ন মহাস্থবির মহোদয়ের অনূদিত 'মহাপরিনিব্বান সুত্তং' গ্রন্থের পরিশিষ্টে আনন্দ বর্ণনায় উল্লেখ আছে---"আনন্দ ও সিদ্ধার্থদেব একই দিনে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন।" ঈশান ঘোষের অনূদিত জাতক প্রথম খণ্ডের পরিশিষ্টে আনন্দ বর্ণনায় উল্লেখ আছে---"আনন্দ ও বুদ্ধ একই দিনে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন।" উক্ত পরিশিষ্টে 'গৌতম বুদ্ধ' বর্ণনায় উল্লেখ আছে—'মহামায়ার ...লুম্বিনী উদ্যানে...বৈশাখী পূর্ণিমায়...পুত্র প্রসব...ঐদিন যশোধরা, সারথি ছন্দক, কালোদায়ী, আনন্দ এবং অশ্ববর কণ্ঠকেরও জন্মলাভ।' তাঁরা তা কোন্ গ্রন্থ হতে উদ্ধৃত করলেন, তা' উল্লেখ করেন নি।

কিন্তু অতীতের মহাপণ্ডিত বুদ্ধঘোষ কৃত 'মনোরথ পূরণী' নামক অঙ্গুত্তরার্থকথা ও থেরগাথার অর্থকথায় কালুদায়ী বর্ণনায় উল্লেখ আছে—"বোধিসত্তেন হি সদ্ধিং বোধিরুক্খো, রাহুলমাতা, চতস্সো নিধিকুম্ভিযো, আরোহণীয হত্থী, কন্থকো, ছন্নো, কালুদা যী'তি ইমে সত্ত এক দিবে জাতত্তা সহজাতা নাম অহেসুং।" বোধিসত্ত্বের সহিত বোধিবৃক্ষ, রাহুল-স মাতা, চার নিধিকুম্ভ, আরোহণীয় হস্তী, কন্থক (অশ্ব), ছন্ন (সারথি) ও কালুদায়ী (অমাত্য) এই সপ্ত এক দিবসে জাত বলে 'সহজাত' নাম হয়েছিলো।

আমার পরমারাধ্য আচার্য অগ্রমহাপণ্ডিত প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির মহো-দয়ের অনূদিত থেরগাথা' নামক গ্রন্থে কালুদায়ী স্থবির বর্ণনায়ও উক্ত অর্থকথানুরূপই লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু, উক্ত গ্রন্থ সমূহে আনন্দ-বর্ণনায় সহজাত বলে কিছুই উল্লেখ নেই। সুতরাং এসব প্রসিদ্ধ অর্থকথায় সপ্ত সহজাতের মধ্যে আনন্দ না থাকাতে, তাঁকে সহজাত হিসাবে গ্রহণ করার দুঃসাহস করতে পারলাম না। মধ্যম নিকায়ের অর্থকথায়ও উল্লেখ আছে—"তথাগতের ভ্রাতাদের মধ্যে মহানাম সর্বাপেক্ষা জ্যেষ্ঠ এবং আনন্দ সর্বাপেক্ষা কনিষ্ঠ।" সুতরাং আনন্দের জন্মের সন-তারিখ নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। তা তিমিরাচ্ছন্ন হয়েই রয়ে গেলো।

৩। আনন্দ ছিলেন বীর্যবান ও মহাপরাক্রমশালী। সুষ্ঠুরূপে শ্রমণ-ধর্ম আচরণ মানসে পনর বৎসর শয়ন ত্যাগ করেছিলেন ১। বুদ্ধের প্রধান সেবকত্ব পদে অধিষ্ঠিত হয়ে পঁচিশ বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম ও বিনিদ্র-রজনী অতিবাহিত করেছিলেন। তিনি ছিলেন পূর্ণস্বাস্থ্যবান, শক্তিশালী ও দীর্ঘায়ু সম্পন্ন। বিশেষতঃ তাঁর স্বাস্থ্যহীনতা বা রোগ ভোগের কথা কোথাও উল্লেখ নেই। তিনি ছিলেন চতুর্বিধ আশ্চর্যগুণ সম্পন্ন পুণ্যপুরুষ। এরূপই পুণ্যবান ছিলেন তিনি। তিনি যে কতো সংযমী, ষড়েন্দ্রিয় সংযমে কতো দৃঢ়, কামরাগে বীতস্পৃহ ও বিশুদ্ধাত্মা ছিলেন, 'আনন্দ ও চণ্ডালকন্যা' নিবন্ধই এর জ্বলন্ত নিদর্শন। তাঁর জীবনের প্রত্যেক বাণীই তাঁর পূত-চরিত্রের উজ্জ্বল প্রমাণ।

১। সক্ক পঞ্হ সুত্তট্ঠকথা।

৪। আনন্দ বুদ্ধের পিতৃব্যপুত্র। পিতার নাম অমিতোদন বা অমৃতোদন। থেরগাথার্থকথা ও অঙ্গুত্তরার্থকথায় উল্লেখ আছে—"মহানাম, অনুরুদ্ধ ও আনন্দ অমিতোদনের পুত্র। অমিতোদন মহারাজ শুদ্ধোদনের কনিষ্ঠ সহোদর।"

কিন্তু, অধ্যাপক সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ কৃত 'বুদ্ধদেব (১) নামক পুস্তকে উল্লেখ আছে--"তথাগতের খুল্লতাতের নাম দ্রোণোদন। দ্রোণোদনের অনুরুদ্ধ ও মহানাম নামে দুই পুত্র এবং রোহিণী নামে এক কন্যা ছিল। অমৃতোদনও তথাগতের আর এক খুল্লতাত। অমৃতোদনের পুত্রের নাম আনন্দ।"

'বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতা' নামক গ্রন্থের ষড়বিংশ পল্লবে 'শাক্যোৎপত্তি' নামক সন্দর্ভে উল্লেখ আছে—"সিংহহনুর চারিটী পুত্র—শুদ্ধোদন, শুক্লোদন, দ্রোণোদন ও অমৃতোদন এবং চারিটী কন্যা—শুদ্ধা, শুক্লা, দ্রোণা ও অমৃতা। শুক্লোদনের দুই পুত্র—তিষ্য ও ভদ্রিক। দ্রোণোদনের দুই পুত্র—অনিরুদ্ধ ও মহান্। অমৃতোদনের দুই পুত্র—আনন্দ ও দেবদত্ত।"

আনন্দের ভ্রাতা দেবদত্তের সঙ্গে আমাদের পরিচয় নেই। আমাদের পরিচিত দেবদত্ত হলেন দেবদহ নগরের সুপ্রবুদ্ধের পুত্র, যশোধরার ভ্রাতা, বুদ্ধের ঘোর বিরুদ্ধাচারী এবং যাঁর গতি হয়েছে অবীচিতে। এখানে অপরদের সম্বন্ধে মতভেদ থাক্‌লেও, কিন্তু আনন্দ সম্বন্ধে মতের মিল দেখা যায়। আনন্দ অমিতোদনেরই পুত্র।

৫। আনন্দের পরিনির্বাণ সম্বন্ধে ফা-হিয়ানের ভ্রমণ বৃত্তান্তের ষড়াবংশ অধ্যায়ে উল্লেখ আছে---"পরিনির্ব্বাণ লাভের উদ্দেশ্যে যখন আনন্দ মগধ হইতে বৈশালী অভিমুখে গমন করিতেছিলেন, তখন দেবতাগণ রাজা অজাতশত্রুকে এই বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলে, রাজা তৎক্ষণাৎ...আনন্দের পশ্চাদ্‌গমন করিয়া নদীতীরে উপস্থিত হইলেন। পক্ষান্তরে, বৈশালীর লিচ্ছবিগণও আনন্দের...অভ্যর্থনার্থ নদীতীরে সমাগত হইলেন। এই প্রকারে উভয় পক্ষই এক সময়ে নদীতীরে পৌঁছিলে, আনন্দ বিবেচনা করিলেন যে, যদি তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তবে লিচ্ছবিগণ রুষ্ট হইবেন। কিন্তু, অগ্রসর হইলে, রাজা অজাতশত্রু ক্রোধান্বিত হইবেন। তজ্জন্য

(১) যে বুদ্ধ ত্রিলোকগুরু, তাঁকে বুদ্ধদেব বলা উচিত নয়।

তিনি নদীর ঠিক মধ্যস্থলে সমাধিপ্রাপ্ত হইয়া পরিনির্ব্বাণ লাভ করিলেন। তিনি তাঁহার দেহ দুই ভাগে বিভক্ত করিলেন এবং নদীর উভয় তীরে অর্দ্ধাংশ করিয়া স্থাপিত করিলেন। সুতরাং প্রত্যেক রাজাই অর্দ্ধাঙ্গ প্রাপ্ত হইয়া নিজ নিজ রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিয়া এক একটি স্তূপ নির্ম্মাণ করিলেন।'' এর পাদটীকায় উল্লেখ আছে---''বর্ত্তমান কালে, ঐতিহাসিক গণের মতে অজাতশত্রু ৪৭৫ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন।''

সমাধান---কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বৌদ্ধশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ডক্টর বেণীমাধব বড়ুয়া এম, এ, ডি-লিট্ মহোদয়ের বহু তথ্যপূর্ণ 'বৌদ্ধ গ্রন্থকোষ' নামক পুস্তকে 'রাজপরম্পরা' নিবন্ধে উল্লেখ আছে—বৃদ্ধ-পিতাকে সিংহাসন চ্যুত করিয়া মগধের রাজসিংহাসনে অধিরোহণ পূর্ব্বক অজাতশত্রু ৩২ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার রাজত্বের অষ্টম বর্ষে বুদ্ধ পরিনির্ব্বাপিত হন। তিনি ১৭ বৎসর বয়সে মগধের রাজসিংহাসন অধিকার করিয়া ৪৮ বৎসর বয়সে তাঁহার পুত্র উদয়ভদ্রের হস্তে নিহত হন।''

তা হলে দেখা যায়, বুদ্ধের পরিনির্বাণের সময় অজাতশত্রুর বয়স ২৫ বৎসর। বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর তিনি ২৩ বৎসর মাত্র জীবিত ছিলেন। এতেই প্রমাণ হচ্ছে, আনন্দের পরিনির্বাণের সময় অজাতশত্রু জীবিত ছিলেন না। যেহেতু, আনন্দের পরমায়ু ১২০ বৎসর। সিদ্ধার্থ কুমারের কতো বৎসর পরে যে, আনন্দ জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এর উল্লেখ না থাক্‌লেও সিদ্ধার্থের যে, কনিষ্ঠ ছিলেন, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। তাঁকে যদি সিদ্ধার্থের সহজাত হিসাবেও ধরা যায়, তবুও তিনি তথাগতের পরিনির্বাণের পর আরো ৪০ বৎসর জীবিত থাকার কথা। সুতরাং এ হিসাবেও দেখা যায় অজাতশত্রুর মৃত্যুর ১৭ বৎসর পরে আনন্দের পরিনির্বাণ লাভ হয়। অপিচ, সিদ্ধার্থের পরে যখন আনন্দ জন্মগ্রহণ করেছেন, তা হলে চল্লিশেরও অধিক বৎসর যে, তিনি জীবিত ছিলেন, তা বলাই বাহুল্য।

আরো বিচার করা যায় যে---বিগত ১৯৫৬ ইংরেজীতে বুদ্ধজয়ন্তীর সময়ে তথাগত বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর থেকে আড়াই হাজার বর্ষ পূর্তি

নিয়ে ভারতে তথ্যবিদ্ পণ্ডিতদের মধ্যে এক বিতর্কের সৃষ্টি হয়। সে সময়ে অধ্যাপক প্রবোধ চন্দ্র সেন মহাশয় গ্রীসে রক্ষিত চন্দ্র ও সূর্য-গ্রহণের রেকর্ড হতে সিদ্ধার্থের জন্ম, বুদ্ধত্বলাভ ও মহাপরিনির্বাণের তালিকা 'The Statesmens' পত্রিকায় যা প্রকাশ করেছিলেন, নিম্নে তা উদ্ধৃত করা গেল---

সিদ্ধার্থের জন্ম---খ্রীঃ পূর্ব ৬২৫ অব্দের ৭ই এপ্রিল,

বুদ্ধত্ব লাভ ,, ,, ৫৯০ ,, ১০ই ,,

মহাপরিনির্বাণ- ,, ,, ৫৪৫ ,, ২২শে ,,

বিশ্বের সকলেই এই সন-তারিখ মেনে নিয়েছেন। এখন আনন্দ ও অজাতশত্রু সম্বন্ধে তাঁদের পূর্বোক্ত বয়ঃক্রমানুসারে সন-তারিখ অক্লেশে নির্ধারণ করা যায়—

অজাতশত্রুর জন্ম---খ্রীষ্ট পূর্ব ৫৭০ অব্দে

,, রাজত্বলাভ--- ,, ,, ৫৫৩ ,,

,, মৃত্যু ,, ,, ৫২২ ,,

আনন্দকে বুদ্ধের সহজাত হিসাবে যদি ধরা যায়, তা হলে—

আনন্দের জন্ম খ্রীঃ পূর্ব ৬২৫ অব্দের ৭ই এপ্রিল,

,, অর্হত্ব লাভ ,, ,, ৫৪৫ ,, শ্রাবণী পূর্ণিমা,

,, পরিনির্বাণ ,, ,, ৫০৫ অব্দে

বর্তমান ঐতিহাসিকদের মতে অজাতশত্রু যদি খ্রীষ্টপূর্ব ৪৭৫ অব্দে দেহত্যাগ করেন, তা হলে পূর্বোক্ত রেকর্ড্ মতে অজাতশত্রু ৯৫ বৎসর জীবিত ছিলেন। ইহা কি সম্ভব?

ফা-হিয়ান বর্ণিত যে নদীর মধ্যস্থলে আনন্দ পরিনির্বাণ লাভ করেছিলেন, সে নদীর নাম তিনি উল্লেখ করেন নি। পাদটীকায় উল্লেখ আছে —"ফা-হিয়ান বৈশালী পৌঁছিবার পূর্বে গণ্ডক পার হইয়াছিলেন। বৈশালী হইতে তিনি গণ্ডকের বামতীর হইয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন।"

জেঃ কানিং হাম্ বলেছেন যে---"বৈশালী গণ্ডক নদীর পূর্বদিকে অবস্থিত ছিল। গণ্ডকের পূর্বতীরে 'বেসারা' নামক একটী গ্রাম দেখিতে

পাওয়া যায়।'' এতেই বুঝা যায়, এ নদী গণ্ডক নদীই হবে।

ধর্মপদার্থকথায় 'বনবাসী তিষ্য স্থবির' কাহিনীতে উল্লেখ আছে---''আনন্দ স্থবির রোহিণী নদীর মধ্যস্থলে আকাশে পরিনির্বাপিত হয়েছিলেন।

রোহিণী নদীর এক কূলে শাক্য রাজ্য, অপরকূলে কোলীয় রাজ্য। শাক্য ও কোলীয় রাজ্যের সন্ধিস্থল থেকে রাজগৃহ ও বৈশালীর সন্ধিস্থল একায় যোজন ব্যবধান। আনন্দ স্থবিরের পরিনির্বাণ সম্বন্ধে ফা-হিয়ানের উক্তি এবং পাদটীকোক্ত বর্তমান ঐতিহাসিকদের মতে অজাতশত্রুর মৃত্যু-সনের সত্যতা নির্ধারণ পুরাতত্ত্ব বিদ্‌দেরই বিচার সাপেক্ষ।

৬। আনন্দের স্তূপ বা ধাতুচৈত্য সম্বন্ধে ফা-হিয়ান উল্লেখ করেছেন—''বৈশালী নগরের উত্তরে বৃহৎ অরণ্যে একটী দ্বিতল বিহার আছে। এই বিহারে বুদ্ধ বাস করিতেন। আনন্দের শরীরের অর্ধাংশের উপরে নির্মিত স্তূপও এই স্থানে রহিয়াছে।'' পাদটীকায় উল্লেখ আছে---''মহাবংশে এই বিহারকে 'মহাবন বিহার' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।'' নিকায় গ্রন্থাদিতে---''ভগবা বেসালিযং বিহরতি মহাবনে কূটাগার সালাযং।'' ভগবান বৈশালীর মহাবন কূটাগার শালায় অবস্থান করেছিলেন। ফা-হিয়ানোক্ত দ্বিতল বিহার এ কূটাগার শালাই হবে।

বৈশালীর মহাবনে ফা-হিয়ানোক্ত আনন্দের স্তূপ থাকা অসম্ভব নয়। কিন্তু, তিনি যে উল্লেখ করেছেন—''আনন্দের শরীরের অর্ধাংশের উপরে নির্মিত স্তূপ'' তা' সম্ভব বলে মনে হয় না। কারণ, তিনি যদি রোহিণী নদীর উপরেই নির্বাণ প্রাপ্ত হয়ে থাকেন, তা হলে, শাক্য-কোলীয়ের সীমা অতিক্রম করে বৈশালীর মহাবনে আনন্দের শরীরের সম্পূর্ণ-অর্ধাংশের উপর স্তূপ হওয়া কিরূপে সম্ভব হতে পারে? অর্হতের শারীরিক-ধাতু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বর্তুলাকার। ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, উপাসক ও উপাসিকাগণ আনন্দের পরম ভক্ত ছিলেন। হয়তঃ, তাঁরা শাক্য অথবা কোলীয়দের নিকট চেয়ে কতেক পরিমাণ তাঁর শারীরিক-ধাতু লাভ করে থাকবেন এবং মহাবনে তা নিধান করে তদুপরি স্তূপ নির্মাণ করেছেন।

অন্যস্থানেও আনন্দের স্তূপের কথা উল্লেখ আছে। 'হিউ এন্ চাঙ'

এর ভ্রমণ বৃত্তান্তে লিপিবদ্ধ আছে---"মথুরা বৌদ্ধদের তীর্থস্থান ছিল। বুদ্ধশিষ্য সারিপুত্র, মৌদ্‌গল্যায়ন, উপালি, আনন্দ ও রাহুলের স্মারক স্তূপ এখানে ছিল। অভিধর্মের ছাত্রেরা সারিপুত্রের, যোগশিক্ষার্থীরা মৌদ্‌গল্যায়নের, বিনয়ের ছাত্রেরা উপালির, ভিক্ষুণীরা আনন্দের আর শ্রামণগণ রাহুলের পূজা দিত।"

ফা-হিয়ানও এরূপ প্রায় একই উক্তি করেছেন। তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তের ষোড়শ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে---"মথুরায় যে স্থানে যতিসংঘ বাস করেন, তথায় তাঁহারা...আনন্দ...উদ্দেশ্যে স্তূপ নির্মাণ করিয়াছেন। ...ভিক্ষুণীগণ সাধারণতঃ আনন্দের স্তূপেই উপহার প্রদান করেন। কারণ, আনন্দই প্রথমতঃ স্ত্রীলোকের গৃহপরিত্যাগের অনুমতি ও সন্ন্যাসিনী হইবার অনুমতি প্রদানের জন্য পৃথিবীপতিকে* অনুরোধ করিয়াছিলেন।"

একথা একান্ত সত্য যে, আনন্দই বিশ্ব-নারীর বিমুক্তির সিংহদ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। আনন্দের সনির্বন্ধ অনুরোধে মাতৃজাতিকে সংঘে প্রবেশের অধিকার দিয়েছিলেন তথাগত। বিমুক্তির অনুপম আনন্দে আনন্দিত হয়েছিলেন অগণিত নারী। আনন্দ মাতৃজাতির মুক্তি-দ্বার অর্গলমুক্ত করে দিয়ে জগতে এনে দিলেন যুগান্তর। এই অবিস্মরণীয় পুণ্যাবদান আনন্দের পুণ্যময় জীবনকে করেছে গৌরবোজ্জ্বল। এরূপ মহামনা মহোপকারী আনন্দের প্রতি ভিক্ষুণীদের হৃদয় পূর্ণ হয়ে থাকতো গভীর শ্রদ্ধায়। তাঁর উদ্দেশ্যে ভিক্ষুণীরা শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করতেন নত-শিরে। ফা-হিয়ান ও হিউ এন্ চাঙ্ তা স্বচক্ষে দেখে তাঁদের গহন-মনের সশ্রদ্ধ স্মৃতির উজ্জ্বল নিদর্শন রেখে গেছেন ভ্রমণ বৃত্তান্তের গৌরবময় পৃষ্ঠায়।

৭। 'বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতা'র সপ্ততিতম পল্লব, মাধ্যন্তিকাবদানে উল্লেখ আছে---"মাধ্যন্তিক নামে এক ভিক্ষু নিজগুরু আনন্দের আজ্ঞায় বুদ্ধশাসন প্রচার করিবার জন্য কাশ্মীর দেশে গিয়াছিলেন। ...তিনি পঞ্চশত অর্হৎ সহ তথায় অবস্থান করিয়াছিলেন।" দুর্গম গিরি-কন্দর, হিংস্র-প্রাণী সমাকুল গহনারণ্য, হিমালয়ের তুষার-পুঞ্জ পার হয়ে শান্তির দূত তাঁর

*জগৎগুরু বুদ্ধ।

শান্তির বাণী বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন দূর-দূরান্তরে, সাধন করেছিলেন জগতের মহাকল্যাণ।

মুক্তপুরুষ আনন্দ ১২০ বৎসর যাবৎ উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কসম দীপ্যমান হয়ে মুক্তির অফুরন্ত আনন্দ নিয়ে বিলীন হয়ে গেলেন শূন্যতায়। রোধ হয়ে গেলো তাঁর জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহ, নিভে গেলো চিরতরে তৃষ্ণার আলোক-বর্তিকা, স্তব্ধ হয়ে গেলো ভবচক্রের গতিবেগ। আহা, না জানি সে-শূন্য—কেমন শান্তিপ্রদ, নির্বাণ কেমন সুখকর। মুক্ত-বিমুক্ত-শূন্যতাপ্রাপ্ত সে পুণ্য-পুরুষ পূজার্হ আনন্দের উদ্দেশ্যে নিবেদন করছি—আমার অন্তরের অসীম শ্রদ্ধার্ঘ্য। তাঁর পবিত্র জীবন-কাহিনী লিখতে পেরে এবং জন সমক্ষে উপস্থিত করতে পেরে নিজকে মনে করছি পরম সৌভাগ্যবান।

পুণ্যশ্লোক আনন্দের পুণ্যপূত-জীবনী পাঠকদের অন্তরে সামান্যও যদি পুণ্যরেখা অঙ্কিত করতে পারে, তাতেও পাবো শান্তি এবং আমার পরিশ্রমও হবে সার্থক। আমি তেমন নিপুণ নই, ভাষাজ্ঞানও সীমাবদ্ধ; তাই চল্‌তি ভাষার পূর্ণাঙ্গ রূপদানে সক্ষম হলাম না। প্রথম সংস্করণে ভুল-ত্রুটি যে যথেষ্ট থাকবে, এতে সন্দেহের অবকাশ নেই। সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা আমার এ অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি গ্রহণ না করে, সংশোধন করে নিলে সুখী হবো।

পরিশেষে কৃতজ্ঞ অন্তরে স্বীকার করছি যে—কুমিল্লা রামমালা ছাত্রা-বাসের প্রধান তত্ত্বাবধায়ক প্রবীণ পণ্ডিত শ্রীযুত রাস মোহন চক্রবর্তী এম-এ, পি-এইচ-বি, পুরাণরত্ন, বিদ্যাবিনোদ, পালিশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞ মহোদয় সারগর্ভ ভূমিকা লিখে দিয়ে এ গ্রন্থের গুরুত্ব ও মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন, তজ্জন্য তাঁর সর্বাঙ্গিন কল্যাণ কামনা করছি।

বৈদ্যপাড়া (বোয়ালখালী) নিবাসী ডাক্তার শ্রীযুত রাসবিহারী চৌধুরী মহোদয় এ পুস্তকের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত কালে প্রায় সময় এসে অতি সহিষ্ণুতার সহিত ভাষার সৌষ্ঠব সাধনের অনেক প্রয়াস স্বীকার করেছেন। ত্রিপিটক বাগ্মীশ্বর পণ্ডিত প্রবর শ্রীমৎ আনন্দমিত্র মহাস্থবির এর যথাযোগ্য শব্দ, ভাষা এবং মূলপালি ও অনুবাদের সামঞ্জস্য রক্ষার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রেখে

গ্রন্থের সর্বাংশের সৌন্দর্য বর্ধনার্থ বিশেষ যত্ন নিয়েছেন। বৈদ্যপাড়া নিবাসী প্রবীণ পণ্ডিত শ্রীযুত মোহিনী মোহন বড়ুয়া ও চট্টগ্রাম কলেজিয়েট হাই-স্কুলের সুযোগ্য শিক্ষক শ্রীযুত ভূপতি রঞ্জন বড়ুয়া বি-এ, সূত্রবিশারদ মহোদয়গণ এ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির প্রয়োজনীয় বিষয় সংশোধন করে কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়েছেন। তাঁরা প্রজ্ঞাসম্পদের অধিকারী হোন, ইহাই আমার আন্তরিক কামনা।

হাইদচকিয়া (ফটিকছড়ি) নিবাসী প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীযুত অশোক বড়ুয়া বহু আয়াস স্বীকার করে যথাযোগ্য সুরুচিপূর্ণ শব্দবিন্যাস ও ভাষার সুষ্ঠু সমাধানে এ গ্রন্থকে সর্বাংশে সাহিত্য-গুণমণ্ডিত করে দিয়েছেন। তাঁর নিকট সাহিত্যিক-সুলভ মূল্যবান সহায়তা পেয়ে আমি কৃতার্থ হয়েছি। আশীর্বাদ করি তিনি পরমার্থ জ্ঞানের অধিকারী হোন।

উনাইনপুরা লঙ্কারামাধিপতি প্রবীণ পণ্ডিত, বিশেষজ্ঞ শ্রীমৎ জ্ঞানীশ্বর মহাস্থবির মহোদয় এ গ্রন্থের আদ্যোপান্ত প্রণিধানের সহিত শুনে সহসা ইহা মুদ্রণের জন্য আমাকে উৎসাহ দান করেন। বৈদ্যপাড়া নিবাসী ভূতপূর্ব পেশকার শ্রীযুত উপেন্দ্রলাল বড়ুয়া মহোদয় এ পুস্তক সম্বন্ধীয় কয়েকটা তথ্যের সন্ধান দিয়ে উপকৃত করেছেন। করল নিবাসী চিত্রশিল্পী শ্রীযুত চিত্ত রঞ্জন চৌধুরী মহোদয় পুস্তকের প্রচ্ছদপট সম্বন্ধে উপদেশ ও সাহায্য দানে বাধিত করেছেন।

ধর্মপ্রাণ উদারচেতা বহু দায়ক-দায়িকার শ্রদ্ধাদান এবং পার্বত্য চট্টলের বোয়ালখালী, রাজ বিহারের অধ্যক্ষ সমাজ-হিতৈষী মহামনা পরম স্নেহভাজন শ্রীমান জ্ঞানশ্রী স্থবিরের প্রচেষ্টা, আন্তরিকতা ও বহুমুখী সাহায্যে 'আনন্দ' জনগণ-সমক্ষে সহসা আত্মপ্রকাশ করতে সমর্থ হলো। এগ্রন্থ সম্বন্ধে যাঁরা কায়িক-বাচনিক সাহায্য করেছেন, এমন কি সামান্যও আন্তরিকতা প্রদর্শন করেছেন, তাঁদের প্রত্যেকের প্রতিই আমি কৃতজ্ঞ রইলাম। এ গ্রন্থ প্রকাশনে যাঁরা অর্থ সাহায্য করেছেন, পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে তাঁদের নাম উল্লেখ করতে পারলাম না; ভবিষ্যতে সে সুযোগের প্রতীক্ষায় রইলাম।

কধুরখিল (ছন্দারিয়া) নিবাসী দৈনিক আজাদী পত্রিকার সহকারী

সম্পাদক সাহিত্যিক শ্রীযুত বিমলেন্দু বড়ুয়া মহোদয় সযত্নে এ পুস্তকের অরল বিশেষের প্রুফ সংশোধন করে কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়েছেন। কোহিনূর ইলেক্‌ট্রিক প্রেসের পরিচালকবৃন্দের সৌজন্য ও কর্মকুশলতা মুদ্রণ কার্যকে ত্বরান্বিত ও প্রসন্নতাব্যঞ্জক করেছে, তজ্জন্য তাঁরা ধন্যবাদার্হ।

আমার পরমারাধ্য গুরু-আচার্য, লুপ্ত-গৌরব 'রেঙ্গুন বৌদ্ধ-মিশন' প্রতিষ্ঠাতা, পঞ্চাশাধিক গ্রন্থপ্রণেতা, রেঙ্গুন ৬ষ্ঠ সঙ্গীতি কারক, ত্রিপিটক বিশোধক' বিনয়াচার্য, বীর্যস্তম্ভ, কর্মবীর, অগ্রমহাপণ্ডিত শ্রীমৎ প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির মহোদয়কে ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে বার্মা সরকার কর্তৃক সগৌরবে প্রদত্ত---'অগ্রমহাপণ্ডিত' অভিধা স্মরণে—এ গ্রন্থ প্রগাঢ় শ্রদ্ধার্ঘ্য স্বরূপ পূজা ও উৎসর্গ করতে পেরে ধন্য ও কৃতার্থ হলাম।

'ত্রিপিটক প্রচার বোর্ড' জিনশাসন ও জনকল্যাণমূলক কাজে ক্রমশ অগ্রসর হচ্ছে। এযাবৎ 'প্রচার বোর্ড' কোন কোন পুস্তক জনসাধারণের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করে আস্‌ছে। 'বৌদ্ধ-নীতিমঞ্জরী' পালি টোলেরঃ ছাত্রদের উপহার প্রদত্ত হচ্ছে। সাধারণের সুবিধার্থ প্রকাশিত পুস্তকের স্বল্প মূল্যই নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রচার বোর্ডের পরিকল্পনা ব্যাপক। এর সফলতা নির্ভর করছে জনসাধারণের সদিচ্ছার উপর। প্রচারবোর্ড প্রত্যেকের সাহায্য ও সহানুভূতি কামনা করে।

জয়তু বুদ্ধ-শাসনং

কার্তিকী পূর্ণিমা
২২শে কার্তিক, ৮ই নবেম্বর
২৫০৯ বুঃ, ১৯৬৫ ইং

শ্রীশীলালঙ্কার মহাস্থবির
বৈদ্যপাড়া শাক্যমুনি বিহার।

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম পরিচ্ছেদ	
পূর্বজন্ম	
১। রুজা—	১
২। কর্মফল—	১৪
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
১। সুমন কুমার—	২৭
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
১। ধনপতি—	৩৮
২। নন্দিকের আত্মদান—	৪৪
৩। নাগরাজের মহানুভাবতা—৫০	
৪। মিত্রামিত্র লক্ষণ—	৫৮
৫। ব্রহ্মদত্তের মহাস্বপ্ন—	৬১
৬। বিদেহ তাপস—	৭২
৭। অপর জন্ম—	৭৮
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	
১। অন্তিম জন্ম—	৮১
(ক) প্রব্রজ্যা—	৮৮
(খ) প্রধান সেবকত্ব লাভ—	৯১
(গ) অষ্টবর লাভ—	৯২
(ঘ) সেবার প্রাত্যহিক সরণী--৯৫	

বিষয়	পৃষ্ঠা
পঞ্চম পরিচ্ছেদ	
বিবিধ বিষয়	
১। গৌতমীর বস্ত্রদান—	৯৭
২। ধর্ম দেশনার পঞ্চনীতি—	১০৩
৩। বরাহ বৎস—	১০৫
৪। শিক্ষণীয় পঞ্চধর্ম—	১০৭
৫। আনন্দ বোধি—	১০৮
৬। রাজান্তঃপুরিকার দেশক-পদে মনোনীত—	১১৫
৭। উপায় কুশলতা—	১১৬
৮। বস্ত্রলাভ—	১১৮
৯। বস্ত্রদান—	১২১
১০। ধর্মপূজা—	১২৩
১১। ভিক্ষুণী প্রথার প্রার্থনা—	১২৪
(ক) অষ্ট গুরুধর্ম—	১৩২
১২। আজীবক ভক্তের সন্দেহ অপনোদন—	১৩৬
১৩। আশ্চর্য গুণ—	১৩৮
১৪। আনন্দ ও চণ্ডালকন্যা—	১৩৯
১৫। পরিব্রাজক ছন্ন ও আনন্দ—	১৫৬
১৬। প্রকৃত অনুকম্পা—	১৫৭
১৭। গুণগন্ধ—	১৫৮
১৮। বুদ্ধনির্ঘোষ—	১৫৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
১৯। আনন্দ ও অভয়—	১৬২
২০। প্রশ্ন সমাধান—	১৬৪
২১। প্রশ্ন ও উত্তর—	১৬৬
২২। গোশৃঙ্গ শালবন—	১৬৭
২৩। বুদ্ধের জন্য প্রাণদানে উদ্যত—	১৬৮
(ক) রোহন্ত মৃগ—	১৭০
২৪। অগ্র উপাধি লাভ—	১৭৩
২৫। মহাপুণ্যবান দেবপুত্র—	১৭৬
২৬। পঞ্চবিধ তেজঃ—	১৭৮
২৭। মার্গফল অভিব্যক্তি—	১৭৯
২৮। দেবরাজ জনবসভ—	১৮১
২৯। নিকৃষ্টতম দোষ চতুষ্টয়—	১৮৪
৩০। মৃত্যু অনিশ্চিত—	১৮৭
৩১। উত্তরোত্তর সম্যক্ প্রচেষ্টা—	১৯০
৩২। ক্ষোভোপশম—	১৯২
৩৩। তীর্থীয় প্রভাব—	১৯৪
৩৪। কূপজল—	১৯৫
৩৫। হেতু ও নিদান—	১৯৬
৩৬। সপ্ত অপরিহানির কারণ--	১৯৯
৩৭। অনন্যশরণ—	২০১
৩৮। দুষ্কৃতাপরাধ—	২০৩
৩৯। পানীয় জলাহরণ—	২১০
৪০। বুদ্ধের অন্তিম জ্যোতিঃ দর্শনে—	২১১
৪১। চুন্দ ও সুজাতার দান মহিমা—	২১৩
৪২। পরমপূজা—	২১৪
৪৩। অনুসন্ধিৎসা—	২১৫
৪৪। চার মহাস্থান—	২১৭
৪৫। মাতৃজাতির প্রতি কর্তব্য—	২১৭
৪৬। বুদ্ধের দেহ-সৎকারে কিংকর্তব্য—	২১৮
৪৭। খেদোক্তি—	২১৯
৪৮। সুদূর অতীতের কুশীনগর—	২২১
৪৯। মল্লগণকে সংবাদ দান—	২২৫
৫০। আনন্দ ও সুভদ্র—	২২৬
৫১। বুদ্ধের অন্তিম বাণী—	২২৮
৫২। শোকে মুহ্যমান—	২৩১
৫৩। প্রখর কর্তব্য জ্ঞান—	২৩২
৫৪। সংগীতিতে আনন্দের স্থান লাভ—	২৩৩
৫৫। অর্হত্ব লাভ—	২৩৪
৫৬। সংগীতি-মণ্ডপে আনন্দ--	২৩৮
(ক) অপরাধ স্বীকার—	২৪২
(খ) ছন্নকে ব্রহ্মদণ্ড দানের প্রস্তাব—	২৪৪
৫৭। উত্তরীয় বস্ত্রলাভ—	২৪৫
৫৮। ছন্নকে ব্রহ্মদণ্ড দান—	২৪৭

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

অন্তিম জীবন

১। ধর্মসংবেগ—	২৪৯
২। পরিনির্বাণ লাভ—	২৫২
৩। অর্হতের দেহাবশেষ—	২৫৮

———

আনন্দ

প্রথম পরিচ্ছেদ

পূর্বজন্ম

রুজা

এক

সুদূর অতীতের কথা। তখন মিথিলা ছিল অতি সমৃদ্ধ নগরী। বিচিত্র সৌধমালা সমাকীর্ণা, শ্রী সৌভাগ্য-সমুন্নতা এ রমণীয়া নগরী যেন লক্ষ্মীর বিলাস-নিকেতন। সৌন্দর্যময়ী প্রকৃতির রম্য-কানন গরীয়সী মিথিলা সর্বৈশ্বর্য সমন্বিত বিদেহ রাজ্যের রাজধানী।

প্রভূত পুণ্য-বিভূতি বিমণ্ডিত মহারাজ অঙ্গতি এ বিদেহ রাজ্যের অধীশ্বর। মিথিলার বক্ষ-রত্ন গৌরব-কেতন হিরণ্যমণ্ডিত স্বর্ণ-সিংহাসন সুরক্ষা করে আসছেন মহারাজ অঙ্গতি সগৌরবে। ইনি শৌর্যে-বীর্যে মহাপরাক্রমশালী। তাঁর দোর্দণ্ড প্রতাপের নিকট নতশির সামন্ত রাজগণ। বীরোচিত অঙ্গ-সৌষ্ঠবে পরিশোভিত রাজাধিরাজ। প্রীতিপ্রদ মনোমোহন দর্শনীয় সুপুরুষ ইনি। রাজধর্মে নিজকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে নৃপবর পালন করছেন প্রজাপুঞ্জ সানন্দে-সযত্নে।

বহুশত লাবণ্যময়ী পত্নী ছিলেন মহারাজের দেবাঙ্গনা সদৃশী। দুর্ভাগ্যের বিষয়, সকলেই সন্তানহীনা। অগ্রমহিষী ছিলেন অতিশয় ধর্মপরায়ণা।

শীলগুণ ছিল তাঁর সমুজ্জ্বল অলঙ্কার, অন্তরের নিধি তাঁর মৈত্রী-করুণা, দানে তাঁর পরমপ্রীতি, সাদরে মোচন করতেন দুঃখীর দুঃখ। প্রার্থনা করতেন সকাতরে---এপুণ্যে যেন তিনি হতে পারেন সন্তানের জননী।

রাজাধিরাজ অঙ্গতির অর্ধাঙ্গিনী মহারাণী অনুপম ভোগৈশ্বর্যের অধিকারিণী হয়েও, আজ তিনি বড়ো দুঃখিনী। নিজকে বড়ো দুর্ভাগিনী বলে মনে করতে লাগলেন, পুত্রহীনা হয়ে। উঃ, কি দুঃখ না জানি গুঞ্জন করে--সন্তানহীনা নারীর অন্তরে!

দীর্ঘদিন অতীত হলো। এবার ফলবতী হলো রাণীর প্রার্থনা। এক শুভক্ষণে জন্ম নিলেন রাজমহিষীর গর্ভে---'তাবতিংস' স্বর্গের জব নামক দেবপুত্রের স্বর্গচ্যুতা প্রিয়তমা পত্নী। পুণ্যময়ী নারীর জন্ম হলো পুণ্যবতীর পুণ্যময় গর্ভে। গর্ভস্থ সন্তানের পুণ্য-প্রভায় মহামঙ্গল সূচিত হলো রাজার রাজ্যে। পূর্ণ হলো ধন-ভাণ্ডার ধনৈশ্বর্যে। সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা হলো বসুন্ধরা। প্রচুর দুগ্ধ দিতে লাগল ধেনু সকল। রাজ্যের সর্বত্র বিরাজ করতে লাগল পরা-শান্তি। রাজা-রাণীর আশাতীত মনস্কামনা পূর্ণ হতে চল্‌ল। এতেই উপলব্ধি হলো---গর্ভস্থ সন্তান নিশ্চয়ই পুণ্যবান।

দশমাস পূত-গর্ভ সুরক্ষা করলেন মহারাণী অক্লেশে-অনাময়ে। তারপর এক শুভমুহূর্তে রাজমহিষী সুখ-প্রসব করলেন, এক কন্যারত্ন। সদ্যোজাত এসন্ততি বিশুদ্ধ মনিনিভ, পুণ্য-দ্যোতক, পুণ্য-লক্ষণ-সমুজ্জ্বল, সুন্দর---অতি সুন্দর! চমৎকৃত হলো দর্শকবৃন্দ।

শূন্য অঙ্ক পূর্ণ হলো রাজা-রাণীর। সাতিশয় আনন্দিত হলেন জনক-জননী; তথা পুরবাসী---রাজ্যবাসী। সানন্দে রাজা দান করলেন প্রভূত দানীয় সম্ভার। সকলেই রাজকন্যাকে মনানন্দে করলেন আশীর্বাদ।

উচ্চস্তরের বহুতর মহার্ঘ উপায়ন পাঠালেন সামন্ত রাজগণ, তথা মহা-ধনাঢ্য সম্ভ্রান্ত প্রজাবৃন্দ। এতদ্দর্শনে আহ্লাদে ভরপূর হয়ে উঠল মায়ের অন্তর। প্রাণপ্রতিমা মেয়েকে বক্ষে জড়িয়ে ধরে স্নেহ-চুম্বনে

অতিষ্ঠ করে জননী গাঢ় স্নেহসিক্ত প্রফুল্লহাস্যে বলে ওঠেন---"সাধনার ধন মা-লক্ষ্মী আমার---বড়ো পুণ্যবতী---ভাগ্যবতী!" নামকরণ দিবসে আদর করে তাঁর নাম রাখা হলো--'রুজা'।

আদরের দুলালী রুজা শশিকলা সম বাড়তে লাগল। বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই সুগঠিত হলো পুণ্য-লক্ষণ লাঞ্ছিত তাঁর অঙ্গ-সৌষ্ঠব। উজ্জ্বল তাঁর গৌরতনু, নিটোল অঙ্গাবয়ব, অপরূপ লাবণ্য, হাসি হাসি মুখখানা মাধুর্যে ভরা, মৃগ-নয়নের মদিরাময় চাহনি, ইন্দ্রধনুনিভ সুনীল ভ্রূযুগল, ভ্রমর-কৃষ্ণ সুদীর্ঘ কেশরাশি, অলক্তক বরণ নখ, চম্পক-কলিবৎ অঙ্গুলিনিচয়। আশ্চর্য দর্শনা এই বিম্বাধরা নারী, দর্শকের প্রাণে যুগপৎ সৃষ্টি করে আনন্দ ও বিস্ময়।

এতো বড়ো রাজপুরীর মধ্যে একমাত্র সন্ততি এ কন্যারত্ন। তাই পুরবাসীর বড়ো আদরিণী এ-মেয়েটি। পিতা অফুরন্ত স্নেহে প্রাণসমা তনয়াকে আচ্ছন্ন করে রেখেছেন। এ রহস্যময়ী মেয়েটিও একাধিপত্য বিস্তার করেছেন পিতার সমগ্র অন্তর্জগতে। রাজা চান আপন দুহিতাকে দেববালা সম সাজিয়ে রাখতে। তাই তিনি প্রতিদিন পাঠিয়ে দিতেন তৎ সন্নিধানে মহামূল্য সুকোমল বিচিত্র ক্ষৌমবস্ত্র, সুন্দর সুবাসিত কুসুম নিচয়, আরো কতো উৎকৃষ্টতম বিলাসসামগ্রী। এক সহস্র মুদ্রা দিতেন প্রতিপক্ষে উপোসথ দিবসে, তা যেন ইচ্ছামত তিনি দান করতে পারেন।

রুজা ছিলেন জাতিস্মর জ্ঞান সম্পন্না। ভুলতে পারেন নি তিনি দেব-লোকের সেই দিব্য-সুখের অবিস্মরণীয় অপূর্ব কথা। আবার যেন তিনি হতে পারেন সেই দিব্য-সুখেরই অধিকারিণী, এটাই তাঁর একমাত্র কামনা। তাঁর এ বলবতী বাসনা অন্তরের নিগূঢ়তম প্রদেশে নিহিত রেখে পরম শ্রদ্ধা ও ঐকান্তিক আগ্রহে সতত কুশল সঞ্চয়ে নিজকে নিযুক্ত রাখতেন। আত্ম-সুখের প্রতি তিনি স্বতঃই উদাসীনা। পরকে কিরূপে সুখী করতে পারেন, তৎপ্রতিই ছিল তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। অন্নহীনকে অন্ন, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র-দানে

এবং পীড়িতের সেবায় তাঁর অপার আনন্দ। নশ্বর-দেহের বাহ্যিক বিভূষণ হতে শীল-ভূষণকেই তিনি শ্রেষ্ঠ মনে করতেন। কল্যাণকর কুশল সম্পাদনে তাঁর অবারিতদ্বার। অমরাপুরের পূর্ব স্মৃতি জাগ্রত রেখে সতত মনানন্দে পুণ্যার্জনে ব্যাপৃত থাকেন রুজা।

দুই

আজ কার্তিকী পূর্ণিমা। প্রতি বৎসর এশুভ তিথিতে মহোৎসবের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে মিথিলায়। অলকাপুরীসম তখন সুসজ্জিত করা হয় মিথিলা নগরী। নগর বাসীর প্রাণে আজ আনন্দের সাড়া পড়েছে। নানা রঙের পতাকা ও তোরণ-মাল্যে বিভূষিত হয়ে রাজধানী বড়ো শোভা পাচ্ছে। বৈচিত্র্যময় সাজে সজ্জিত হয়েছে রাজ প্রাসাদ। উৎসবামোদিত রাজপুরী। সায়াহ্নে সমাগত হয়েছেন অমাত্যবৃন্দ। স্নাত ও উৎসব বেশে সজ্জিত নৃপবর দ্বিতল প্রাসাদে পারিষদ পরিবৃত হয়ে রাজাসনে সমাসীন হলেন।

সম্পাদিত হলো উৎসবের অঙ্গীভূত প্রীতিভোজ। তারপর সকলে সুখালাপে হলেন প্রবৃত্ত। নভোমণ্ডলে পূর্ণ শশধর, নিম্নে দীপান্বিতা নগরী, সৌধে সৌধে দীপমালা, গীত-বাদ্যে রাজধানী মুখরিত, সুরভি অগুরুধূমে বাতাস আমোদিত।

বিদেহপতির প্রগাঢ় দৃষ্টি আকর্ষণ করল পূর্ণচন্দ্র। শশাঙ্কের স্নিগ্ধোজ্জ্বল ধবল-জ্যোৎস্নায় ধরাতল আলোকিত। চন্দ্রিকোদ্ভাসিত প্রকৃতির মনোমোহিনী-শোভা রাজার প্রাণে জাগিয়ে তুল্‌ল পুলক-শিহরণ। এ অপূর্ব-দৃশ্য তিনি মুগ্ধনেত্রে নিরীক্ষণ করলেন। অতঃপর অমাত্যদের দিকে ফিরালেন তাঁর শান্ত-প্রসন্নোজ্জ্বল চক্ষু। বললেন স্মিত-মধুর কণ্ঠে---"আহা, কী সুখদা জ্যোৎস্নাময়ী রজনী, দেখুন অমাত্যগণ! অপূর্ব শোভা ধারণ করেছে চন্দ্রিকা-বিধৌত ধরণীতল! বলুন তো আপনারা, কোন্ উপায় অবলম্বন করলে আজিকার এ আনন্দদায়িনী উৎসব-রজনীর যথোচিৎ সদ্ব্যবহার করা হবে?"

রাজ-সভায় অমাত্যদের মধ্যে তিনজন ছিলেন প্রধান অমাত্য। তাঁদের নাম---বিজয়, সুনামা ও অলাত। এঁরাই বিচক্ষণ বুদ্ধিমান, পণ্ডিত ও শাস্ত্রজ্ঞ বলে রাজসভায় খ্যাত ছিলেন। রাজার প্রশ্ন শুনে সেনাপতি অলাত দাঁড়ালেন, যুক্তকরে উত্তর প্রদান করলেন তাঁর স্বভাব-সুলভ বীর-কণ্ঠে, অথচ বিনীত-বাক্যে---"মহারাজ, আনন্দ দিবসে আনন্দময় কাজ করাই সুবুদ্ধির পরিচায়ক। যেসব রাজা এখনও আপনার পদানত হয়নি, তাদের পদানত করতে দিগ্বিজয়ী সেনাবাহিনী নিয়ে এ উৎসব-রজনীতে যুদ্ধ যাত্রা করা হোক।"

অলাতের এ অপ্রীতিকর বাক্য শ্রবণে সুনামা কৃতাঞ্জলিপুটে বললেন---"রাজাধিরাজ, আপনার আবার শত্রু কোথায়? যারা ছিল, তারা তো এখন বশ্যতা স্বীকার করেছে। এ উৎসবমুখর রজনীতে যুদ্ধ আয়োজন নিতান্তই অশোভন। বরং উৎকৃষ্টতম খাদ্য-ভোজ্য ও নৃত্য-গীতে আনন্দোপভোগ করাই সুসঙ্গত হবে।"

সুনামার অসার-বাক্য শ্রবণে বিজয় সবিনয়ে বললেন---"সর্বাধিপতি মহীপাল, অভাব কিসের আপনার? প্রভূত ভোগ, বিলাস ও সুখৈশ্বর্যের অধিকারী যিনি, তাঁর পক্ষে এজগতে চর্ব্য; চূষ্য, লেহ্য ও পেয়ই হোক, অথবা নৃত্য-গীতই হোক, কিছুই তো দুর্লভ নয়। সুনামার প্রস্তাব নিতান্তই অসঙ্গত। আজিকার উৎসব-রজনী সার্থক হবে, যদি সাধু-সজ্জনের দর্শন লাভ ও তাঁদের ধর্ম-বাণী শ্রবণ করা হয়। এতেই হবে একাধারে আনন্দ লাভ, অশ্রুত বিষয় শ্রবণ, সন্দেহ ভঞ্জন ও জ্ঞানার্জন।"

সচিব বিজয়ের প্রস্তাব রাজার মনঃপূত হলো। সোৎসাহে জিজ্ঞাসা করলেন রাজা---"কার নিকট যাবো আমরা? আমার প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করে কোন্ সজ্জন আনন্দ বিধানে সমর্থ হবেন?"

অলাত বল্লেন--"মহারাজ, বারাণসীতে এক উলঙ্গ সন্ন্যাসী অবস্থান করছেন। তাঁর নাম হলো--'গুণ'। ইনি খ্যাতনামা পণ্ডিত, শাস্ত্র বিশারদ,

বহু শিষ্যের আচার্য ও সুবক্তা। একমাত্র ইনিই আপনার প্রশ্নের সদুত্তর দিতে সক্ষম হবেন।''

নৃপতির হৃদয়গ্রাহী হলো অলাতের কথা। তৎসন্নিধানে যাবার জন্য সপারিষদ রাজা প্রস্তুত হলেন। রথ সজ্জিত হলো যথাসত্বর। সৈন্য পরিবেষ্টিত হয়ে অমাত্যগণ সমভিব্যাহারে ভূপতি রথারোহণে বারাণসী অভিমুখে যাত্রা করলেন। যথাসময়ে তিনি গুণের নিকট উপনীত হয়ে তাঁকে অভিবাদন করে একান্তে উপবিষ্ট হলেন। প্রথমে উভয়ের প্রীতি বিনিময়ের পর রাজা গুণকে সগৌরবে জিজ্ঞাসা করলেন---''গুরুদেব, কয়েকটা জটিল বিষয়ে সংশয়াবিষ্ট হয়েছি আমি। দয়া করে এজটিল তত্ত্বের মর্মোদ্‌ঘাটন করে আমায় কৃতার্থ করবেন। আমার প্রশ্ন হলো---মাতা, পিতা, স্ত্রী, পুত্র, শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, সৈন্যগণ ও প্রজাদের সহিত কিরূপ আচরণ করতে হয়? কোন্ ধর্ম রক্ষা করলে সুগতি লাভ হয়? কি কারণে মানুষের অধোগতি হয়? কোন্ অধর্ম আচরণে মানুষকে ভীষণ নরকে দুর্বিসহ দুঃখ ভোগ করতে হয়?''

রাজার জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন হলো, বুদ্ধ অথবা বুদ্ধশ্রাবকের বিষয়বস্তু। অথচ তা জিজ্ঞাসা করলেন---একজন নিতান্ত অজ্ঞ, নগ্নতা মাত্র সর্বস্ব, হতশ্রী সন্ন্যাসীকে। তদ্ধেতু রাজার প্রশ্নোত্তরে সন্ন্যাসী 'গুণ' বর্ণনা করলেন নিতান্ত অসঙ্গত ভাবে আপন উচ্ছেদবাদ, ভোজন-পাত্রে মল প্রক্ষেপ সদৃশ। বললেন গর্ব-মিশ্রিত অকুণ্ঠ-কণ্ঠে---''মহারাজ, যা একান্ত সত্য, তা আপনাকে বলবো, আপনি মনঃসংযোগ করুন---

'এ জগতে ধর্মাধর্ম বলতে কিছুই নেই। পাপ-পুণ্যের ফল-ভাগীও কেউ হয় না। পরলোক বলতেও কিছু নেই। বলুন না আপনি, কেই বা ফিরে এসেছে পরলোক থেকে? 'মাতা-পিতা' এসব অনর্থক কথা। কেউ কারো হতে পারে না মাতা-পিতা। আচার্য-গুরুও হতে পারে না কেউ। সকল জীবই এক সমান। কেউ কারো হতে পারে না পূজ্য আর পূজক। বল-বীর্য-পুরুষকার এসব অনর্থক কথা। জীব মাত্রই

নিয়তির দাস। নিয়তিকে অনুসরণ করে মাত্র জীবগণ। অদৃষ্টে যা আছে, তাই ঘটে মাত্র। এতে দানের প্রভাব আছে মনে করা নিতান্তই ভুল। দানের কোনও ফল নেই মহারাজ। হীনবীর্য নির্বোধেরাই দান করে মাত্র।''

সপারিষদ রাজা বসে আছেন চিত্রার্পিতবৎ। গুণের কথা শুনে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়লেন। ইতিপূর্বে তিনি শুনেননি কখনও এমন চমকপ্রদ বাণী। চাপাস্বরে রাজা বলে উঠলেন---''আশ্চর্য, কী চমৎকার কথা!''

গুণ তখন স্মিত-গর্বোজ্জ্বল কণ্ঠে বললেন---''শুনুন মহারাজ, অদ্বিতীয় সারবাণী---ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, বায়ু, সুখ, দুঃখ ও আত্মা---এ সপ্ত পদার্থের ধ্বংসও নেই, বিকারও নেই। এসব নিত্য এবং অচ্ছেদ্য।

সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রে যদি কারো মস্তক ছিন্ন করা হয়, এতে উক্ত সপ্ত পদার্থের কিছুই তো বিনাশ প্রাপ্ত হয় না। সপ্ত পদার্থে সপ্ত পদার্থ মিশে যায় মাত্র। বলুন তবে মহারাজ, হত্যা করলে পাপ কিরূপে হবে? ভোগ করতে হবে কেন পাপের ফল?

পাপী হোক বা পুণ্যবানই হোক, সংসারে জন্ম নিতেই হবে চতুরশীতি মহাকল্প। ইত্যগ্রে কারও ঘটে না শুদ্ধি লাভ। তৎপর আপনা থেকেই জীবকুলের শুদ্ধি লাভ ঘটে।'' এসব বাক্যে সন্ন্যাসী 'গুণ' ভ্রান্তিজাল প্রকাশ করলেন মাত্র।

সপারিষদ রাজা বিস্ময়-মুগ্ধ বাক্যে গুণের প্রশংসা করতে লাগলেন। সকলেই সর্বান্তঃকরণে অনুমোদন করলেন গুণের বিচিত্র কথা। অমাত্য অলাত প্রসন্ন কণ্ঠে বল্লেন---''যথার্থই বলেছেন গুরুদেব, এখনো আমার স্মৃতিপথে জাগ্রত রয়েছে পূর্ব জন্মের ইতিবৃত্ত। কর্ম নিবন্ধনে তখন আমি কাশীরাজ্যে ব্যাধকুলে জন্ম নিয়েছিলাম। পশুপক্ষী অগণন প্রাণী-হত্যা করে কতই না পাপ সঞ্চয় করেছিলাম। সে জন্মের অবসানে

নরকে না গিয়ে দুর্লভ এ মানব জন্ম লাভ করেছি। কী সৌভাগ্য আমার, সেনাপতি হয়ে যশঃ-গৌরবে বিমণ্ডিত হয়েছি। এতেই তো প্রমাণ হচ্ছে—পাপের ফল যে, ভোগ করতে হয়, একথা সম্পূর্ণ মিথ্যা।" *

সে'সভায় তখন বীজক নামে এক দাস উপস্থিত ছিল। মিথিলায় সে নিতান্ত দরিদ্র। অপিচ, সে খুব ধর্ম পরায়ণ। সেদিন সে উপোসথ শীলে অধিষ্ঠিত হয়ে ধর্ম শ্রবণ মানসে গুণের নিকট এসেছিল। তাঁর উপদেশ ও অলাতের মর্মবাণী শুনে এর অন্তরে বিষম ভাবোদয় হল। তাই সে দীর্ঘ-শ্বাস ছাড়তে লাগল ঘন-ঘন। দুই গণ্ড বেয়ে ঝরতে লাগল অশ্রু। আশ্চর্য হলো সকলে। নরপতি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"কি হে, রোদন করছো কেন?"

বীজক বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললে—"শুনুন মহারাজ, আমার দারুণ মর্ম যাতনার কথা। এর অব্যবহিত পূর্বজন্মে আমি কি ছিলাম, কী বা করেছিলাম; সবই আমার স্মৃতি-পটে সুস্পষ্ট অঙ্কিত রয়েছে। বড়ো সুখী ছিলাম সেজন্মে আমি। ছিলাম মহাধনাঢ্য, তথা গৌরবোজ্জ্বল ছিল আমার পুণ্যময় জীবন। তখন আমি 'ভাব শ্রেষ্ঠি' নামেই ছিলাম সুপরিচিত। ধর্মাচরণেই রত থাকতাম অনুক্ষণ। কুশলকর্মই ছিল আমার একমাত্র অবলম্বন। দানে ছিল বড়ো উৎসাহ-আনন্দ। এতো করলাম, তবুও নৃপমণি, সেজন্মের অবসানে এসে পড়লাম দুঃখিনী-নারীর গর্ভে, যিনি এ মিথিলায় চির-দাসী! দীনা-হীনা মায়ের গর্ভে জন্ম নিয়ে,

---

* এ অমাত্য অলাত কেবল অব্যবহিত পূর্ববর্তী একমাত্র জন্মের কথাই স্মরণ করতে পারতেন। সম্পূর্ণ জাতিস্মর হলে দেখতে পেতেন যে, অতীত এক জন্মে তিনি কশ্যপ বুদ্ধের পূতাস্থি (শারীরিক ধাতু) নিহিত চৈত্য পুষ্প-মাল্যে পূজা করেছিলেন। এ পুণ্য ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মতো বহুকাল অপর কর্মের দ্বারা আবৃত ছিল। শেষে ব্যাধ-জন্মের অবসানে তা প্রকটিত হয়ে, তৎপ্রভাবেই মানব জন্ম লাভ করে সেনাপতিপদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

দৈন্য হলো আমার আজন্মের সাথী! তবুও আমি অন্তরের শান্তি রেখেছি অব্যাহত। অকাতরে দিচ্ছি দান। কোনও বুভুক্ষু ভিখারী যদি উপস্থিত হয়, অম্লান বদনে তা'কে দিয়ে থাকি আমার অংশের শাকান্নের অর্ধভাগ। সারাজীবন পালন করে আসছি পূর্ণিমা ও অমাবস্যার উপোসথ। প্রাণপণে রক্ষা করছি অহিংসা ব্রত। কিন্তু নৃপবর, সবই নিষ্ফল, সবই বিফলে পর্যবসিত হয়েছে আমার শীল, ব্রত ও কুশলকর্ম! যা বললেন গুণ ও অলাত, তা দেখছি একান্তই সত্য। কি করলে যে, সুগতি লাভ হবে, তা ঠিক করে ওঠা বড়ো জটিল সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটাই হলো আমার ক্রন্দনের মুখ্য কারণ।" *

মহারাজ অঙ্গতি এসব কথা শুনে বিষম ভ্রমে পড়লেন। মিথ্যা ধারণার বশবর্তী হলেন তিনি। তাঁর অন্তর থেকে নিঃশেষে বিলুপ্ত হলো সত্য-দর্শন। এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন তিনি---"তাড়াতাড়ি সুগতি লাভের চেষ্টা করা অজ্ঞতা মাত্র। সুখ-দুঃখ দেখছি সবই নিয়তির হাতে। চতুরশীতি মহা-কল্পের পর যদি স্বভাবতঃই শুদ্ধি লাভ ঘটে, তবে আর কল্যাণ-ধর্মের প্রয়োজন কি? এতোদিন প্রচুর অর্থ দান এবং কুশলকর্ম আচরণ করে বড়োই ভুল করেছি। সবই অনর্থে হয়েছে পর্যবসিত।"

সন্ন্যাসী গুণকে সম্বোধন করে নৃপতি স্মিত মুখে বল্লেন---"প্রভো, উপযুক্ত গুরুর অভাবে এতোদিন আমরা ছিলাম বড়োই ভ্রমান্ধ। এবার পেয়েছি মহাগুরু, যিনি অদ্বিতীয় জ্ঞানবান। এখন হতে আপনার এ অমূল্য উপদেশ যথাযথ পালন করবো। সুতরাং আজ থেকে অহোরাত্র কেবল নিমগ্ন

* এ বীজক দাস অব্যবহিত পূর্ববর্তী এক জন্মের বৃত্তান্তই কেবল স্মরণ করতে পারতো। অতীত এক জন্মে কশ্যপ বুদ্ধের সময়ে সে যে, একজন ভিক্ষুকে তিরস্কার করেছিল এবং সে'পাপ যে, এতোদিন প্রচ্ছন্ন থেকে এজন্মে তাকে দুর্গত করেছে, সে এটা জানে না।

থাকবো ভোগ আর বিলাসে, নারী আর মদ্যে। দয়া করে আপনি এখানেই অবস্থান করুন। আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ কোনও দিন হলেও হতে পারে। এবার আমরা আসি।"

সপারিষদ বিদেহপতি প্রস্থান করলেন। বিদায় কালে প্রণামটি পর্যন্ত কেউ করলেন না সন্ন্যাসীকে। কারণ, সকল জীব যখন সমতুল্য, কেউ যখন হতে পারে না পূজ্য বা পূজক, কোনও ফল নেই যখন প্রণামের, তবে আর কেন প্রণাম? প্রণামটি পর্যন্ত হারালেন গুণ, নিজের নির্গুণতার দরুণ। খাদ্য-ভোজ্য লাভ তো দূরের কথা।

তিন

আগামীকল্য অমাবস্যার উপোসথ। এদিনটি রাজকন্যা রুজার বড়োই প্রীতিকর। প্রতি উপোসথ দিবসে সযত্নে তিনি পালন করেন উপোসথ শীল। মনের আনন্দে করেন দান। দানে তাঁর কতো আগ্রহ, কতো উৎসাহ। উৎফুল্ল অন্তরে তিনি যখন নিরত থাকেন দানে, তাঁর কমনীয় কান্তিময় মুখের ফুল্ল-মধুর হাসি তখন সকলকেই করে মোহিত ও চমৎকৃত।

আজ দু'সপ্তাহ অতীত হতে চললো, এ যাবৎ রুজা পিতৃ দর্শনে বঞ্চিতা। সন্ন্যাসীর নিকট হতে ফিরে আসা অবধি, কেমন যেন অন্যরূপ হয়ে গেছে রাজার মনের অবস্থা। রাজ্য পরিচালনার গুরু দায়িত্বের প্রতি বিন্দুমাত্রও তাঁর ভ্রুক্ষেপ নেই। মন্ত্রীর হস্তে সকল কার্যের ভার অর্পণ করে তিনি নিশ্চিন্ত মনে চন্দ্রক নামক রাজপ্রাসাদে অহর্নিশ ইন্দ্রিয় সুখেই নিমগ্ন আছেন, নন্দনকাননে নয়নাভিরমা দেবাঙ্গনা সেবিত সুরপতির মতো।

রাজনন্দিনী রুজার অন্তরে হলো চাঞ্চল্যের সৃষ্টি। কারণ, আগামী কল্য উপোসথের দিন। দীন-দুঃখীকে দান করতে হবে। পূর্বরীতি অনুসারে সহস্র মুদ্রা তাঁর প্রয়োজন। অপরাহ্ন সমাগত, দানীয় অর্থ এখনো

তাঁর হাতে এলোনা। চিন্তান্বিতা হলেন রাজকন্যা। অগত্যা পিতৃ সদনে যেতে হবে, এ সিদ্ধান্তে তিনি উপনীত হলেন। ধাত্রীকে ডেকে বললেন—"আমি পিতার নিকট যাবো। সখীগণকে সত্বর প্রস্তুত হতে বলো। আমার বস্ত্রালঙ্কার নিয়ে এসো।"

ধাত্রী যথাযথ প্রতিপালন করল প্রভুকন্যার আদেশ। রুজার অনিচ্ছা সত্ত্বেও ধাত্রী তাঁকে অপূর্ব সজ্জায় সজ্জিত করল। হীরা, মুক্তা ও মণিময় আভরণে করল বিভূষিত। দীপ্তোজ্জ্বল রেশমী শাড়ীখানা দিল পরিয়ে। বেষ্টিত হয়ে তাঁর গৌরতনু ঝল্‌মল্ করতে লাগল শাড়ীখানা। শঙ্খ-শুভ্র নিটোল কণ্ঠে দুল্‌তে লাগল তেম্‌নি নিটোল উজ্জ্বল মুক্তামালা। সুদূরের তারার মতো রহস্যময় আকর্ণ বিশ্রান্ত করা দীর্ঘায়ত উজ্জ্বল আঁখি দু'টি কাজল-রঞ্জিত হয়ে সৃষ্টি করল অপূর্ব শোভা। রুজা ষোড়শী যুবতী। তাঁর অশান্ত যৌবনের প্রস্ফুটিত কুসুম-সুষমা দিব্য-কান্তিসম দীপ্ত-প্রভায় উদ্ভাসিত হলো রাজপুরী। শারদীয় নিশির জ্যোৎস্নার মতো মনোহর মদিরতা মাখান তাঁর রূপ, চমৎকার—অতি চমৎকার! মুগ্ধ-বিমুগ্ধ হলো দর্শকবৃন্দ।

রাজনন্দিনী সখীগণ সমভিব্যাহারে নারী-সুলভ লীলায়িত গতিছন্দে ধীর-মন্থরে চন্দ্রক প্রাসাদে হলেন উপনীত। সখীগণ সহ আনত-মস্তকে প্রণত হলেন পিতৃ চরণে। সুবেশা-সুরূপা সহচরী পরিবৃতা মনোরমা রুজাকে হঠাৎ দর্শনে অপ্সরা-পরিবৃতা অনুপমা ঋদ্ধিমতী দেববালা বলে রাজার ভ্রম হলো। নির্নিমেষ বিস্ফারিত নেত্রে স্বীয় তনয়ার পানে চেয়ে চিন্তা করলেন নৃপবর সবিস্ময়ে—"সত্যই কি দেবকন্যার আবির্ভাব হলো মর্ত্য-ধামে!' ভ্রম বিদূরিত হলো পরক্ষণেই। চিন্‌তে পারলেন আপন তনয়াকে। অপলক মুগ্ধ-নেত্রের স্নিগ্ধ-শান্তোজ্জ্বল স্নেহ-দৃষ্টি কন্যার প্রতি নিবদ্ধ করে গরিষ্ঠ আত্মশ্লাঘায় চিন্তা করলেন মহীপাল—"পরম সৌভাগ্য আমার, এহেন কন্যারত্ন নিশ্চয়ই স্বর্গচ্যুতা দেববালা!"

প্রফুল্ল-আননে শুচি স্মিত-হাস্যে গাঢ় স্নেহসিক্তস্বরে তনয়াকে জিজ্ঞাসা করলেন—"কল্যাণি! সুখে আছো তো? কোনোও অভাব নেই তো

তোমার? সুদুর্লভ বস্তুও যদি পেতে ইচ্ছা করো, তা পূর্ণ করে দেবো যথাসত্বর। মা, তুমিই আমার একমাত্র দুর্লভ রত্ন, সাধনার ধন। এজগতে তোমাকে অদেয় কিছুই নেই।"

রাজনন্দিনীর চক্ষে আনন্দের বিজলী খেলে গেল। তাঁর উৎফুল্ল আননে স্মিত-হাসির মোহন-রেখা লাঞ্ছিত করে পিক-বিনিন্দিত কোমল-মধুর কণ্ঠে বললেন---"যার পিতা রাজাধিরাজ, তার আবার কিসের অভাব বাবা! আপনার অপ্রতিম কৃপাবলে আমি পরম সুখী। যে নারী ধর্মপাল রাজেন্দ্র-নন্দিনী, সে কতো বড়ো ভাগ্যবতী-পুণ্যবতী! একমাত্র আমিই তো পিতঃ, সে সৌভাগ্যের অধিকারিণী! আপনার স্নেহ, মমতা, করুণা ও আশীর্বাদ আমার শিরে নিত্য বর্ষিত হচ্ছে, বাদল ধারার মতো। সে কথা স্মরণেও আনন্দে নেচে ওঠে আমার হৃদয়।

বাবা, আপনার করুণায় প্রতি উপোসথে আমি দান দিয়ে আসছি দীন-দুঃখীকে। সে সৌভাগ্য হতে কখনো বঞ্চিতা হইনি। আগামী কল্য উপোসথ। এ পবিত্র তিথিতেও দান দেবার আমার একান্ত ইচ্ছা। পূর্বের মতো যেন সহস্র মুদ্রা আমি লাভ করতে পারি, দয়া করে পিতঃ, সে আদেশ প্রদান করুন।"

রুজার প্রার্থনা শুনে রাজার মুখে ফুটে উঠল ঈষৎ তিক্ততার আভাস। উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল চোখের স্বাভাবিক শান্ত-দৃষ্টি। ললাট কুঞ্চিত হলো। বললেন গম্ভীর স্বরে---"মা, দান করা নিরর্থক। কোনো ফল নেই এতে। এতোদিন দান করে বিনষ্ট করেছো বহু অর্থ। উপবাসী থেকে উপোসথের কী প্রয়োজন? অনশনে পুণ্য হয়, এমন অলীক কথা মূর্খ জনেই বলে থাকে। লক্ষ্মী মা আমার, অনশনে প্রয়োজন কি?

মহাজ্ঞানী গুণ, অলাত আর বীজকের কথা শুনে আমি সবই বুঝেছি। কোনও ফল নেই উপবাসের। উপবাস থেকো না তুমি আর কোনো দিন। জেনে রেখো ---পরলোক, সুগতি অথবা দুর্গতি বলে এজগতে কিছুই নেই।

চতুরশীতি মহাকল্প সংসারে পরিভ্রমণের পর জীবকুল আপনা হতেই শুদ্ধ হয়। আমি-তুমি সবাই নিয়তির দাস। যেদিন কাল পূর্ণ হবে, সেদিন জীবগণ স্বভাবতঃই মুক্ত হবে। এটা নিয়তির বিধান। তবে কেন আর দান-ধর্ম, ব্রত-উপবাস ?''

পিতার কথা শুনে প্রমাদ গণলেন রুজা। বিস্ময়ে স্তম্ভিত হলেন তিনি। মর্মান্তিক দুঃখে হলেন অভিভূত। তাঁর স্বাভাবিক প্রসন্নোজ্জ্বল হাস্যময় মুখখানা বিমর্ষ হয়ে গেল, মেঘ-মেদুর আকাশের মতো। নরেন্দ্রের প্রত্যেকটি কথা কশাঘাতের মতো অনুভূত হল। নৃপসুতা কিন্তু, বিদুষী ও বুদ্ধিমতী। তিনি ধৈর্য-হারা হলেন না। চিন্তা করলেন সংযত চিত্তে--- ''যে পিতা জ্ঞানবান, ধর্মবিদ ও ধর্মপরায়ণ ছিলেন, তাঁর এখন মতিভ্রম ঘটেছে গুণের সংস্রবে! কিন্তু আমাকে যত্নশীল হতে হবে, অবলম্বন করতে হবে উপায়-কুশলতা। যা'তে আমার স্নেহশীল পিতার বিদূরিত হয় বিমতি-বিভ্রান্তি; চিত্ত-ভাব যেন হয় বিশোধন; উপলব্ধি হয় যেন সত্যদর্শন।''

ধীরে ক্রমশঃ রাজদুহিতার মুখের ম্লানভাব কেটে গেল। চিত্ত-গ্লানি হলো তিরোহিত, শক্তি ও উৎসাহ হলো জাগ্রত, প্রাণ মুখর হয়ে উঠল সত্য-সুন্দরের নিগূঢ়-তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন কল্পে। তাঁর আনত-আনন ধীরে ধীরে তুললেন। মুখে একটু স্মিত হাস্য-রেখা টেনে এনে পিতার প্রতি শঙ্কিত-দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বীণার ঝঙ্কারের মতো ঈষৎ কম্পিত কণ্ঠে বললেন--- ''পিতঃ, আমার বিনীত অনুরোধ, আপনার স্নেহ-পুষ্ট এ মতিহীনা মেয়ের ধৃষ্টতা মার্জনা করবেন। আমার অশান্ত-চিত্তের বেদনা-মিশ্রিত কতিপয় মর্মবাণী আপনার সকাশে ব্যক্ত করতে ইচ্ছা করেছি; দয়া করে অধীনার নিবেদন শ্রবণ করুন---বাবা, অলাত ও বীজক এ দু'জন বড়ো জড়মতি। মহামূর্খ গুণের কথা শুনে এরা মোহগ্রস্ত হয়েছে। যে ব্যক্তি মূর্খের সেবা করে, সেও মন্দবুদ্ধি পরায়ণ হয়। মূর্খনর মূর্খের সংসর্গে মূর্খতর হয়ে পড়ে। আপনি তো বাবা, প্রজ্ঞাবান ও ধর্মবিদ্; মূর্খের এ মিথ্যাবাদ কেন আপনি বিশ্বাস করলেন? প্রাণীদের যদি বহু জন্ম-জন্মান্তর পরে স্বভাবতঃই

শুদ্ধিলাভ ঘটে, তবে গুণের প্রব্রজ্যা নিষ্ফল নয় কি? সে নির্লজ্জ মহামূর্খ মুক্তির আশায় উলঙ্গ কেন রয়েছে? ওর কঠোর তপস্যারও বা প্রয়োজন কি?

অজ্ঞ নর মিথ্যা বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে বিবিধ পাপে লিপ্ত হয়, ফলে মহাদুঃখ ভোগ করে। দুর্মতি পরায়ণ পাপভারে ভারাক্রান্ত হয়ে জ্বলন্ত নরকে নিমগ্ন হয়। পিতঃ, অলাতের পাপ এখনো পূর্ণ হয়নি। অপিচ, ওর পূর্ব জন্মার্জিত পুণ্য-শক্তিও হ্রাস হয়নি। তাই তিনি এ জন্মে ঐশ্বর্য-শালী হয়ে সুখী হলেও, ক্রমশঃ কিন্তু, তাঁর পূর্ব সঞ্চিত পুণ্যরাশি ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে। অধিকন্তু, এ জন্মে হয়েছেন পাপ পরায়ণ। আর অধিক বিলম্ব নেই; ঘনিয়ে আসছে তাঁর জ্বলন্ত-দুঃখের দহনজ্বালা। অচিরেই হবে এ সুখের অবসান। এ জন্মের পর বিবর্তিত হবে অলাতের কর্মচক্র। মৃত্যুর পর নিশ্চয়ই তিনি দুঃখদায়ক অপায়ে জন্ম নেবেন।

আর বীজক? তার এতো দুঃখ কেন? নিয়ত যে কুশলেই রত আছে, সে কেন এমন দুঃখ ভোগ করবে? নিশ্চয়ই তার পূর্ব জন্মার্জিত পাপকর্ম বিদ্যমান রয়েছে। ক্রমশঃ কিন্তু, ক্ষয় পাচ্ছে তার পূর্বপাপ। অধিকন্তু, সে এখন পুণ্যার্জনেই নিরত আছে। সুতরাং ওর ভাবী জীবন নিশ্চয়ই সুখময় হবে।

যাঁরা সুগতি লাভের ইচ্ছা করেন, পুনঃ পুনঃ পুণ্য সঞ্চয় করা তাঁদের একান্ত কর্তব্য। পুণ্যই সুখের উৎস। পিতঃ, আপনি গ্রহণ করবেন না মূর্খগুণের অলীক কথা। করবেন না কখনও কুমার্গের অনুসরণ। পাপীর সংসর্গে পাপের হয় অভিবৃদ্ধি। পাপী ভোগ করে পাপের দারুণ দণ্ড।"

কর্ম ফল

রাজনন্দিনী রুজা স্বীয় কর্মফল বর্ণনায় প্রবৃত্ত হয়ে বললেন—"বাবা, স্মরণ আছে আমার অতীত সপ্ত জন্মের কাহিনী। কী যে দারুণ দুঃখ

ভোগ করেছিলাম সেই সপ্ত জন্মে, তা স্মৃতিপথে জাগ্রত হলে, শরীর হয় রোমাঞ্চিত, অন্তরে হয় ভীতির সঞ্চার। এতদ্ব্যতীত তৎপরবর্তী বর্তমান জন্ম সহ সপ্ত জন্মের সবিশেষ তত্ত্ব আমি জ্ঞাত আছি। শুনুন পিতঃ, আমার কর্মের বিচিত্র বিপাক, পুণ্যের সুখময় পুরস্কার, আর পাপের কিরূপ নিদারুণ পরিণতি।

১। অতীত সপ্তম জন্মে---মগধের রাজগৃহে কর্মকার পুত্ররূপে আমি জন্ম নিয়েছিলাম। সে জন্মে আমার সহিত স্বতঃ এসে মিলেছিল এক পাপমিত্র। ওর সংসর্গে এসে আমি মহাপাপে লিপ্ত হয়েছিলাম। মোহাচ্ছন্ন হয়ে মগ্ন হয়েছিলাম ইন্দ্রিয় সেবায়। উভয়েই পরস্ত্রী হরণ করে ব্যভিচার পাপে নিজকে সানন্দে দিয়েছিলাম আহুতিদান। কি যে হবে এর পরিণাম ফল, তা'কি আর চিন্তা করেছিলাম? যুক্তি সঙ্গতও মনে করিনি চিন্তা করা। মৃত্যুর কথা কি তখন স্মরণ ছিল! কতোই না মধুর মনে হয়েছিল এ পাপকর্ম। অসৎ সংসর্গের এমনি প্রভাব! তখন পাপ-স্রোতে নিজকে ভাসিয়ে দিয়ে, জলাঞ্জলি দিয়েছিলাম দুর্লভ মানব-জীবন।

২। সম্প্রতি প্রচ্ছন্ন রয়ে গেলো এ মহাপাপের ফল, ভস্মাচ্ছন্ন অনলের মতো। সে জন্মের অবসানে কৌশাম্বী নগরে মহাধনাঢ্যের পুত্ররূপে জন্ম নিয়েছিলাম। ধনী ঘরের দুলাল আমি, এক মাত্র সন্তান। তাই আমার কতো আদর, কতো যত্ন। পরম সুখময় হয়েছিল আমার সে জন্ম। সৌভাগ্যোদয়ের চিহ্ন স্বরূপ সেই জন্মে আমি লাভ করেছিলাম এক কল্যাণ-মিত্র।

সজ্জনের সংসর্গ লাভে আমার জীবন হয়েছিল সার্থক। কল্যাণ-মিত্র সুখের উৎস, শান্তির প্রস্রবণ। সৎ পুরুষের শান্তিময়ী-বাণী সন্তাপ নাশক। কল্যাণ-মিত্রের হিতোপদেশে নিজকে নিয়োজিত করেছিলাম কুশলধর্মে। তখন আমার অন্তর হয়েছিল পবিত্র ও ধর্ম পরায়ণ। দান, শীল ও উপোসথ ব্রতে জীবনকে করেছিলাম পূত-পুণ্যময়। সে জন্মে আমার অপ্রমাণ পুণ্যরাশি সঞ্চিত হয়েছিল। কিন্তু, সম্প্রতি এ মহাপুণ্য কোনও রহস্যময়

কর্ম-গুহার তিমিরঘন-গহন প্রদেশে সঙ্গোপনে রয়ে গেল, নিবিড় অন্ধকারে মহারত্ন প্রচ্ছন্ন থাকার মতো।

৩। সে জন্মের অবসানে মহানরক ভীষণ 'রৌরবে' নিপতিত হয়েছিলাম। উঃ, সে কী দুর্বিষহ দুঃখ, মনে পড়লে সে দারুণ দুঃখের কথা, এখনও শরীর শিউরে ওঠে, কম্পিত হয় দেহ, সজল হয়ে ওঠে আঁখি। মগধে অর্জিত সেই মহাপাপ পরদার-লঙ্ঘনের এমন তীব্র বিষময় ফল সুদীর্ঘকাল * আমাকে ভোগ করতে হয়েছিল।

এ নরকের অসহ্য দুঃখে পাপিগণ অবিরাম রোদন করে, তাই এর নাম হয়েছে—'রৌরব'। প্রথম অবস্থায় এর তীব্র বিষ-দুষ্ট ধূমের যন্ত্রণায় পাপীরা ছট্‌ফট্ করে। তারপর সে ধূম হতে প্রখর অগ্নিশিখা নির্গত হয়ে পাপীদের সর্বাঙ্গ বিদগ্ধ করে। পাপের এমনি কঠোর দণ্ড।

৪। সুদীর্ঘ দিন পরে এ মহাদুঃখের অবসান হলো। নরক থেকে মুক্ত হয়ে কর্ম-নিবন্ধনে এক ছাগীর জঠরে জন্ম নিতে হলো। মালিক আমার শৈশবেই অণ্ডচ্ছেদ করে দিলো। উঃ, সে কী যন্ত্রণা। নিরীহ পশু আমি, কি করবো; কম্পিত দেহে 'মা-মা' বলে কতোই না করেছিলাম রোদন। কতো দুঃখই না পরিভোগ করতে হয়েছিল। পরদার-লঙ্ঘনের কী দারুণ দণ্ড। পরে আমি খাসিতে পরিণত হয়ে হৃষ্ট-পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হয়েছিলাম। কিন্তু, আমার দুর্ভাগ্য, সারাজীবন আমার পৃষ্ঠোপরি প্রভু-পুত্রকে বহন করতে হয়েছিল। নির্বিবাদে সহ্য করতে হয়েছিল কতো বেত্রাঘাত-পদাঘাত। তারপর মাংসলোলুপ ব্যক্তির রসনাতৃপ্তির জন্যে অকাল মৃত্যু।

---

* তুষিত দেবগণের পরমায়ু মনুষ্য গণনায় ৫৭ কোটি ৬০ লক্ষ বৎসর। তা কিন্তু, রৌরবের এক দিবা-রাত্র মাত্র। এ গণনায় এই মহানরকের পরমায়ু চার হাজার বৎসর

৫। ছাগ জন্মের অবসানে মহারণ্যে এক বানরীর গর্ভে জন্ম নিয়েছিলাম। মাতৃগর্ভ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়েছিলাম যেদিন, সেদিনই নিষ্ঠুর বানরেন্দ্র তীক্ষ্ণ দন্তের দংশনে আমার অণ্ডচ্ছেদ করেছিল। উঃ, সে কি দুঃখ, অসহ্য যন্ত্রণায় সংজ্ঞা হারা হয়েছিলাম। আমার ভীতিপূর্ণ করুণ-চীৎকারে মাতা হয়েছিল শোকাকুলা। সদ্যোজাত শিশু আমি, নির্দোষ, নিরীহ-অবল; তবুও অণ্ডচ্ছেদ হলো আমার! পরদার-লংঘনের এমনি দারুণ-দণ্ড।

৬। একদিন দুঃখময় কপিদেহ হতে মুক্ত হলাম। কিন্তু, কর্ম-নিবন্ধে আবার পশুকুলে গাভীর গর্ভে জন্ম নিতে হলো। কর্মের তাড়নায় সেবারেও আমার হয়েছিল অণ্ডচ্ছেদ। ক্রমে পরিণত হলাম বলীবর্দে; সুন্দর দ্রুতগামী বলিষ্ঠ দেহ। পোষক আমাকে শকটে নিয়োজিত করেছিল। গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্র, বর্ষার প্রবল বারিধারা, ঝড়-ঝঞ্ঝা, শীতের প্রকোপ ও বেত্রাঘাত এসব দুঃসহ দুঃখে ম্রিয়মান হয়েও আজীবন গুরুভার বহন করতে হয়েছিল। পরদার লংঘনের এমন বিধান।

৭। সে জন্মের অবসানে বৃজি জনপদে লব্ধ হয়েছিল দুর্লভ মানব জন্ম। কিন্তু, হায়-হায়, কর্মের অলংঘ্য বিধানে হয়েছিলাম নপুংসক। নারীও নয়, পুরুষও নয়! উঃ, সে কী দুঃখ; দুর্বিষহ রিপুর তীব্র তাড়না। অহর্নিশ দগ্ধ করেছিল উগ্র তেজোময় কামাগ্নি! পরদার-লংঘনের এরূপ দারুণ-দণ্ড দীর্ঘকাল ভোগ করেছিলাম।

তারপর হলো আমার ভয়াবহ দুঃসহ দুঃখের অবসান। পরজন্মে অনুপম সুখময় 'তাবতিংস' দেবপুরে দেববালারূপে প্রাদুর্ভূত হয়েছিলাম। বেদপুরী আলোকিত হয়েছিল আমার অপরূপ রূপ-লালিত্যের উজ্জ্বল আভায়। বিচিত্র সুবাসিত আমার বসন ও নয়নাভিরাম আভরণের স্নিগ্ধোজ্জ্বল রশ্মিমালায় দীপ্তিময় করে ললিতোল্লাসময় নৃত্য-গীতে দেবেন্দ্রের চিত্ত বিনোদন করেছিলাম। তখন আমার দিব্যদৃষ্টির প্রভাবে স্মৃতিপথে জাগ্রত হয়েছিল

অতীতের দুঃখময় সপ্ত জন্মের করুণ-কাহিনী; আরও অবগত হয়েছিলাম ভবিষ্যৎ সৌভাগ্যোজ্জ্বল সপ্তজন্মের সুখময় কথা।

অতীত জন্মে কৌশাম্বীতে শ্রেষ্ঠীপুত্র হয়ে শীল পালন জনিত যে পুণ্যার্জন করেছিলাম, এতোদিন পরে দেখা দিল তারই মধুময় সুখ-ফল। তা একমাত্র কল্যাণমিত্র সংসর্গের অপূর্ব পুরস্কার। সেই প্রথম দেবকন্যা-রূপে জন্ম নেওয়ার পর আরও চারবার ক্রমান্বয়ে দেববালা রূপেই প্রাদুর্ভূত হয়েছিলাম। সে পঞ্চ জন্ম আমার এ জন্মের অব্যবহিত পূর্বজন্ম। যাবৎ ষষ্ঠ জন্মের অবসান না হবে, তাবৎ ঘুচবে না আমার নারীত্ব। বর্তমান জন্মই আমার ষষ্ঠ জন্ম। সপ্তম জন্ম হবে ত্রিদিবে। চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে পুণ্য-বিভূতিময় আমার এই সপ্তম জন্ম। সে জন্মেই আমার জীবন-ধারার আমূল পরিবর্তন সাধিত হবে। যেহেতু, আমি অমর-বাঞ্ছিত 'তাবতিংসে' অনুপম দেবঋদ্ধি ও দেবৈশ্বর্যে দেদীপ্যমান দেবপুত্র রূপেই প্রাদুর্ভূত হবো। এখানেই আমার চির অবসান ঘটবে নারীত্বের। আমার একান্ত সাধের মহিমময় সপ্তম জন্ম সম্প্রাপ্ত হবার শুভ মুহূর্ত সমাগত প্রায়। পুণ্য-প্রসূ সৌভাগ্য-দ্যোতক সেই শুভক্ষণের কথা স্মরণেও আমার হৃদয় আনন্দে নৃত্য করে ওঠে। আকুল অন্তরে আমি সেদিনের প্রতীক্ষায় রয়েছি, তৃষিতা চাতকিনীর মতো। এ পুরুষত্ব লাভ, নিশ্চয়ই শীল পালনের অপ্রতিহত পুণ্য-প্রভাবময় সুদুর্লভ পুরস্কার। এ জন্মের অব্যবহিত পূর্বজন্মে যিনি ছিলেন আমার স্বামী, তাঁর নাম—দেবপুত্র জব। ইনি পুষ্প নামক দেবতার সন্তান। দেবপুত্র জব আমার জন্য আজ পর্যন্ত রচনা করছেন দিব্য-শোভন কুসুম-মালা। এখনো তিনি জানতে পারেন নি, আমি যে, দিব্য-দেহ ত্যাগ করে মানবকুলে জন্ম নিয়েছি। এ যে আমার ষোড়শ বৎসর বয়স, 'তাবতিংস', স্বর্গের দিব্য গণনায় তা মুহূর্ত মাত্র। *

* মানবের শত বৎসর, তাবতিংসের মাত্র এক দিবা-রাত্র। মনুষ্যের ষোড়শ বৎসর, দেবতাব পক্ষে তা চার ঘন্টা সময় মাত্র।

পিতঃ, এ জগতে স্বীয় সঞ্চিত কর্মই একমাত্র নিজস্ব। কৃতকর্মই জন্মান্তরে কারককে অনুসরণ করে। ভবিষ্যৎ জন্মের ক্রমোন্নতিকামী পুরুষকে পরদারলঙ্ঘন বর্জন করতে হবে, নারীদের হতে হবে সাধ্বী, পতিগতপ্রাণা ও পরপুরুষের প্রতি অননুরাগিণী। দেবলোকের দিব্যসুখের যাঁরা অভিলাষী, তাঁদের পাপাচার ত্যাগ করে আশ্রয় নিতে হবে কুশল ধর্মের। অপ্রমত্ত হয়ে পরমার্থ সাধনে রত যাঁরা, তাঁরাই বিচক্ষণ বুদ্ধিমান! এ ধরাধামে যিনি ভোগৈশ্বর্য ও সর্বসুখের অধিকারী, নিশ্চয়ই তিনি মহা-পুণ্যবান। একের কর্ম কখনও অন্যকে স্পর্শ করে না। স্বীয় পাপ-কর্মই নিজকে করে দলিত ও নিষ্পেষিত।

পিতঃ, দেবাঙ্গনা সদৃশী ললনাগণ অহর্নিশ আপনার সেবা করছেন, সতত আপনি ভোগ-বিলাসে অভিরমিত হচ্ছেন, রাজত্ব ও ঐশ্বর্য লাভে সুখী হয়েছেন, এর মূল কারণ কি, কোনদিন চিন্তা করেছেন? কেউ সুখী, কেউ দুঃখী, কেউ ধনী ও কেউ নির্ধন, এই বৈষম্যেরই বা কারণ কি? বাবা, তৎপ্রতি অবহিত হউন। মূর্খ গুণের অসার মিথ্যাবাদে কখনো বিশ্বাস স্থাপন করবেন না।"

চার

রাজদুহিতা রুজা এরূপে বহু যুক্তি-উপমা অবলম্বনে পিতাকে শোনালেন তাঁর নিগূঢ়তম মর্মবাণী। বাৎসল্যাতিশয্যে মধুর ভাষিণী আত্মজার প্রত্যেক কথাই রাজার কর্ণে যেন সুধা বর্ষণ করল। রাজা মেয়ের বিদ্যাবত্তা ও বাগ্মিতায় হলেন মোহিত। কিন্তু, তাঁর মিথ্যা ধারণার নিরসন হলো না।

অপরাহ্ন থেকে রাত্রির মধ্যম যাম পর্য্যন্ত পিতাকে বোঝাবার জন্য রুজার যা অক্লান্ত উদ্যম ও প্রচেষ্টা, তা সবই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো। এতে রাজকুমারী হলেন বিমর্ষা, দুঃখিতা ও মর্মাহতা। তাঁর মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ল, মুখ শুকিয়ে গেল। একটা ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন যেন তাঁর মনশ্চক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত হয়ে চিত্তকে করে তুললো ক্লান্ত, পীড়িত ও

শঙ্কিত। হতাশার হৃদয়-ভেদী দীর্ঘশ্বাসে স্ফীত হয়ে উঠল তাঁর বক্ষস্থল। সজল হয়ে উঠল তাঁর আনত-নয়ন। তাঁর বেদনা-ভরা চোখ তুলে একবার নিরীক্ষণ করলেন পিতার প্রতি। তারপর গবাক্ষপথে বাষ্পাচ্ছন্ন দৃষ্টি বহির্ভাগে নিবদ্ধ করে ক্ষণকাল নীরবে দাঁড়িয়ে সংবরণ করে নিলেন নিজের উদ্‌গত হৃদয়-বৃত্তি। কিন্তু, বিদুষী রাজকন্যা সম্পূর্ণ আশা ত্যাগ করলেন না। অনন্যোপায় হয়ে দেব-ব্রহ্মাকে স্মরণ করলেন। ধীরে ধীরে নতজানু স্থাপন করে তার ক্ষোভ-বিধ্বস্ত মুখখানা ঈষৎ ঊর্ধ্বদিকে তুলে শিরোপরি কৃতাঞ্জলি হয়ে একে একে দশদিকে করলেন প্রণাম। ভাবাবেশে তন্ময় হয়ে বললেন--- "পুণ্য-পূত সত্যনিষ্ঠ মহাঋদ্ধি-শক্তি সম্পন্ন এমন অনেক দেব-ব্রহ্মা আছেন, যাঁরা মহানুভাব বলে প্রতিপালন করছেন এ জীব-জগত, ধার্মিককে রক্ষা করছেন সযত্নে, তাঁদের প্রতি আমার সানুনয় প্রার্থনা--- তাঁরা যেন এসে অপনোদন করেন আমার পিতার মিথ্যাদৃষ্টি। তিনি উপলব্ধি করতে পারেন যেন ---সত্য-ধর্মের যথার্থ স্বরূপ। অন্ততঃ আমার শীল ও সত্যের প্রভাবে এ কল্যাণ সাধনে তাঁরা যেন অবহিত হন।"

তখন গৌতম বোধিসত্ত্ব ছিলেন মহাব্রহ্মা। তাঁর নাম---'নারদ'। স্বভাবতঃই বোধিসত্ত্বগণ ন্যায়-ধর্ম পরায়ণ, মৈত্রী-করুণার প্রতীক, সত্য-ধর্মের ধারক ও বাহক। দিব্য-কর্ণে শুনলেন বোধিসত্ত্ব নৃপসুতার আকুল প্রার্থনা। দিব্য-দৃষ্টিতে দর্শন করে জ্ঞাত হলেন সঠিক অবস্থা। ধর্ম-সংবেগ উৎপন্ন হলো সত্য-সন্ধানী বুদ্ধাঙ্কুরের অন্তরে। সদ্ধর্মের গৌরব রক্ষা কল্পে তিনি কৃত-সঙ্কল্প হলেন। তখনই তিনি ঋষিবেশে আগমন করলেন শূন্যমার্গে, গগনমণ্ডল উদ্ভাসিত করে, দীপ্তোজ্জ্বল চন্দ্রমার মতো। রাজ-প্রাসাদে তিনি প্রবেশ করলেন উন্মুক্ত বাতায়ন পথে। রাজার পুরোভাগে আকাশে পদ্মাসনে উপবিষ্ট হলেন পুণ্যময় মহাসত্ত্ব। প্রাসাদ-কক্ষ আলোকময় হলো স্নিগ্ধোজ্জ্বল লোকাতীত ঘন রশ্মি-মালায়।

হঠাৎ অদৃষ্টপূর্ব জ্যোতির্ময় পুরুষের আবির্ভাবে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হলেন নৃপতি। ব্রহ্মতেজেঃ তিনি হয়ে পড়লেন অভিভূত, চমৎকৃত ও সন্ত্রাসিত।

সভয়ে কম্পিত-দেহে রাজা আসন ছেড়ে ভূতলে দণ্ডায়মান হলেন। নিস্পন্দ, নির্বাক ও নিশ্চল হয়ে এ অলৌকিক সাম্য-মূর্তির পানে স্থির-নেত্রে চেয়ে রইলেন।

প্রার্থনা-রতা রাজকুমারী মহাব্রহ্মার শুভাগমনে বিস্ময়ানন্দে চকিতে দাঁড়িয়ে উঠে ললাটে বিন্যস্ত করলেন করপুট। অন্তরে জাগল পুলক-শিহরণ। ভুবন-মোহন জ্যোতিষ্মান্ মহাসত্ত্বের প্রতি মুগ্ধ-দৃষ্টি নিবদ্ধ করে চিন্তা করলেন নৃপসুতা--- "আমার সাধনা হয়েছে ফলবতী।"

পরাক্রমশালী বিদেহপতি আপন শৌর্য ও সংবেদের প্রভাবে অল্পক্ষণের মধ্যে যথাসম্ভব নিজকে সংবরণ করে নিলেন। তবুও কথা বলতে কণ্ঠস্বর কেঁপে উঠল। ধীরস্বরে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন--- "জ্যোতির্ময় তপোধন! আপনি কে? কি নামে আপনি অভিহিত হন? বড়ো মনোরম, বড়ো নয়নাভিরাম স্নিগ্ধ-শীতল আপনার দেহ-জ্যোতিঃ! এ অপূর্ব ভাস্বর আলোকে আলোকময় করে কোথা হতে এলেন আপনি?"

মহাব্রহ্মা স্মিত-হাস্যে সুমধুর ব্রহ্মস্বরে বললেন ---"রাজন্, আমি এসেছি ব্রহ্মলোক থেকে, আমি মহাব্রহ্মা।"

তখন নরপতির চোখে-মুখে অকুণ্ঠ -বিস্ময় ফুটে উঠল। ঈষৎ গ্রীবাভঙ্গীতে সন্দিগ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন--- "আপনি মহাব্রহ্মা! আশ্চর্য! এতো ঋদ্ধি আপনি কিরূপে লাভ করলেন?"

"নৃপবর, অতীত জন্মে আমি সত্যধর্মে পূর্ণ আস্থাবান ছিলাম। দান-শীল-ভাবনায় নিরত হয়ে ব্রহ্মচর্য ও ইন্দ্রিয় সংযমে আত্মনিয়োগ করেছিলাম। কুশল কর্মের অপ্রতিহত শক্তি। সেই অজেয়-শক্তির প্রভাবেই লব্ধ হয়েছে এই মহাঋদ্ধি।"

সবিস্ময়ে রাজা জিজ্ঞাসা করলেন--- "দেব! বড়ো অদ্ভুত কথা শোনালেন! কর্মেরও কি ফল আছে? পুণ্যবলে কি এমন ঋদ্ধিশক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়?"

ব্রহ্মা স্থিরকণ্ঠে বললেন--- "নিশ্চয়ই রাজন্, সাধনা বলেই এরূপ ঋদ্ধির অধিকারী হয়।"

তবুও রাজার সংশয় বিদূরিত হলো না। মৃদু-স্বরে বললেন--- "দেব, মিথ্যা বলে আমায় ভোলাবেন না। সত্যই কি দেবলোক আর পরলোক আছে? কেউ বলে নেই, আর কেউ বলে আছে; কার কথাই বা বিশ্বাস করবো। বড়ো সমস্যায় পড়েছি। এর সম্যক্ উত্তর প্রদানে আপনি আমার সন্দেহ ভঞ্জন করুন।"

প্রত্যুত্তরে ব্রহ্মা দৃঢ় কণ্ঠে বললেন--- "সত্যই মহারাজ, দেবলোক-পরলোক আছে। এটা বুঝতে পারে না মোহান্ধ মূর্খজন।"

রাজা তখন পরিহাস বাক্যে বললেন--- "দেব, মৃত্যুর পর পরলোক প্রাপ্তি এবং পরলোকে অবস্থান যদি সত্যই আপনি বিশ্বাস করেন, তা হলে এখন ঋণ স্বরূপ আমায় পঞ্চশত মুদ্রা প্রদান করুন; পরলোকে আমি প্রতিদানে আপনাকে সহস্র মুদ্রা দেবো।"

মহাব্রহ্মা ভর্ৎসনা মিশ্রিত গম্ভীর স্বরে বললেন---"হে বিদেহপতি, যদি আপনি উদারচেতা ও শীলবান হতেন, তা হলে আপনাকে এখনি দিয়ে দিতাম পঞ্চশত মুদ্রা। কিন্তু, আপনি বড়ো অধার্মিক ও নিষ্ঠুর। মৃত্যুর পর নিশ্চয়ই আপনি সম্প্রাপ্ত হবেন ভীষণ নরক। রাজন্, সে মুদ্রা আদায় করতে কেই বা যাবে, সেই দারুণ জ্বলন্ত নরকে? বলুন, কোন্ বুদ্ধিমান লোক অধার্মিক ও অদাতাকে ঋণ দেবে?"

এবার হতবাক্ হলেন রাজা। নরকের ভীতিপ্রদ কথা শুনে তাঁর অন্তর কেঁপে উঠল। বলে যেতে লাগলেন মহাব্রহ্মা উদাত্ত কণ্ঠে--- "রাজন্, নরকের দুঃখ অতীব ভীষণ। মিথ্যা-বিশ্বাসী অধার্মিকেরাই নরকে দুর্বিষহ দুঃখ ভোগ করে। লৌহকুম্ভী, সজ্যোতিঃ ও সিম্বলী ইত্যাদি শত শত উৎসদ নরক রয়েছে। এসব নরকে পাপিগণ অহরহঃ তীব্র-দুঃখ ভোগ করে। মহানরকের দুঃখ ততোধিক ভীষণতর। অবীচি, রৌরব ও

সঞ্জীবাদি অষ্ট মহানরক কতোই যে দারুণতর, তা অবর্ণনীয়। মহারাজ, যখন আপনি দুঃসহ নরক-দুঃখে প্রপীড়িত হবেন, তীব্র-দাহে হবেন বিদগ্ধ, সেই দুঃসময়ে কোন্ অভাজন সেখানে গিয়ে আপনাকে বলবে ঋণ পরিশোধের কথা ?''

বুদ্ধাঙ্কুর সুললিত ব্রহ্মস্বরে বর্ণনা করলেন একে একে সমস্ত নরকের ত্রাসজনক কাহিনী। রাজার অন্তরে ভীষণ আতঙ্কের সৃষ্টি হলো। তিনি ভীতি-বিহ্বল বাক্যে বললেন—''দেব, আপনি নরকের যা বর্ণনা দিলেন, তা শুনে আমার বড়ো ভয়ের সঞ্চার হয়েছে। হে পুণ্যময় মহাব্রহ্মন্, আমাকে যেন এমন ভীষণ-নরক দর্শন করতে না হয়, সেরূপ শুদ্ধি-মার্গের নির্দেশ করুন।''

মহাসত্ত্ব বললেন—''নরনাথ, আপনি পাপমিত্র বর্জন করুন। তাদের ন্যায় হীনচেতা ব্যক্তিগণই জাগতিক সকল দুঃখ সৃজন করে। তাই রাজন্, কল্যাণ-মিত্রের ভজনা করুন। কল্যাণ-মিত্রের সংসর্গ এবং উপদেশ শান্তি-সুখের বিধান করে। কুশল কর্মে আত্মনিয়োগ করুন। দুঃশীলের জন্য সুগতির দ্বার চির-রুদ্ধ। সুখী হতে পারে না অদাতা। কৃপণ দানের প্রশংসায় পরাঙ্মুখ। এহেন অজ্ঞজনই সুগতি লাভে বঞ্চিত হয়।

রুজা নারী-কুলের উজ্জ্বল রত্ন। এ রমণী বিদুষী ও জ্ঞানবতী। সে শীলবতী, ধর্ম পরায়ণা ও শুদ্ধিমার্গ প্রতিপন্না। সাধারণ নয় এ নারী। বড়োই পুণ্যবতী; পুণ্য-সংস্কার বিমণ্ডিতা। তার ভবিষ্যৎ বড়োই উজ্জ্বল। আপনার পরম সৌভাগ্য যে, এমন কন্যা-রত্নের আপনি জনক। রুজাই আপনার কল্যাণমিত্র। এর উপদেশ অনুসরণ করুন। কুশল কর্মে নিরত থেকে পুণ্যময় করুন আপন জীবন।''

এতোদূর বলে মহাব্রহ্মা দেশনা করলেন পরিসমাপ্ত। নীরব একাগ্রতার মধ্যে এতোক্ষণ মহাসত্ত্বের পীযূষ-ধারাসম মন্দ্রিত হচ্ছিল প্রাণস্পর্শী মধুর-স্বর। সপরিজন রাজা আছেন চিত্রার্পিতবৎ দণ্ডায়মান। রাজ-

কুমারী ভাবাবেশে তন্দ্রাহতার মতো শুনছেন, যেন বাহ্যজ্ঞান বিরহিত। তাঁর নিষ্পলক চক্ষু রস-নিবিড়, কখনও বক্ষ ভেদ করে নিশ্বাস বের হয়ে আসছে, কখনও গণ্ড বেয়ে অশ্রুধারা নেমে পড়ছে তাঁর অজ্ঞাতে। আষাঢ়ের মেঘের মতোই দ্রবীভূত হয়ে গেছে তাঁর হৃদয়।

বোধিসত্ত্ব দিব্যজ্ঞানে অবগত হলেন---রাজার চিত্তভাব এখন মৃদু হয়েছে। পাপত্রস্ত ও সম্যকদৃষ্টি পরায়ণ হয়েছেন তিনি। মহাব্রহ্মার আগমন হয়েছে সাফল্যমণ্ডিত। সুতরাং তিনি এখন প্রত্যাবর্তন মানসে রাজপ্রাসাদ থেকে ধীরে গবাক্ষপথে নিষ্ক্রান্ত হলেন। অনুপম ব্রহ্মতেজে নভোমণ্ডল আলোকিত করে বিদ্যুদ্বেগে তিনি ব্রহ্মলোক অভিমুখে অগ্রসর হলেন। অপূর্ব সুন্দর জ্যোতিরুৎসবের মধ্যে তড়িতের মতো সহসা অদৃশ্য হয়ে গেলেন জ্যোতিষমান্। ঘনান্ধকারে আবৃত হল ধরাতল। বিস্ময়ে স্তম্ভিত হলেন বিদেহপতি।

মহাব্রহ্মার বিদায়কালে চকিতে ভাব-তন্দ্রা থেকে জেগে উঠলেন রাজ-কন্যা। চক্ষু দু'টি তাঁর অরুণাভ, গণ্ডস্থল অশ্রুধারায় অভিসিক্ত, মুখ আনন্দ-গৌরবে উদ্ভাসিত; চিত্ত হয়েছে শান্ত, স্নিগ্ধ ও প্রীতিরস-সিক্ত, বর্ষার অন্তে স্বচ্ছসলিলা শরতের স্রোতস্বিনীর মতো। অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে সকৃতজ্ঞ অন্তরে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করতে করতে তাঁর কল্পলোকের অন্তর্জ্যোতিঃ তেজঃপুঞ্জ আরাধ্যকে জানালেন সাশ্রুনয়নে বিদায় সংবর্ধনা। এ বিদায় যে কত মর্মন্তুদ, কত মর্মস্পর্শী, তা অনির্বচনীয়। এ বিচ্ছেদে তাঁর হৃদয়কে করে তুল্‌ল ব্যথিত, পীড়িত ও ব্যাকুলিত। সমস্ত রজনীর হর্ষ-বিষাদের ভাব-তরঙ্গে আলোড়িত হয়ে নৃপসুতার প্রশান্ত হৃৎ-সমুদ্র হয়ে উঠল উচ্ছ্বসিত। আত্মসম্বরণে অসমর্থ হয়ে তখন কম্পিত-দেহে তিনি ভূতলে বসে পড়লেন।

ফল-পুষ্পে সুশোভিত হয়েছে তাঁর আশা-তরু। বিক্ষুব্ধ, শঙ্কিত ও আশাহত অন্তরের অতৃপ্ত উদগ্র আকাঙ্ক্ষা যেন বর্ষা-বারিধারায় চাতকের করুণ-কণ্ঠের মতো শান্ত, তৃপ্ত ও কোমল হয়ে গেল। তখন দেখা দিল

পূর্বাকাশে ঊষার আলোকচ্ছটা। নেপথ্যে বসন্তরাগের মধুর বাঁশী বেজে উঠল। নগর-তোরণে প্রাভাতিক মাঙ্গলিক বাদ্যের ললিত-মোহন সুতান-লহরী প্রাণ আকুল করে তুল্‌ল।

পাঁচ

স্পর্শমণির সংস্পর্শে লৌহ যেমন স্বর্ণে পরিণত হয়, তেমনি বোধি-সত্ত্বের পবিত্র সংস্পর্শে বিদেহপতির মিথ্যাদৃষ্টিও তিরোহিত হলো। চির-সত্যের আলোক সম্পাতে তাঁর হৃদয় হলো উদ্ভাসিত। সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হলো তাঁর জীবন-ধারা। সারাক্ষণই তাঁর মনে কেবল উদয় হতে লাগল মহাব্রহ্মার কথা---"আহা, কী সুন্দর, কী মনোরম সৌম্যমূর্তি, কেমন নয়ন-শান্তিকর স্নিগ্ধ-জ্যোতিঃ, কেমন অমৃত-মধুর প্রাণ-মাতানো কথা, আর তো কখনও দেখিনি এমন বিস্ময়কর কান্তিময় জীবন্ত-রূপ! সত্যই ইনি বলে-ছেন---আমার স্নেহ-প্রতিমা রুজা নারী-কুলের উজ্জ্বল-রত্ন। প্রকৃতই সে জ্ঞানবতী। সে একান্তই আমার হিতৈষিণী।"

রুজা ক্ষণেকের তরেও ভুলতে পারেন নি মহাসত্ত্বের মহদুপকার। তার অনাবিল অন্তরের অগাধ-ভক্তি পরমারাধ্য সেই পুণ্যময়ের উদ্দেশ্যে সবটুকুই উজাড় করে দিয়েও তৃপ্তি মিটে না। আজীবন যুক্ত করে নতশিরে সতত নিবেদন করেছিলেন শ্রদ্ধার্ঘ।

নৃপসুতা রুজার অন্তর মৈত্রী-করুণার অমিয়-নির্ঝর। তাঁর কোমল-মধুর প্রিয়-কথা করুণা মাখা। কুশল-মূলক শোভন কর্মই তাঁর জীবন-সর্বস্ব। পুণ্য-স্রোত প্রবাহিত করতেন রুজা তাঁর প্রত্যেক কাজে, কথায়, মননে ও চিন্তনে। এমন সমুজ্জ্বল পুণ্যাবদান-মণ্ডিত পবিত্র-জীবন যে রমণীর, তিনিই জগৎ-বরেণ্যা। নারী-কুল গরীয়সী পুণ্যশ্লোকা রুজার ভাস্বর পূত-চরিত্র একদিন তাঁকে রূপায়িত করল অপূর্ব বেশে বুদ্ধ-সেবক আনন্দরূপে। জগ-জ্জ্যোতিঃ পুণ্যপুরুষ গৌতম বুদ্ধের শ্রাবক-সংঘের যিনি অন্যতম শ্রাবক,

যিনি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কসম দীপ্তিমান্ গৌরবময় খ্যাতি-প্রতিপত্তি লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন, তিনিই আজ বৈচিত্র্যময়ী নিয়তির আহ্বানে বিদেহপতির একমাত্র কন্যারত্ন রুজারূপে দেখা দিলেন অপরূপ বেশে। রুজার পরম সৌভাগ্য যে, তাঁর কর্ম-জীবনের প্রধান সহায় রূপে লাভ করলেন গৌতম-বোধিসত্ত্বকে। মহাসত্ত্বের মহীয়ান মহিমাই রুজাকে পরমার্থ পথে অগ্রগতিতে অগ্রসর করিয়ে দিলো। আহা, কী সৌভাগ্যবতী রুজা!

ছয়

পুণ্যময়ী রুজা তাঁর অন্তিম নিশ্বাস পর্যন্ত নিজকে পুণ্যময় কাজেই নিযুক্ত রেখেছিলেন। রাজ্যবাসী সকলেই তাঁকে দেবীর মতো শ্রদ্ধা করতো, দীন-দুঃখী ভক্তি করতো মায়ের মতো। সারাজীবন তিনি ভুলতে পারেননি ত্রিদিবের পবিত্র স্মৃতি। এ স্মৃতিই তাঁকে করেছিলো পুণ্যময়ী ও মধুরময়ী। ক্রমশঃ উপনীতা হলেন তিনি জীবনের অন্তিম সীমায়। একদিন তিনি পুররাসী ও রাজ্যবাসীকে শোক-সাগরে ভাসিয়ে নশ্বর মানব-লীলার যবনিকা টেনে দিলেন।

মানব-জীবনের অবসানে তিনি 'তাবতিংস' দেবপুরে মহাযশস্বী দেবপুত্র-রূপে প্রাদুর্ভূত হলেন। এতোদিন পরেই তাঁর ব্যভিচার পাপের পরিসমাপ্তি ঘটলো। নারী-জন্মের অবসান হলো চিরতরে। শীল-বিশুদ্ধির অচিন্তনীয় পুণ্য-প্রভাবই তার নারীত্ব ঘুচায়ে পুরুষত্বে বরণ করে নিলো। কর্মের এমনি বিচিত্র বিধান!

সেই হতে তিনি পুরুষত্বের রেখা টেনেই গিয়েছিলেন অন্তিম জন্মাবধি, যতদিন না হয়েছিল জন্ম-মৃত্যুর অবসান। এরপর বহু জন্ম ইনি দেব-মানবকুলে পরম সুখে অতিবাহিত করেছিলেন। সুদীর্ঘকাল অতীতের পর এক সময় তিনি হংসবতী নগরে মহারাজ নন্দনের নন্দন হয়ে জন্ম নিয়েছিলেন। সে জন্মে 'সুমন' নামে পরিচিত হয়েছিলেন তিনি। এরপর বিন্যস্ত করা হবে তাঁর ইতিবৃত্ত।

(মহানারদ কশ্যপ জাতক---৫৪৪)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সুমন কুমার

এক

সুদূর অতীতের কাহিনী। মধ্যম প্রদেশের এক সুপ্রসিদ্ধা নগরী; নাম---হংসবতী। এ নগরী সর্বৈশ্বর্যে ছিল অতি সমৃদ্ধ। মহারাজ 'নন্দন' ছিলেন এই পুণ্য-ভূমির অধিপতি। পরম সৌভাগ্যবতী সুজাতাদেবী নরনাথের অগ্রমহিষী। তাঁর পূত-গর্ভে জন্ম নিলেন পুণ্য-পুরুষ পদুমোত্তর বুদ্ধাঙ্কুর। যথা সময়ে পুণ্য-তীর্থ হংসবতী উদ্যানে মাতৃগর্ভ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন মহামানব। তাঁর জাতক্ষণে পদ্মবৃষ্টি হয়েছিল, তাই তার নামকরণ করা হলো---'পদ্ম কুমার'।

তখনকার দিনে মানুষের পরমায়ু ছিল লক্ষ বৎসর। মহাসত্ত্ব পদুম কুমার গৃহবাসে ছিলেন দশ হাজার বৎসর। যেদিন তাঁর সহ-ধর্মিণী বসুদত্তার গর্ভজাত উত্তর নামক পুত্রের জন্ম হয়, সে দিনই তিনি মহাভিনিষ্ক্রমণ করেছিলেন। তৎদিবসেই তাঁর লব্ধ হয়েছিল সম্বুদ্ধত্ব। বোধি-পালঙ্কে সপ্তাহকাল সমাপত্তি ধ্যানে অতিবাহিত করার পর তিনি ধ্যানাসন হতে উঠে দক্ষিণ পদবিক্ষেপ করার সঙ্গে সঙ্গেই পদতলে পৃথিবী ভেদ করে সুবৃহৎ সহস্রদল পদ্ম উত্থিত হয়েছিল। প্রতিপদক্ষেপেই এরূপ পদ্ম আবির্ভূত হয়েছিল বলেই তিনি আখ্যা প্রাপ্ত হলেন---'পদুমোত্তর বুদ্ধ'।

নন্দন রাজা বুদ্ধের প্রতি ছিলেন প্রগাঢ় মমতা পরায়ণ; তাই তিনি কোনোদিন তাঁকে চক্ষের অন্তরাল করেননি। সশিষ্য তথাগতকে তিনি স্বীয় রাজধানীতেই রেখে দিলেন। আপন হাতেই রাখলেন বুদ্ধ ও ভিক্ষু-সংঘের পরিচর্যার ভার। অন্য কা'কেও দিতেন না সে-সুযোগ।

নরাধিপের কনিষ্ঠ পুত্রের নাম---'সুমন কুমার'। ইনি পদুম কুমারের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। যথা সময়ে সুমনকে করা হলো যুবরাজ পদে অভিষিক্ত। তিনি অবস্থান করেন প্রত্যন্ত প্রদেশের এক উপরাজ্যে। সময়ে এসে মহামান্য বুদ্ধ ও পিতৃদেবকে দর্শন ও পূজা করে যেতেন।

একদা প্রত্যন্ত-জনপদে বিদ্রোহ দেখা দিল। সুমন দক্ষতার সহিত দমন করলেন সে বিদ্রোহ। মহারাজ অত্যধিক সন্তুষ্ট হয়ে অচিরে পুত্রের দর্শনেচ্ছু হলেন। পিতার সাদরাহ্বান পেয়ে যুবরাজ সপারিষদ পিতৃ সদনে যাত্রা করলেন। পথে কুমার সমৌৎসুক্যে অমাত্যগণকে জিজ্ঞাসা করলেন--- "বলুন তো আপনারা, এবার বাবা যদি আমায় পুরস্কৃত করতে ইচ্ছা করেন, তা হলে, কোন্ বিষয়ের প্রার্থনা করা উচিত?"

অমাত্যগণ স্বস্ব অভিরুচি অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করলেন। কেহ বললেন হস্তী-অশ্ব, কেহ ধনৈশ্বর্য, আর কেহ বললেন রাজ্য প্রার্থনার কথা। কিন্তু, জনৈক সুবিজ্ঞ অমাত্য বললেন---"যুবরাজ, রাজপুত্রের কি কখনও ধন-দৌলতের অভাব হবে? এসব নশ্বর বস্তুরও বা প্রয়োজন কি? সশিষ্য বুদ্ধকে যা'তে পরিচর্যা করতে পান, তাই প্রার্থনা করুন। এটাই হবে কল্যাণজনক।"

সুমনের বড়ো মনঃপূত হলো একথা। তিনি প্রফুল্লহাস্যে বল্লেন--- "অমাত্যপ্রবর, আপনি অতি উত্তম কথাই বলেছেন। আপনার সুযুক্তি বড়ো প্রাণ-স্পর্শী। ধনৈশ্বর্য তো একান্তই নশ্বর, বাতাহত দীপ-শিখার মতো। ধর্মই তো একমাত্র কল্যাণ-নিদান, দুঃখ-ব্যাধির মহৌষধ, সন্তপ্ত মানবের পক্ষে স্নিগ্ধ-শীতল ছায়ার মতো। আপনার উপদেশ জ্ঞানগর্ভ। আমি সর্বান্তঃকরণে তা অনুমোদন করছি।"

যথাসময়ে কুমার পিতৃসদনে উপনীত হলেন। যথোচিত সম্মান সহকারে পিতাকে অভিবাদন করলে, সানন্দে রাজা পুত্রকে আলিঙ্গন করে সস্নেহে বললেন---"প্রাণপ্রতিম, তোমার বীরোচিত কার্যে আমি অতিশয় আনন্দিত হয়েছি। ইচ্ছা করেছি, তোমায় বর প্রদান করবো ; যাঞ্চা করো তোমার যথাভিরুচি বর।"

কুমার প্রার্থনা করলেন বিনীত বাক্যে---"পিতঃ, তা'হলে, এ বরই আমি প্রার্থনা করছি---সশিষ্য বুদ্ধকে অন্ততঃ তিন মাস যেন সেবা করতে পারি, সে অনুমতিই প্রদান করুন।"

পুত্রের প্রার্থনা শুনে রাজা বিমর্ষ হয়ে বললেন---"অসম্ভব, তুমি অন্য যে কোনও বর যাঞ্চা করো, ধন-রত্ন যা চাও, তা'ই দেবো।"

কুমার বিনম্র বাক্যে বললেন---"বাবা, ধন-রত্ন অতি অকিঞ্চিৎকর বস্তু। ধীমানগণ সহজেই ঐশ্বর্য লাভ করেন। লোভান্ধেরাই ধনান্বেষণ করে। মানুষের বিভব যতোই বর্ধিত হয়, ততোই বেড়ে যায় তৃষ্ণা, লবণাক্ত জল পানের মতো। নশ্বর-ধনের বিয়োগ অনিবার্য। প্রিয়-বস্তুর বিয়োগ বড়ো দুঃখদায়ক। বিভব-লুব্ধের অন্তর বড়োই নৃশংস। সামান্য বিভবের জন্যও কেউ কেউ পরকে হত্যা করে।

ধর্ম-নিধিই পরম নিধি। ধর্মই সংসার-মরুর সন্তাপনাশক। মহামানবের মুখ-নিঃসৃত সদ্ধর্ম-বাণী মানবকে পবিত্র-জীবন দান করে। তাই পিতঃ, বুদ্ধকে সেবা করাই আমার একান্ত কাম্য, ঐশ্বর্য নয়। বুদ্ধকেই সেবা করার অনুমতি দিন। অন্য বরের প্রয়োজন নেই।"

রাজা পুত্রের মর্ম-বাণী শুনে চমৎকৃত হলেন। তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ক্ষণকাল নীরব থাকার পর ধীর-কণ্ঠে বললেন---"তাতঃ, বুদ্ধের চিত্ত-ভাব দুর্জ্ঞেয়। তিনি যদি ইচ্ছা না করেন, তবে আমার সম্মতিতে কি প্রয়োজন সিদ্ধ হবে?"

কুমার বললেন--- "পিতঃ, আমি ভগবৎ-সকাশে প্রার্থনা করবো।"

দুই

রাজকুমার সুমন তথাগতকে দর্শন মানসে বিহারে উপনীত হলেন। তখন বুদ্ধ নির্জনে অবস্থান করছেন গন্ধকুটীরাভ্যন্তরে। কুমার ভিক্ষুদের নিকট তাঁর মনোভাব নিবেদন করলে, ভিক্ষুগণ বললেন ---"রাজনন্দন, এতে আমাদের হাত নেই। বুদ্ধসেবক সুমন স্থবিরকেই বলুন। তাঁর প্রসাদেই আপনার আশা পূর্ণ হবে।"

কুমার সেবক-স্থবিরের নিকট উপস্থিত হয়ে মনোভাব ব্যক্ত করলেন। যুবরাজের ইচ্ছা অবগত হয়ে স্থবির ধ্যানবলে তৎক্ষণাৎ তাঁর সম্মুখেই পৃথ্বিতলে নিমগ্ন হলেন এবং নিমেষের মধ্যেই প্রাদুর্ভূত হলেন সুগতের সমীপে। সেবক-ভিক্ষু তথাগতের নিকট নিবেদন করলেন রাজপুত্রের প্রার্থনা। বুদ্ধ সম্মতি জানিয়ে বললেন---'তথাস্তু।' মণ্ডপে উপবেশনের আসন সজ্জিত করার আদেশ দিলেন সুগত। স্থবির বুদ্ধাসন হস্তে তথায় আবার পৃথিবীতে নিমগ্ন হয়ে কুমারের সম্মুখেই আবির্ভূত হলেন। সেবক-ভিক্ষুর এরূপ ঋদ্ধি-শক্তি দর্শনে চমৎকৃত হলেন সুমন কুমার। "নিশ্চয়ই এভিক্ষু মহাপুণ্যবান ও মহাগুণধর" সবিস্ময়ে চিন্তা করলেন নৃপ-সুত।

তথাগত এসে সজ্জিত আসনে সমাসীন হলেন। কুমার সগৌরবে বন্দনান্তে কুশল-প্রশ্নের পর সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন---"ভন্তে ভগবন্, এ সুমন ভিক্ষু আপনার কি অতীব প্রিয়?"

"হাঁ কুমার, এ ভিক্ষু মহাগুণবান। সে আমার প্রধান সেবক।"

"প্রভু, কোন্ কর্মের প্রভাবে এরূপ গুণবান হয়?"

"দান, শীল ও ভাবনা এ ত্রিবিধ কুশল কর্মের প্রভাবেই হয়।"

"ভগবন্, তা আমারও একান্ত ইচ্ছা। আমিও যেন অনাগতে কোনও

একজন সম্যক্ সম্বুদ্ধের এরূপ গুণবান সেবক হতে পারি, এ পরিকল্পনা নিয়ে আগামী কল্য বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে দান দেবার ইচ্ছা করেছি। অনুগ্রহ পুর্বক আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন।''

তথাগত নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। সপ্তাহকাল যাবৎ অকৃত্রিম শ্রদ্ধা সহকারে কুমার বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষু সংঘকে দান দিলেন---অতি উৎকৃষ্ট অন্ন-পানীয় ও খাদ্য-ভোজ্যাদি বিবিধ দানীয় সম্ভার। সপ্তম দিবস দান-কার্যের অবসানে সুমন সম্বুদ্ধের শ্রীপাদ-মূলে নিপতিত হয়ে প্রার্থনা করলেন---''ভগবন্, আমার শাসিত উপরাজ্যে তিন মাস বর্ষা যাপনের জন্য সশিষ্য আপনাকে নিমন্ত্রণ করছি। আমার প্রতি অনুকম্পা করে এ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন। পিতার অনুমতি পেয়েছি, তিনিও সম্মত আছেন।''

'এ নিমন্ত্রণ রক্ষায় মহাকল্যাণ ও পরমার্থের সূচনা করবে' এটা সম্যক্ অবগত হয়ে সর্বজ্ঞ বুদ্ধ বললেন---''কুমার, তথাগতগণ শূণ্যাগারেই অভি-রমিত হন।''

সুমন বিনীত ভাবে বললেন---''প্রভু, এর যথাযথ ব্যবস্থা করা হবে।'' এ বলে সুগতের পদপ্রান্তে বিদায় নিয়ে পিতৃসদনে উপনীত হলেন। বুদ্ধের নিমন্ত্রণ গ্রহণের শুভ সংবাদ তাঁকে জানালেন এবং বিবিধ বিষয় আলোচনার পর পিতার নিকট বিদায় নিয়ে তিনি স্বরাজ্যাভিমুখে যাত্রা করলেন।

সুমন কুমার স্বীয় রাজ্যে উপস্থিত হয়ে অগৌণে বুদ্ধের উপযুক্ত নির্জন অথচ মনোরম স্থানের অণ্বেষণে প্রবৃত্ত হলেন। শোভন নামক ধনাঢ্য ব্যক্তির এক সুবৃহৎ রমণীয় নির্জন উদ্যান সুমনের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। লক্ষ মুদ্রার বিনিময়ে সে উদ্যান তিনি ক্রয় করলেন। সেখানে নির্মাণ করা হলো---বুদ্ধের গন্ধকুটীর, ভিক্ষুদের বাস-বিহার, ধর্মশালা, প্রাকার ও তোরণাদি প্রয়োজনীয় সব কিছুই। অতি চমৎকার চারু-শিল্পে বিমণ্ডিত করে এ মহাবিহার গঠিত ও সজ্জিত করা হলো। বুদ্ধের শুভাগমন হবে যে পথে, সে পথটি পরিষ্কৃত ও সুসজ্জিত করে স্থানে

স্থানে নির্মাণ করা হলো সুশোভন বিশ্রামশালা ও বিচিত্র তোরণ। সর্বকার্য সুসম্পন্ন হলে, বুদ্ধের আগমন কামনা করে সংবাদ পাঠালেন পিতার নিকট। রাজা যথা সময়ে সুগতকে এ সংবাদ জানিয়ে তিন মাসের জন্য সসম্মানে বিদায় দিলেন। সম্বুদ্ধ সশিষ্য যুবরাজের প্রদেশাভিমুখে অগ্রসর হলেন।

বুদ্ধ-গৌরবে উৎফুল্ল ও উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল রাজনন্দন সুমনের শ্রদ্ধা-প্রবণ অন্তর। তিনি মহাপারিষদ সমভিব্যাহারে বিচিত্র ধ্বজা-পতাকা, মঙ্গলঘট, মঙ্গল বাদ্য, পুষ্পমাল্য ও পুষ্প-স্তবক হস্তে যোজন পথ আগুয়ান হয়ে মহামানবকে অভ্যর্থনা করে নিলেন। পুণ্য-লক্ষণ পরিশোভিত জ্যোতির্ময় বুদ্ধ ও ভিক্ষুসংঘের দর্শন পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হলো জনসংঘ। তখন ত্রিরত্নের জয়-ধ্বনিতে মুখরিত হলো আকাশ-বাতাস। সুললিত তানে বেজে উঠল বাদ্য-বাঁশরীর মধুর নিক্কণ। অজস্র বিকীর্ণ হলো লাজ-পুষ্প। স্তোত্রে হলো দিঙ্‌মণ্ডল মুখর। উৎসবামোদিত জনসংঘ সশিষ্য বুদ্ধকে সগৌরবে অভ্যর্থনা করে আনলেন বিহারে।

কস্তুরী, কুম্‌কুম্ ও ধূপগন্ধে সুরভিত হলো বিহার। বিবিধ পূজোপচারে পূজিত হয়ে নক্ষত্র-বেষ্টিত পূর্ণচন্দ্রসম ভিক্ষুগণ পরিবৃত সম্বুদ্ধ প্রবেশ করলেন বিহারে। সুষমা-মণ্ডিত পুষ্প-বিতান, পুষ্প-সম্ভার ও পুষ্প-লতিকায় সুসজ্জিত পুষ্পাসনে সমাসীন হলেন জিনরাজ তথাগত।

সম্বুদ্ধের পদারবিন্দে অবলুণ্ঠিত হয়ে পড়ে বন্দনা করলেন রাজনন্দন সুমন। অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্রে দান করলেন তিনি উদ্যান ও বিহার। আনন্দাতিশয্যে কুমার হৃদয়োচ্ছ্বাস ব্যক্ত করার মানসে কৃতাঞ্জলিপুটে ভাষণ করলেন এই প্রীতি-গীতিকা ---

১। "প্রভু, আজি মম শুভদিন অতি এদিন পাবো না আর,
তুমি বুদ্ধ ধন জগত-দুর্লভ তুমিই রতন-সার।'
২। বহু জনমের সাধনার ফলে পেয়েছি দর্শন তব,
এমন সুক্ষণ লভেছি যখন সুকর্মে নিরত হব।

৩। উদার অন্তরে লক্ষ মুদ্রা দিয়ে কিনেছি উদ্যান এই,
লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে নির্মাণ করেছি মহান বিহার এই।
৪। ওহে কারুণিক, সুগত প্রধান লভিতে মহান পুণ্য,
নিবেদিব এই উদ্যান-বিহার নিজকে করিতে ধন্য
৫। সম্বুদ্ধ প্রমুখ মহা ভিক্ষুসংঘে আনন্দে করিনু দান,
গ্রহণ করুন করুণা অন্তরে দীনের এ প্রতিষ্ঠান।
৬। এ মহাপুণ্যেতে অনাগতে আমি কোনো এক সম্বুদ্ধের,
প্রধান সেবক হতে পারি যেন রইলো প্রার্থনা এর।
৭। ওহে ভগবন্, আরাধনা করি তব পদে জোড় করে,
আশীষ প্রদানে কৃতার্থ করুন বাসনা পূরণ তরে।"

রাজতনয় সুমন বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষু-সংঘকে ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ও অকুণ্ঠ অন্তরে উদ্যান সহ বিহার দান করলেন। আজ তাঁর অন্তরে প্রবাহিত হচ্ছে আনন্দের শতধারা। এমন ভক্তি-বিহ্বল হয়ে পড়লেন যে তিনি, আপন সাধের জীবন পর্যন্ত আজ উৎসর্গ করে দিতে চান তথাগতের শ্রীচরণে।

কুমার তখন স্ত্রী-পুত্রাদি স্বীয় পরিজন ও অমাত্যবর্গকে সম্বোধন করে বললেন---"ওহে আমার প্রিয় আত্মীয়-স্বজন ও অমাত্যগণ, লোকগুরু তথাগত একমাত্র আমাদের কল্যাণার্থেই বহুদূর থেকে এখানে শুভাগমন করেছেন। মহাসমুদ্র বহুদূর বিস্তৃত, অগাধ জলের আধার ও অমূল্য-রত্নের আকর। মহামানব বুদ্ধের সুগুণরাশি কিন্তু, ততোধিক গভীর ও অপ্রমেয়। চিন্তা করলে সমুদ্ধের অচিন্তনীয়তা, বুদ্ধি হয় বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন! সদ্ধর্মের গৌরব প্রয়াসী তথাগত, ভোগ্য-বস্তুর প্রত্যাশী নন। আমি ঐকান্তিক শ্রদ্ধায় অনুপ্রাণিত হয়ে সানন্দে সকলকে জানাচ্ছি---এমন সুক্ষণ সুদুর্লভ। তাই এ সুযোগে তিন মাস আমি প্রব্রজ্যা জীবন যাপন করবো। এখানেই অবস্থান করবো শান্তেন্দ্রিয়-শুদ্ধাচারীদের সান্নিধ্যে। বুদ্ধের দর্শন লাভ বড়োই দুর্লভ। তৎপ্রতি অবহিত হয়ে নিজকে পুণ্যমুখী করা প্রত্যেকেরই

কর্তব্য। অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র সশিষ্য বুদ্ধকে নিত্য দানে এবং পরিচর্যায় জীবনকে পুণ্যময় করার এ'ই উত্তম সুযোগ।''

তিন

সুমন যথা সময়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেন। তিনি সম্বুদ্ধের প্রধান সেবক সুমন স্থবিরের আবাস কুটীরের পার্শ্ববর্তী কুটীর খানিতে অবস্থান করতে লাগলেন। উদ্দেশ্য—সেবক স্থবিরের সেবা-ব্রত সন্দর্শনে তাঁর কৌতূহলের করতে চান নিরাকরণ। সমুৎসুক দৃষ্টিতে তিনি প্রত্যক্ষ করেন প্রধান সেবকের সেবা-তৎপরতা, সেবা-নিপুণতা, সেবা-পরায়ণতা, শ্রমশীলতা ও নিরলসতা। দেখে দেখে হন চমৎকৃত ও অভিরমিত। চিন্তা করেন অনন্যমনে—''অতি উত্তম! অতি উত্তম! এরূপ অসাধারণ গুণ না থাকলে কি হতে পারেন বুদ্ধের একনিষ্ঠ প্রধান সেবক! আশ্চর্য, কী অসীম মমতা, অগাধ প্রেম, অনুপম প্রীতি-ভক্তি! আহা, কতো সৌভাগ্য-বান ইনি! নিশ্চয়ই হবো আমিও, কোনও এক ভবিষ্যৎ সম্বুদ্ধের এরূপই গুণ-গরিমা মণ্ডিত একনিষ্ঠ প্রধান সেবক। এটাই আমার ঐকান্তিক কামনা-প্রার্থনা, এটাই আমার দৃঢ়-সঙ্কল্প।''

শ্রদ্ধার প্রাবল্য হেতু প্রব্রজ্যায় হলেন অভিরমিত; উপভোগ করলেন পরাশান্তি। বিশেষতঃ বিশুদ্ধ-চিত্ত পুণ্য-পুরুষদের সংসর্গই এর মুখ্য কারণ। শুদ্ধ-হৃদয় জনগণ মণির মতো গুণ-গৌরবে বিমণ্ডিত। তাঁদের চিত্ত-কোকনদ পারিজাত পুষ্পাপেক্ষাও কোমল, সুন্দর ও সুরভিত। কল্যাণ-প্রদ তাঁদের বাক্যাবলী। আচরণ ও সৌজন্য শান্তি-বিধায়ক। অনুত্তর সজ্জন সংস্পর্শে সুমনের অন্তর হলো আলোকোজ্জ্বল। ধর্ম-প্রীতিরসে স্নাত হলো তাঁর হৃদয়। তন্ময় হয়ে পড়লেন তিনি বাঞ্ছিত রত্নের সাধনায়।

সমাগত প্রায় মহাপ্রবারণা পূর্ণিমা। সপ্তম দিন উদ্‌যাপিত হবে সেই পুণ্য-ব্রতের পুণ্যানুষ্ঠান। উদারচেতা সুমন সপ্তদিন ব্যাপী পবিত্র পুণ্য-ক্ষেত্রে

প্রবর্তন করলেন অসদৃশ মহাদান। প্রবারণা দিবসে প্রত্যেক ভিক্ষুকে দান করলেন মহার্হ ত্রিচীবর। মহাদানের অবসানে সুমন তথাগতের চরণ-প্রান্তে নতজানু হয়ে এরূপ প্রার্থনা করলেন---"ভন্তে ভগবন্, এ তিন মাসে আমি যা পুণ্যরাশি অর্জন করেছি, তৎপ্রভাবে আমি যেন অনাগতে কোনও একজন সম্বুদ্ধের প্রধান সেবক হতে পারি, যেমন আপনার প্রধান সেবক সুমন স্থবির। এই আমার ঐকান্তিক প্রার্থনা।"

ত্রিকালজ্ঞ তথাগত দিব্যজ্ঞানে সম্যক্ অবগত হলেন---'সুদূর ভবিষ্যতে সুমনের প্রার্থনা ফলবতী হবে'। তখন সম্বুদ্ধ স্মিত-মধুর উদাত্ত কণ্ঠে বললেন---"সুমন, তোমার প্রার্থনা পূর্ণ হবে। লক্ষকল্প পরে জগতে আবির্ভূত হবেন গৌতম নামধেয় সম্যকসম্বুদ্ধ। অপ্রতিম পুণ্যের অমিত-প্রভাবে তুমি হবে তাঁর প্রধান সেবক। তোমার নাম হবে---***'আনন্দ'***।

সর্বজ্ঞ পদুমোত্তর বুদ্ধের শ্রীমুখ-নিঃসৃত অপূর্ব ভবিষ্যৎ-বাণী শ্রবণে সুমনের অন্তরে অফুরন্ত আনন্দ-হিল্লোল প্রবাহিত হলো। ক্ষণে ক্ষণে জাগলো পুলক-শিহরণ। হৃদয়-তন্ত্রীতে ঝঙ্কৃত হলো সান্ত্বনাময়ী আশার বাণী। প্রীতিরুচ্ছ্বাসে বলে উঠলেন তিনি---"অদ্বিতীয়, অদ্বিতীয়-বাক্য বুদ্ধের! একান্ত-সত্য সুগত-ভাষিত অমোঘ-বাণী। নিশ্চয়ই একদিন নিরবশেষ পূর্ণতায় পূর্ণ হবে আমার মনোবাসনা।"

'আত্মোৎসর্গের মাধ্যমে সাধনার সফলতা অর্জন করতে হবে' ইহাই সুমনের সম্যক্-সঙ্কল্প। প্রগাঢ় শ্রদ্ধাকে অভিমুখী রেখে পুর্ণোদ্যমে আপন জীবন-তরী তিনি চালিত করলেন। অবশিষ্ট জীবন পরমার্থ ধর্মে নিজকে নিয়োজিত রাখলেন তিনি। শান্তিপ্রদ মার্গানুসরণে জীবনকে করলেন সমুজ্জ্বল। তাঁর সুদীর্ঘ লক্ষ বৎসর পরমায়ুর অবসান ঘটলো একদিন। পুণ্য-সংস্কার বিমণ্ডিত হয়ে সংবরণ করলেন তিনি মানব-লীলা। পুণ্য-সুষমা মণ্ডিত সুমন দেবপুরে অভাবনীয় দিব্যদেহে প্রাদুর্ভূত হলেন। তাঁর দীপ্তোজ্জ্বল নয়নাভিরাম দেহ-জ্যোতিঃতে দেবগণের দেহ-প্রভা বিমর্ষ হয়ে গেল।

—(মনোরথপূরণী ও থেরগাথার অর্থকথা)

চার

সুমন ছিলেন বড়ো পুণ্যবান। তাঁর জীবন-ধারা পুণ্য-দ্যোতক ও সৌভাগ্য-ব্যঞ্জক। তিনি ছিলেন—রাজপুত্র, বুদ্ধের ভ্রাতা, বুদ্ধগত প্রাণ, সদ্ধর্মনিষ্ঠ, সম্বুদ্ধের প্রধান সেবকত্ব প্রাপ্তির প্রণিহিত প্রণিধি যুক্ত এবং শ্রাবক-পারমীর পূর্ণতা প্রাপ্তির একনিষ্ঠ সাধক। একাধারে এতোগুণ, এতো সৌভাগ্য কয়জনের ভাগ্যেই বা ঘটে! তাঁর জন্ম-প্রবাহকে সানন্দে বাড়িয়ে দিলেন অগ্রগতিতে, বহু দূর হতে দূরান্তরে---লক্ষ কল্পের ব্যবধানে; একি সহজ ব্যাপার! একান্ত বাঞ্ছিত মনোরম সুবাসযুক্ত পুষ্পমাল্যের মতো বরণ করে নিলেন তিনি অগণিত জন্ম-দুঃখ। প্রার্থনার চরমসীমা প্রাপ্তিই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য।

সুমনের অনন্ত জন্মের ইতিবৃত্ত যদিও বা কালের অতল-তলে নিমজ্জিত রয়েছে, তবুও তার জন্মান্তরের কয়েকটা হৃদয়গ্রাহী উপাদেয় কথা-কাহিনী জানবার সৌভাগ্য লাভ হয়েছে, একমাত্র অদ্বিতীয় দূরদর্শী সর্বজ্ঞ বুদ্ধের অনুকম্পায়। তদ্দৃষ্টে জানা যায়, তাঁর দেব ও মানব জন্মের সংখ্যাই সমধিক। সে সব জন্ম অতি পবিত্র, অতি সুন্দর, অতি গৌরবময় ও আদর্শস্থানীয়। ক্বচিৎ কোনো কোনো সময়ে তিনি তির্য্যক কুলেও জন্ম নিয়েছেন বটে, কিন্তু তাও মহিমা-ব্যঞ্জক। সকল জন্মই পুণ্যপ্রভা-মণ্ডিত মাহাত্ম্য-জ্ঞাপক। আশ্চর্যের বিষয়, সুমনের প্রায় জন্মেই তাঁর অন্তর্দেবতা গৌতম বোধিসত্ত্বের সান্নিধ্য ও সাহচর্য লাভে তিনি কৃতার্থ ও ধন্য হয়েছিলেন এবং নিজকে পরম সৌভাগ্যবান মনে করেছিলেন।

দেখা যায়, জন্মান্তরে তাঁদের পরস্পরের মধ্যে ঐক্যভাব, সৌহার্দভাব, অবিরোধ ভাব, ভ্রাতৃসম্বন্ধ, পিতা-পুত্র ও গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ; রাজা, অমাত্য অথবা পুরোহিত সম্বন্ধ। এমন কি, কোনো জন্মে অপরিচিত হলেও, ঘটনাচক্রে কোনও সময়ে উভয়ের যদি দেখা হয়; তা হলে, তখনই পরস্পরের

অন্তরে জেগে ওঠে---মৈত্রী, প্রীতি, স্নেহ ও মমতা ভাব। কোনো জন্মে একে অন্যের প্রতি করেছিলেন সাহায্য-সহানুভূতি প্রদর্শন, কোনো জন্মে প্রাণ-দান বা প্রাণ দানে উদ্যত, কোনো জন্মে গুরুতর অপরাধের ক্ষমা, আর কোনো জন্মে উপদেশ দানে ন্যায় ও সৎকার্যে নিয়োজন। এরূপ নানা জন্মে নানা ভাবে তাঁদের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল মধুর-মিলন।

মানব জন্মে তাঁকে ৮২ (বিরাশি) বার রাজা ও মহারাজা এবং কলিঙ্গ-বোধি জাতকে রাজচক্রবর্তী রূপে দেখতে পাই। বহুবার রাজপুত্র, শ্রেষ্ঠী, ধনকুবের, মন্ত্রী, রাজগুরু, পুরোহিত ব্রাহ্মণ এবং বিশিষ্ট পরমার্থ মানবরূপেও দর্শন পাই। তির্যক কুলেও তাঁকে দেখা যায়---নাগরাজ, হরিণ, কুকুর, মর্কট, হংস, শুকপক্ষী, কর্কট ও অন্যান্য অবস্থায়। সংসার এ কি বৈচিত্র্যময়!

থেরগাথার অর্থকথা ও জাতকার্থকথা প্রভৃতি গ্রন্থে প্রাপ্ত আনন্দ সম্পর্কিত কাহিনী সমূহ বর্ণনা করা যাক এবার।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ধনপতি

এক

আত্মশুদ্ধির প্রধান উপায় অতিথি-সেবা। মৈত্রী-করুণার পূর্ণতা লাভ হয় অতিথি-সেবার মাধ্যমে। ধর্মসাধনের পক্ষে এটাই প্রকৃষ্ট পন্থা। দান, শীল ও ভাবনার পরিপোষকতা সম্পাদন করে এ অতিথি-সেবা। মানব-জীবনকে সুষ্ঠু, পুষ্ট, সঞ্জীবিত ও মধুময় করে তোলে এ অতিথি-সেবা। মানব-অন্তরের ক্রমোন্নতি সাধন ক'রে সমগ্র জীব-জগতের কল্যাণার্থে আত্মদানে উদ্বুদ্ধ করার অঙ্কুরে রয়েছে অতিথি-সেবা।

বুদ্ধ-সেবক আনন্দ তাঁর পূর্ব জন্মে কিরূপ অতিথিসেবক ছিলেন, জাতকাদি গ্রন্থে এর বহু নিদর্শন দেখা যায়। যা'কে ভিত্তি করে আজ তিনি গরীয়াণ কীর্তি-কলাপে জগৎ-বরেণ্য ও সমুজ্জ্বল সেবা-ব্রতের পরাকাষ্ঠারূপ অভ্রংলিহ সৌধ-নির্মাণে সমর্থ হয়েছেন, তা এক জন্মের সাধনা নয়, অনন্ত জন্মের অনন্ত কর্মশক্তির সমবায়ের দীপ্তোজ্জ্বল অবদান। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এখানে পরিবেষণ করা হলো তাঁর এক জন্মের কাহিনী। এতেই করবে তাঁর অতীত জন্মকে উপলব্ধি করার সহায়তা। যেমন মহাসমুদ্রের অতল-স্পর্শ জলরাশির রসাস্বাদ উপলব্ধি করার সাহায্য করে—মাত্র এর একবিন্দু জল।

দুই

সুদূর অতীতের কথা। আমাদের পূর্বপরিচিত সুমন কর্ম-চক্রের আবর্তনে বারাণসীর জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তির পুত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করলেন। কালক্রমে তিনি প্রভূত ধনের অধিকারী হলেন। তখন মহারাজ ব্রহ্মদত্ত ছিলেন বারাণসীর অধীশ্বর। এই ধনপতি গৌরবময় মহাশ্রেষ্ঠী উপাধি-ভূষিত হয়ে মহারাজের ধনাঢ্য ও সম্ভ্রান্ত পরিষদের উজ্জ্বল রত্নরূপে অধিকার করেছিলেন বিশিষ্ট স্থান।

এ ভাগ্যবান পুরুষটি ছিলেন বড়ো ধর্মপরায়ণ। দানে ছিল তাঁর পরম প্রীতি। সানন্দে করতেন অতিথি সৎকার। কোনো দিন কোনও অতিথি তাঁর আতিথ্য লাভে বঞ্চিত হন নি। নিজহস্তে অতিথি সেবা করতে পারলেই নিজকে তিনি কৃতার্থ মনে করতেন।

তিন

একদিন বারাণসী নগরীতে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল এক তাপস। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ তাঁর শরীর। প্রফুল্লতা ব্যঞ্জক কান্তিময় মুখ-মণ্ডল। অধো-দৃষ্টিতে শান্ত -সুসংযত ধীর-পদবিক্ষেপে পথ অতিক্রম করে যাচ্ছেন তিনি। হিমবন্ত প্রদেশে তাঁর আশ্রম। সেখানে তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ তপশ্চর্যায় নিরত আছেন। অরণ্য-পর্বতে অবস্থানকারী তাপসগণের কোনো কোনো সময়ে লবণাম্বল সেবনের প্রয়োজন হয়। এ মহাপুরুষেরও লোকালয়ে আসার এটাই একমাত্র কারণ।

তাপস মন্থর-গতিতে এসে দাঁড়ালেন ধনপতির গৃহদ্বারে। তখন গৃহে অতিথি সেবক গৃহপতি ছিলেন না। তিনি গিয়েছেন রাজ-দর্শনে গৃহবাসী অন্য কারও নয়ন গোচর হলেন না এ নবাগত অতিথি। কিছুক্ষণ

অপেক্ষার পর ফিরে চললেন তাপস অন্য স্থানের উদ্দেশে। কিন্তু, তাঁর গন্তব্যপথে বাধা পড়লো ধনপতির আগমনে। গৃহদ্বার থেকে অতিথি বিমুখ হয়ে ফিরে যাচ্ছেন দেখে, শশব্যস্তে ধীমান্ প্রণত হলেন তাপস-চরণে, অপরাধীর মতো। সগৌরবে তাঁর হস্ত থেকে পাত্র গ্রহণ করে সকাতর অনুরোধ বাক্যে বললেন---"তপোধন, দয়াদানে বাধিত করুন, অনুগ্রহ পূর্বক অধীনের সঙ্গে আসুন।"

তাপস দ্বিরুক্তি না করে নিবেদকের সঙ্গে ফিরে চললেন। সেবাপরায়ণ গৃহপতি আপন গৃহদ্বারে মহামান্য অতিথির পাদপ্রক্ষালন করে দিলেন অতি যত্নে। স্বীয় উত্তরীয় বস্ত্রে মুছায়ে দিলেন তদীয় পাদপদ্ম। সজ্জিত হলো উত্তম গৌরবময় আসন। অতিথি উপবিষ্ট হলে, তাঁর চরণে শ্রেষ্ঠী সযত্নে তৈল মর্দনের পর সংবাহন করে দিলেন।

প্রাথমিক ব্রত সম্পাদনের পর জলযোগের ব্যবস্থা করা হলো সাড়ম্বরে। তারপর হলো স্নানের বন্দোবস্ত। ঈষদুষ্ণ সুবাসিত জল, সুগন্ধ চূর্ণ, সবই সজ্জিত হলো। গৃহপতি নিজ হস্তেই অতিথিকে স্নান করিয়ে দিলেন। শ্রেষ্ঠীর অনুরোধে সজ্জিত ভোজনাসনে উপবিষ্ট হলেন তাপস। অভ্যাগতের জন্য যথানির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উত্তম অন্ন-ব্যঞ্জন স্বর্ণ থালায় সোল্লাসে নিজ হস্তেই পরিবেষণ করলেন তিনি। সুগন্ধ শালি-চাউলের অন্ন, ঘৃতপক্ষ বিবিধ রসাল ব্যঞ্জন, পরমান্ন, দুগ্ধ, মিষ্ট সামগ্রী, আরো কতো কি, ধনবানের খাদ্য-ভোজ্যের কি অন্ত আছে?

আহারের সময় প্রীতি-আলাপে প্রবৃত্ত হলেন গৃহপতি। তাঁর কণ্ঠ-স্বর শ্রুতি-সুখকর; বাক্যালাপ যুক্তি-উপমা-পূর্ণ রসময়। তাপস প্রফুল্ল মনে ধীরে ধীরে আহার করতে লাগলেন। ভোজ্য-বস্তু হতেও মধুরতর মনে হলো গৃহপতির আলাপ ও ব্যবহার। অতিথি অনির্বচনীয় আরাম-দায়ক পরিবেশের মধ্যে পরিতৃপ্তি সহকারে নিবৃত্তি করলেন তাঁর মনের ক্ষুধা ও উদরের জ্বালা।

আহার কৃত্যের অবসানে সুখালাপে প্রবৃত্ত হলেন গৃহপতি। বললেন বিনীত বাক্যে---"তপোধন, ইতঃপূর্বে কোনও অর্থী, কোনও তাপস-ব্রাহ্মণ আমার গৃহদ্বারে এসে বিমুখ হয়ে ফিরে যান নি। কিন্তু, আজ আপনি ফিরে যাচ্ছিলেন আমার পরিজন বর্গের অনবধানতা হেতু। হে তপোনিধি, আপনি দয়া করে আমাদের এ অনিচ্ছাকৃত ত্রুটী ক্ষমা করুন। মনে যদি ক্রোধ-সঞ্চার হয়ে থাকে, তবে তা পরিহার করুণ।"

তাপস স্মিত-হাস্যে বল্লেন---"মহাভাগ, ক্রুদ্ধ হওয়া আমার স্বভাব-ধর্ম নয়। ক্রোধকে বড়ো ঘৃণা করি আমি। বিশেষতঃ ক্রুদ্ধ হবার মতো তেমন কোনও কারণ এখানে উৎপন্ন হয় নি। কেবল একবার মাত্র আমার মনে এরূপ বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল---অতিথিকে প্রত্যাখ্যান করাই এদের কুল-ধর্ম বোধ হয়।"

"তা কখনও নয় প্রভু, পুরুষানুক্রমেই আসন, পানীয় ও খাদ্য-ভোজ্য দানে অভ্যর্থনা ও সম্মান রক্ষা করা আমাদের কুল-ধর্ম।"

চার

ধনপতি যেন তাঁর সাধনার ধন হাতে পেয়েছেন। পলকের তরেও তাপসকে তিনি চোখের অন্তরাল করতে চান না। শ্রেষ্ঠীর সেবা-যত্ন, সরলতা ও শিষ্টাচারে বিরাগীর অন্তরে অনুরাগের সঞ্চার হলো। তাপসের সরল-শোভন অন্তরে মমতার রেখাপাত করল। তাঁদের পরস্পরের মধ্যে সখ্যতা ও চিত্তসমতার অপূর্ব সমাবেশ হলো। এ মিলন বড়ো মধুর, বড়ো শান্তি-প্রদ।

কে ইনি, এ মহিমময় তাপস? ইনিই কি সেই পুণ্যপুরুষ গৌতম-বোধিসত্ত্ব? ধনপতির বহুকল্প সাধনার ধন? হ্যাঁ, হ্যাঁ, ইনিই সেই মহা-সত্ত্ব। এ পুণ্যময় তাপস আর এই ধনপতি উভয় সজ্জনই জন্ম-জন্মান্তরে পরস্পর পরস্পরের প্রতি নিবিড় ঘনিষ্ঠতা, হৃদ্যতা ও স্নেহ-মমতার অনিবার

আকর্ষণরূপ শৃঙ্খল রচনা করে আসছেন। তাই আজ একে অন্যের দর্শন লাভ মাত্রই তাঁদের সংস্কার মণ্ডিত অন্তরে স্বতঃই ফুটে উঠেছে পবিত্র মৈত্রী, প্রীতি ও ভালবাসা, পঙ্কজে স্বভাবত মধু-সৌরভ সঞ্চারের মতো। এ ধনপতিই মহামান্য আনন্দের ভবান্তরের অভিব্যক্তিরূপ সুষমা-মণ্ডিত সুপুষ্ট মুকুল।

পাঁচ

বহুদিন গত হয়ে গেল। এখনও বুদ্ধাঙ্কুর মহাশ্রেষ্ঠীর গৃহে অবস্থান করছেন। স্বস্থানে প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা করলেও, গৃহপতির ঐকান্তিক অনুরোধ কিছুতেই তিনি উপেক্ষা করতে পারছেন না। তবুও এক নির্জন রাত্রে তাঁর এরূপ ভাবোদয় হলো---"পরগৃহে সুখে অবস্থান করার উদ্দেশ্যে আমি সংসার ত্যাগ করিনি। অনুরাগে চিত্ত কলুষিত করার জন্যও প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিনি। তাপসের পক্ষে লোকালয় এবং অনুরাগ উভয়ই বিঘ্ন-সঙ্কুল। একান্তই ছিন্ন করতে হবে এ মোহ-বন্ধন। ত্যাগই শান্তি। আগামী কল্য নিশ্চয়ই এস্থান ত্যাগ করবো। নির্জন বনাশ্রমেরই আশ্রয় নেবো।"

রাত্রি হলো অবসান। রজনীর বিদায়-প্রশস্তি জানাতে সহাস্যে সমাগত হলো উষা। পূর্ব দিগন্ত হলো উদ্ভাসিত। ধনপতি তাপস-সন্নিধানে এসে জিজ্ঞাসা করলেন মৃদু-হাস্যে---"তপোধন, একাকী নির্জনেই আপনি রাত্রি যাপন করেন, কুশলে আছেন কি না, সে চিন্তায় উদ্বিগ্ন থাকি। সুখ-নিদ্রা হয়েছে তো? সর্বাঙ্গীন কুশল তো?"

তাপস প্রসন্ন কণ্ঠে বললেন---"মহাভাগ, আপনার সদিচ্ছাকে ধন্যবাদ। নির্জনেই সুখী হন তপস্বী। অননুরাগীর সুখ-নিদ্রাই হয়ে থাকে। রাত্রে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি---অদ্যই হিমবন্ত অভিমুখে যাত্রা করবো।"

তাপসের কথা শুনে ধনপতি মর্মাহত হলেন। এরূপ শোনার জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। আহত কণ্ঠে বললেন তিনি---"প্রভু, হঠাৎ

আপনার এ সিদ্ধান্তের কারণ কি? আমার অথবা আমার পরিজন বর্গের নিকট কোনও অসৌজন্য পেয়েছেন কি?''

তাপস স্নিগ্ধ স্বরে বললেন---''না, না উপাসক, তা নয়। বরং আপনাদের সেবা, যত্ন ও শিষ্টাচারে আমি বিমুগ্ধ হয়েছি। কিন্তু, যে কোনও সংসার ত্যাগীর সাধনার পক্ষে লোকালয় বিঘ্ন-সঙ্কুল। অতএব আজই আমি লোকালয় ত্যাগের সিদ্ধান্ত করেছি।''

ধনপতি বিনীত অনুরোধে বললেন---''প্রভু, আপনার অবশিষ্ট জীবন এখানেই অতিবাহিত করুন। সাধু-সজ্জনের দর্শনেও হয় কল্যাণ, অন্তরের সন্তাপ হরণ করে তাঁদের অমৃতোপম বাণী। আপনার ন্যায় শুদ্ধচরিতের সাহচর্য লাভ আমাদের পক্ষে পরম সৌভাগ্যের বিষয়।''

দৃঢ়চেতা বোধিসত্ত্ব বললেন গাঢ়স্বরে---''হে সুভগ, তপস্বী অভিরমিত হয় অরণ্যে-পর্বতে। নির্ঝরের মধুর ধ্বনি ও নির্মল শীতল-বারি প্রবাহিনী কুলুকুলু-নাদিনী শৈল-নন্দিনী স্রোতস্বিনী-ভূষিত নিবিড় বন-প্রদেশই তাপসদের প্রীতিপ্রদ। তাঁদের পক্ষে লোকালয় বিঘ্নস্বরূপ। সুতরাং আমাকে যেতেই হবে। অধীর হবেন না, আপনি জ্ঞানবান-বিবেচক। বিজ্ঞ-জনের পক্ষে অধৈর্য হওয়া শোভনীয় নয়।''

অশ্রু গদ্‌গদ্ কণ্ঠে ধনপতি কতো অনুনয়--বিনয় করলেন, কতো কাঁদলেন, কিন্তু কিছুতেই সঙ্কল্প-চ্যুত হলেন না মহাসত্ত্ব। তাঁর দৃঢ়তা দেখে অগত্যা অনিচ্ছা সত্ত্বেও মহাশ্রেষ্ঠী তাঁকে বিদায় দিতে বাধ্য হলেন। তাপস হিমালয় অভিমুখে অগ্রসর হলেন। গৃহপতি সজল-নেত্রে বহুদূর প্রত্যুদ্‌গমন করলেন তাঁর পুণ্য-তীর্থ তপোবনের। প্রিয়-বিচ্ছেদ বেদনা তাঁর দুঃসহ হলো।

—(পীঠ জাতক—৭১)

নন্দিকের আত্মদান

এক

সন্তানের পক্ষে মাতা-পিতা অগ্নিকল্প, আদিগুরু ও ব্রহ্মাস্বরূপ। মাতা-পিতার নিকট সন্তান চির-ঋণী। এ ঋণ পরিশোধ করা বড়োই দুঃসাধ্য। রাজচক্রবর্তীর শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য সপ্তরত্নও যদি জনক-জননীর চরণে নিবেদন করা হয়, পূজা করা হয়, এমন কি জীবন দিয়েও যদি করা হয় সেবা-পরিচর্যা, তবুও সন্তান ঋণ-মুক্ত হয় না। বরং এতে হয় পুণ্যার্জন। যে সন্তান মাতা-পিতাকে প্রতিষ্ঠাপিত করে পরমার্থ ধর্মে; শ্রদ্ধা, শীল ও ত্যাগে, সে'ই হয়ে থাকে ঋণ-মুক্ত। এটাই ঋণ-মুক্তির একমাত্র প্রকৃষ্ট পন্থা।

অতীতের রহস্যময় নিগূঢ়-কর্মের বিধানে ভগবান গৌতম বুদ্ধের সেব-কাগ্রগণ্য মহামান্য আনন্দকে ভবান্তরে এক সময় বানর-জন্ম গ্রহণ করতে হয়েছিল। তাঁর এ বানর-জন্মও মাহাত্ম্য-ব্যঞ্জক। বানরের কী যে মাতৃ-সেবা, মাতৃ-পোষণ, মাতার প্রাণ-রক্ষার্থে নিজের জীবন দান! তা স্মরণেও শরীর রোমাঞ্চিত হয়, শ্রদ্ধায় হয় অন্তর পরিপূর্ণ। বানরের এমন জ্ঞান, এমন মাতৃভক্তি, এমন আত্মত্যাগ, আশ্চর্য্য বটে! এরূপ বিস্ময়কর হৃদয়-বিদারক উজ্জ্বল-দৃষ্টান্ত মানবের মধ্যেও অতি বিরল। কিন্তু, বনের বানরকে এ শিক্ষা কে দিল? এরূপ জ্ঞান-দান করল কে? বাস্তবিকই তা প্রণিধান যোগ্য।

জন্মান্তরে উপচিত পুণ্য-সংস্কারের প্রবল শক্তির অপরিমেয় আকর্ষণ কেবল যে, মানবকে মহামানবে রূপায়িত করে, তা নয়; পশুকেও আদর্শে-উৎকর্ষে করে পর্যবসিত। এ বানরই এর জ্বলন্ত-নিদর্শন। এ মাতৃ-সেবক,

আত্মত্যাগী বানর কালক্রমে একদিন নিরবশেষ পূর্ণতার পরিণতিতে বুদ্ধ-সেবক আনন্দরূপে জগতের হয়েছিলেন বরেণ্য, নমস্য। মহামান্য আনন্দের পবিত্র ও গরিষ্ঠ জীবনীকে আলোকোজ্জ্বল করে তুলেছে, বানরের এ অবিস্মরণীয় মর্মস্পর্শী আত্মদানের করুণ-কাহিনী। এখানে বিন্যস্ত করা হলো সেই সুদূর অতীতের হৃদয়-ভেদী শোচনীয় কাহিনী।

দুই

দু'টি বানর। পরস্পর তাঁরা সহোদর। অগ্রজের নাম--'মহানন্দিক', আর অনুজের নাম---'কনিষ্ঠ নন্দিক।' উভয়েই আবদ্ধ ছিলেন ভ্রাতৃত্বের নিবিড় বন্ধনে। তাঁদের মাতা অতি বৃদ্ধা ও দৃষ্টিহীনা। অন্ধতা নিবন্ধন কোথাও যেতে পারেন না বৃদ্ধা বানরী। মাতাগত-প্রাণ সন্তানদ্বয় সানন্দে সম্পাদন করেন মায়ের সকল কার্য।

মহানন্দিক ছিলেন বহু সহস্র বানরের অধিপতি। তিনি মহাযূথের পরিচালক হয়ে হিমালয়ের অরণ্য প্রদেশে বিচরণ করতেন স্বাধীন ভাবে। সুপক্ব ও সুমধুর ফল পেলে, মায়ের নিকট তা পাঠিয়ে দিতেন। একদিন মায়ের সেবায় নিযুক্ত আছেন ভ্রাতৃদ্বয়। একজন করে দিচ্ছেন কণ্ডুয়ন, আর একজন করছেন মায়ের শরীরে মৃদু কর-সঞ্চালন।

মহানন্দিক দেখলেন, মায়ের শরীর ক্ষীণ হয়ে গেছে। বুঝতে পারলেন---"রীতিমতো চলছে না মায়ের আহার।" অনুসন্ধানেও জানতে পারলেন---"যাদের দ্বারা ফল পাঠান যায়, মাকে না দিয়ে তারাই তা খেয়ে ফেলে।" বানরেন্দ্র এতে দুঃখিত হয়ে চিন্তা করলেন--- "যূথ নিয়ে ব্যস্ত থাকলে আর চলবে না; অচিরেই হারাতে হবে পুণ্যতীর্থ মাকে। যূথ ত্যাগ করাই মঙ্গল হবে।" এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে তিনি যূথ ত্যাগ করলেন। ভ্রাতৃদ্বয় মাতৃ পোষণে মনোযোগী হলেন। হিমালয় ত্যাগ করে অন্যত্র গমনের মনস্থ করলেন তাঁরা। সুতরাং মাতাকে পৃষ্ঠে নিয়ে স্থান হতে

স্থানান্তরে যেতে লাগলেন। পরিশেষে তাঁরা এক প্রত্যন্ত অঞ্চলে উপনীত হয়ে এক সুবৃহৎ বটবৃক্ষে মাতাকে রক্ষা করলেন। এক ছেলে নিত্য নিযুক্ত থাকেন মাতার সেবায়, অপর ছেলে নানাদিক থেকে ফল এনে মাতাকে দেন। এরূপে ভ্রাতৃদ্বয় সারাক্ষণ মাতৃ পোষণেই নিরত থাকেন। পশুজাতির এমন মাতৃভক্তি বড়োই বিস্ময়ের বিষয়। এরূপ সদাচার মানব মাত্রেরই অনুকরণীয়।

তিন

এক ব্যাধ। সে সারাদিন ধনু হস্তে বনে বনে বিচরণ করে। সম্মুখে যা পড়ে, তা'ই হত্যা করে নির্বিচারে। নিজের প্রয়োজন মতো রেখে, বিক্রয় করে অবশিষ্ট মাংস। সে'অর্থে ক্রয় করে শালি চাউল, দধি ও ঘৃতাদি উৎকৃষ্ট দ্রব্য। ভোজন সময়ে মাংসের রসনা-তৃপ্তিকর মধুর আস্বাদ পেয়ে চিন্তা করে সে---"বেশ, কী রসাল খাদ্য! আমার মতো সুখী কে? 'চর্ব্য-চূষ্য-লেহ্য-পেয়' আমার কিসের অভাব? বেশ আরামেই কেটে যাচ্ছে আমার রসময় দিনগুলি।"

পাপ কাজ মাত্রই আপাতমধুর। পাপ যখন পরিপক্ব হয়ে ফল প্রদান করতে আরম্ভ করে, পাপী তখন মহাদুঃখে নিমগ্ন হয়। চক্ষের জলে বক্ষ ভাসে। অজ্ঞজন রসনার তৃপ্তি সাধন মানসে স্বেচ্ছায় নিজকে ধ্বংসের পথে এগিয়ে দেয়।

সেদিন ব্যাধের বড়ো দুর্ভাগ্য। কুক্ষণে সে ঘরের বের হয়েছে। বনে বহু ঘোরা-ফেরা করল, কিন্তু কিছুই জুটল না। তবুও তার অনুসন্ধানের বিরাম নেই। এগিয়ে চল্‌ল সে বন হতে বনান্তরে। ঝোপে-ঝাড়ে করল অন্বেষণ, বৃক্ষের শাখা-প্রশাখায় করলো। দৃক্‌পাত, কিন্তু কিছুই মিললো না। এবার নয়ন-পথে পড়ল অদূরে এক প্রকাণ্ড বট বৃক্ষ। সেদিকে সে অগ্রসর হলো অতি সাবধানে।

এ বৃক্ষেই নন্দিক ভ্রাতৃদ্বয় মাকে নিয়ে অবস্থান করছেন। এ প্রাণীত্রয় এখানে মনের আনন্দেই আছেন। মাতৃভক্ত সন্তানদ্বয় এই মাত্র জননীকে ফলাহার করিয়ে তাঁর পশ্চাতে বসে বিশ্রামসুখ উপভোগ করছেন। এমনি সময় মহানন্দিক দেখলেন—এক ব্যাধ ধনু হস্তে অতি সন্তর্পণে এদিকে আসছে। তখন তিনি চিন্তা করলেন—"মা বৃদ্ধা ও জরা-জীর্ণা। তাই ব্যাধ মাকে কিছুই করবে না।" এ বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে ভ্রাতৃদ্বয় শাখান্তরালে আত্মগোপন করলেন।

ব্যাধ বৃক্ষতলে এসেই বানরীকে দেখতে পেল। চিন্তা করল সে—"শূন্য হাতে ফিরে যাওয়ার চেয়ে, এজীর্ণা বানরীকে নিয়ে গেলে ক্ষতি কি?" এ চিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই বানরীর বক্ষ লক্ষ্য করে ব্যাধ ধনু উত্তোলন করল। তা দেখে প্রমাদ গণলেন মহানন্দিক। তৎক্ষণাৎ অনুজকে ইঙ্গিতে জানালেন—"ভাই, আমার চোখের সামনে মাকে বধ করবে; তা কক্ষণো হতে দেবো না। আমার প্রাণ দিয়ে রক্ষা করবো মায়ের প্রাণ। তুই মাকে দেখিস্।" এ বলে মহানন্দিক দ্রুতবেগে ব্যাধের সম্মুখে উপস্থিত হলেন। শরমুখে স্থিত হয়ে তিনি যেন এরূপ মনোভাবই প্রকাশ করলেন—"মহাশয়, আমার মাকে শরবিদ্ধ করবেন না। আমার নিজের প্রাণের বিনিময়ে মায়ের প্রাণ রক্ষা করতে চাই। আমাকেই হত্যা করুন।"

তৎক্ষণাৎ মহানন্দিকের বক্ষস্থলে পাপিষ্ঠের বিষদিগ্ধ-শর বিদ্ধ হলো। ভূতলে পতিত হলেন কপিরাজ। তীব্র বিষ-যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করতে লাগলেন তিনি। অন্তিম সময়ে স্নেহ-নির্ঝরিণী মায়ের প্রতি ক্ষীণ-দৃষ্টি নিবদ্ধ করে চিন্তা করলেন—"মায়ের জন্য জীবন দান করার সৌভাগ্য লাভ করে ধন্য হলাম। এতেই নিষ্পাদিত হলো আমার পুণ্য-তীর্থের ব্রত-উদ্‌যাপন।" এ প্রসাদময়ী চিন্তার অবসানে মহানন্দিকের চক্ষু হলো চিরমুদ্রিত।

পূর্ণ হলো না পাপাশয়ের পাপ-লালসা। পুনরায় ধনুতে শর যোজনা করল বৃদ্ধ বানরীকে লক্ষ্য করে। তখন কনিষ্ঠ নন্দিকের কোমল অন্তর কেঁপে উঠল। তাঁর সম্মুখেই ঘটে গেল মহামান্য অগ্রজের শোচনীয় মৃত্যু। এ দারুণ-

দৃশ্যে তাঁর অন্তরে জ্বলে উঠেছে দুর্বিষহ শোকানল। যেন বিচূর্ণ হয়ে ভেঙ্গে গেছে তাঁর বক্ষ-পঞ্জর। দরবিগলিত ধারায় প্রবাহিত হচ্ছে তাঁর শোকাশ্রু। আবার আর এক হৃদয় বিদারক দ্বিতীয় দৃশ্য তাঁর নয়ন-পথে সমুপস্থিত হচ্ছে—মাতৃ-বধের বিভীষিকা। ক্ষণকাল চিন্তা বা অপেক্ষা করারও সময় নেই। স্থির করলেন—'অগ্রজ্যের পদাঙ্কনুসরণই আশু কর্তব্য।' সে ক্ষণেই তড়িৎ-বেগে শাখান্তরাল থেকে বের হয়ে স্থিত হলেন ব্যাধের শরপথে। কাতর-নিবেদনে যেন তিনি বলছেন— "মায়ের পরিবর্তে আমাকেই হত্যা করুন। ভ্রাতাদ্বয়ের বিনিময়ে মাতার প্রাণ-ভিক্ষা চাই।"

নরাধম ব্যাধের তীক্ষ্ণশর কনিষ্ঠ নন্দিকেরও বক্ষ ভেদ করল। তবুও মিট্‌লো না লুব্ধের পাপ-লালসা। প্রাণ-দানের-পরিবর্তে করল প্রাণ-সংহার। দুর্ভাগিনী নন্দিক-মাতাকেও সে হত্যা করল। আহা, কী নির্মম! কী পাষাণ অন্তর! পাপিষ্টের এপাপের পরিসীমা কে নির্ধারণ করবে?

চার

এই সংসার কাননে বিষবৃক্ষ ও চন্দন বৃক্ষ দুই-ই উৎপন্ন হয়ে থাকে। বিষ তরু সম দুর্জন সর্বনাশের সূচনা করে। তারাই জগতে দুরন্ত কালান্তকের মতো বিভীষিকার সৃষ্টি করে; উন্নতিশীল মহান্ জনের বিনাশের কারণ হয়। কিন্তু পরকল্যাণে নিয়োজিত হয় চন্দন বৃক্ষসম সজ্জনের প্রভাব। তাঁরা শত্রুর প্রতিও হন ক্ষমাবান। প্রাণী-জগতের হিত কল্পে তাঁরা অকাতরেই আত্মদান করেন।

হীনমতি ব্যাধ মর্কটের মৃত-দেহ তিনটি নিয়ে মনানন্দে গৃহাভিমুখে চল্‌ল। ঠিক সে মুহূর্তেই পাপিষ্ঠের গৃহে বজ্রপাত হলো। বজ্রাগ্নিতে গৃহ হলো ভস্মীভূত। এতে দগ্ধ হয়ে তার স্ত্রী ও দু'টি পুত্রের মৃত্যু হলো। পাপাত্মার পাপ এবার পূর্ণ হয়েছে। পাপ পূর্ণ হলে, এর অনুরূপ ফল

প্রাপ্তিও অবশ্যম্ভাবী। ব্যাধের ভাগ্যেও তাই ঘট্‌ল। সে গ্রামে এসেই এই মর্ম-বিদারক দুঃসংবাদ শুনে প্রিয়-বিচ্ছেদ শোকে অভিভূত হয়ে পড়ল। সে উন্মাদ হয়ে গেল। দূরে নিক্ষেপ করল তীর-ধনু ও বানরের মৃত-দেহ। ত্যাগ করল পরিহিত বস্ত্র। বক্ষে করাঘাত করতে করতে উলঙ্গ-দেহে দ্রুত-বেগে দগ্ধগৃহে এসে দাঁড়াল। সে' মুহূর্তেই ওর মস্তকে ভেঙ্গে পড়ল গৃহের একটা বৃহৎ জ্বলন্ত খুঁটি। এ দারুণ আঘাতেই পাতকীর মস্তক বিচূর্ণ হল। ধরিত্রী আর ধারণ করতে পারল না পাপীর পাপভার। ধরাতল দ্বিধা বিভক্ত হয়ে মহাপাপীকে গ্রাস করল। পাপিষ্ঠ তখনই অবীচি নরকে নিমজ্জিত হলো।

কর্ম-রহস্য বড়োই জটিল, বড়োই বৈচিত্র্যময়! চিত্ত-সন্ততির আবেষ্টনিতে হৃদয়-গুহায় কতো অনন্ত জন্মের অনন্ত 'অনুশয় কর্ম' লুক্কায়িত রয়েছে, কে এর ইয়ত্তা রাখে! নিগূঢ় দারুণ-কর্মের অনতিক্রম্য প্রবল প্রবাহ-তাড়িত জীব-কুল কতো যে অবাঞ্ছনীয় গতিপ্রাপ্ত হয়, সাধারণের তা চিন্তার অতীত। কোন্ নিদারুণ কর্মের তাড়নায় নন্দিক ভ্রাতৃদ্বয় ও তাঁদের মাতা পরিগ্রহ করেছিলেন এই বানর জন্ম? কেনই বা ভোগ করেছিলেন এরূপ শোচনীয় মৃত্যুদণ্ড? সে রহস্যের নিগূঢ়তত্ত্ব এখনও ভবান্তরের অতল-তলে রয়েছে নিমজ্জিত। অথচ কর্ম-কুশলতার ঊর্ধ্বগামী স্রোতের আকর্ষণে এ প্রাণীত্রয় একদা অসাধারণ মানবরূপে হবেন রূপায়িত। দীপ্যমান হবেন ভাস্বর আলোকপিণ্ডসম। *

(চুল্লনন্দিক জাতক—২২২)

* তখন ছিলেন গৌতমবুদ্ধ—মহানন্দিক, আনন্দ—কনিষ্ঠ নন্দিক এবং মহাপ্রজাপতী গৌতমী—তাঁদের মাতা।

নাগরাজের মহানুভাবতা

এক

পবিত্র-চেতা সজ্জনগণ সংযম ও শীলগুণের প্রভাবে দেবতারও প্রিয় হন। তাঁরাই সাধন করেন জগতের মহাকল্যাণ। এরূপ মহাতেজাঃ মহাপুরুষগণও পাপীয়সী রমণীর কুটিল চক্রান্তে রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের মতো ভীষণ বিপদ-গ্রস্ত হয়ে থাকেন। এমন কি প্রাণ সংশয় পর্যন্ত। নদী যেরূপ তটকে নিপাতিত করে, সেরূপ কুলকে নিপাতিত করে কুলটা ললনাগণ।

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের প্রধানা মহিষীর পুণ্যগর্ভে জন্ম নিলেন গৌতম বোধিসত্ত্ব। তাঁর নামকরণ করা হলো---'পদ্ম কুমার'। পুণ্যবান কুমার পুণ্য-লক্ষণ বিমণ্ডিত। অঙ্গ-সৌষ্ঠব অতি চমৎকার, মুখ-মণ্ডল উজ্জ্বল লালিত্যময়। তিনি ছিলেন সর্বগুণে অলঙ্কৃত এবং সকল বিদ্যায় পারদর্শী। পুত্রের উপযুক্ততা দর্শনে মহারাজ তাঁকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করলেন। এমন সময় তাঁর গর্ভধারিণীর মৃত্যু হলো। নৃপতি অন্য এক মহিষীকে পাটরাণী করে নিলেন।

এক সময় প্রত্যন্ত রাজ্যে বিদ্রোহের সৃষ্টি হলো। পদ্মকুমারের উপর রাজধানী ও রাজপুরী সুরক্ষার ভার দিয়ে রাজা বিদ্রোহ দমন মানসে যাত্রা করলেন। কুমার সোৎসাহে প্রতিপালন করতে লাগলেন পিতার আদেশ। একদিন পদ্ম কুমার বিমাতা প্রধানা মহিষীর অভাব-অভিযোগ জানবার উদ্দেশ্যে তাঁর প্রকোষ্ঠে উপনীত হলেন। ফুল্লযৌবন-মাধুর্যে বিভূষিত, লাবণ্য-মণ্ডিত কুমারকে দর্শন করে বিমুগ্ধ হলেন মহারাণী। বিলাসিনী কামিনীর অন্তরে জাগ্রত হলো তীব্র পাপ-বাসনা। কামোন্মত্তা লজ্জাহীনা-নারী সুশীলতা, আত্মমর্যাদা, কুল-গৌরব, এমন কি প্রাণ-সংশয়ের প্রতিও ভ্রূক্ষেপ করে না।

রাণী হাস্যোজ্জ্বল মধুর-মোহন প্রিয়-বাক্যে কুমারের নিকট নিবেদন করলেন আপন পাপ-বাসনা। উগ্রতেজাঃ মহাসত্ত্ব এ ঘৃণ্য-প্রস্তাব ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করলেন। নির্লজ্জাকে তাঁর মাতৃত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বিষাদপূর্ণ অন্তরে তৎক্ষণাৎ তিনি সেস্থান ত্যাগ করে চলে গেলেন।

সংস্বভাবই পুরুষোত্তমের শ্রেষ্ঠ আভরণ। এতেই তাঁরা বিমলতা লাভ করেন, দীপ্তোজ্জ্বল শারদীয় পূর্ণচন্দ্রের মতো। সজ্জনের সংযমের পক্ষে মণিরত্নও অতি তুচ্ছ। সংযমই প্রশান্তির নিদান।

আশাহতা রাজমহিষী ক্ষোভে, দুঃখে ও অপমানে জর্জরিত হলেন। কুপিতা সর্পিণীর মতো তাঁর দৃষ্টি হলো ক্রুর; স্ফীত-উন্মথিত হতে লাগল বক্ষস্থল। বঙ্কিম গ্রীবা-ভঙ্গীতে অন্তর্গূঢ় চাপা-গর্জনে বলে উঠলেন—"উঃ, কী দারুণ অপমান! নিশ্চয়ই এর প্রতিশোধ নেবো, যা অতি নির্মম —কঠোর—ভয়ঙ্কর।"

কামরাগ একটা বিষ, মোহ একটা বিষ, বিদ্বেষ কিন্তু মহাবিষ। প্রেম-প্রত্যাখ্যাতা রাণী মহাবিষে হলেন আক্রান্ত। তিনি ব্যাকুল অন্তরে রাজার প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায় রইলেন। সংসার-কান্তারে বিচরণ করে বিবিধ বিষময়ী নারী, কেহ উন্মাদকারিণী, আর কেহ প্রাণহারিণী! তারা কুসুম হতেও কোমল, সর্প হতেও ক্রুর। রমণীর বিচিত্র-চিত্ত অতীব দুর্জ্ঞেয়। 'স্ত্রীয়াশ্চরিত্রম দেবা ন জানন্তি, কুতো মনুষ্যা।'

দুই

রাজা অচিরেই বিদ্রোহ দমন করে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করলেন। রাণী তখন আলুথালু বেশে শয্যাশায়িনী হলেন। বিষাদ-রেখায় কলঙ্কিত তাঁর বদন-মণ্ডল। রাণীর বিলাস-ভবনে উপনীত হলেন নৃপতি। প্রিয়ার এ অবস্থা দেখে আশ্চর্য হলেন তিনি। এর কারণ জানতে সমুৎসুক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"প্রিয়ে, তোমার এ অবস্থা কেন?"

পাপীয়সী রমণীগণ পাপ-চাতুর্যে বেশ নিপুণ। মায়াবিনী-নারী মায়া-ক্রন্দনের আশ্রয় নিলেন। রাজার চোখে-মুখে অঙ্কিত হলো বিস্ময়ের গাঢ় রেখা। তিনি গম্ভীর অথচ প্রিয়-বাক্যে মহিষীকে পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা করলেন--- "প্রিয়ে, রাণি, তোমার এ বিষাদ ভাব কেন? কেন রোদন করছো? কি হয়েছে, প্রকাশ করে বলো।"

কুটিল অন্তরের কূট-বিষ উদ্‌গীরণ করার মতো রাণী উষ্ণ দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন ---"প্রাণেশ্বর, বড়ো অপমান, সহ্য হচ্ছে না। উঃ, এ লাঞ্ছিত-অপমানিত জীবন রাখার আর প্রয়োজন কি? উঃ, কী দুঃসাহস!" এতোদূর বলে রাণী নীরব হয়ে চোখে আঁচল দিলেন। এ কথা শুনেই রাজা ক্রোধান্ধ হলেন। রক্ত-চক্ষু বিস্ফারিত করে অন্তর্গূঢ় গর্জনে বলে উঠলেন--- "রাণি, তোমায় লাঞ্ছিত-অপমাণিত করার কার সাধ্য আছে? কে সে হতভাগ্য? বলো, কী অপমান করেছে তোমার? তার করা হবে সমুচিত দণ্ডের বিধান। মৃত্যু-ডালি শিরে নিয়ে দুরদৃষ্ট-অভাজন প্রবেশ করেছে সিংহের বিবরে! রাণি, নিঃসঙ্কোচে বলো, সে কোন্ অভাগা।"

কপট-নিশ্বাস ত্যাগ করে রাণী বললেন--- "প্রাণনাথ, সে কথা বলতে জিহ্বা আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আপনার কুল-প্রদীপ পদ্মকুমারের কথা শুনলে, কানে আঙ্গুল দেবেন। সে যে এমন কুলাঙ্গার, এতো নীচ, এতো হেয় তার অন্তর, স্বপ্নেও তা চিন্তা করতে পারি নি! তা'কে পুত্রাদপি স্নেহ করতাম। কিন্তু, প্রাণেশ্বর, তার কি দুঃসাহস; সে আমার নিকট এসে প্রস্তাব করলো—যা অতি ঘৃণিত, অতি জঘন্য, অতি লজ্জাকর! ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করলাম তার সেই কুপ্রস্তাব। বেদনাহত কণ্ঠে ওকে বল্‌লাম--- 'ছিঃ কুমার, তোমার মায়ের অবর্তমানে আমিই তো তোমার মাতৃ স্বরূপিণী মাতা। তোমার গর্ভধারিণীর মতোই আমায় দর্শন করবে।' কিন্তু, প্রাণেশ্বর, সে কুলাঙ্গার বলে কি--- 'রেখে দাও তোমার ওসব হিতকথা; আমার কথায় সম্মত আছো কিনা বলো?" আমি ঘৃণার সহিত ওর প্রস্তাব প্রত্যা-

খ্যান করে বল্‌লাম--- 'কক্ষণো না।' হতভাগা সক্রোধে আমায় প্রহার ও পদাঘাত করে চলে গেলো।" এতদূর বলে চোখে আঁচল দিয়ে রাণী রোদন করতে লাগলেন। এটা রোদন নয়, রোদনের ভান মাত্র। দুষ্ট-বুদ্ধি রমণীদের এরূপই স্বভাব।

দুষ্টা নারীদের পক্ষে এ জগতে দুঃসাধ্য কিছুই নেই। তারা সৃজন করতে পারে অমৃত হতে গরল, গরল হতে অমৃত। কুলকলঙ্কিনী নারী নিজ পতিকেও অক্লেশে হত্যা করতে পারে। যে পুরুষ কুহকিনী পত্নীর বশীভূত, তার হিতাহিত জ্ঞান লুপ্ত হয়ে যায়। অচিরে তার পতন অবশ্য-ম্ভাবী।

রাণীর খেদোক্তি শুনে রাজার ক্রোধানল জ্বলে উঠল ভীষণতর। তিনি হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়লেন। তৎক্ষণাৎ নরেন্দ্র মৃগেন্দ্র-গর্জনে হুঙ্কার ছেড়ে ঘাতককে কঠোর কণ্ঠে আদেশ দিলেন— "রে ঘাতক, এ মুহূর্তে দুরাচার পদ্ম কুমারকে বন্ধন করে নির্মমভাবে বেত্রাঘাত করতে করতে নিয়ে যাও ওই সুউচ্চ পর্বত-শিখরে। সেখান থেকে ঊর্ধ্বপাদ-অধোশির করে নরাধমকে প্রপাতে নিক্ষেপ করো। কুলাঙ্গারের পক্ষে এটা হবে সমুচিত দণ্ড।"

তিন

কামান্ধ-পুরুষ প্রেয়সীর জন্য করতে পারে না, জগতে এমন কিছুই নেই। কেহ ত্যাগ করে ধন-সম্পদ, কেহ বা ধর্ম, কেহ বা মাতা-পিতা ও পুত্র-কন্যা, এমন কি দেহ পর্যন্ত। মিত্র মিত্রকে যে নিধন করে, পিতা যে পুত্রকে হত্যা করে, এর মূলেও রয়েছে নারীর চক্রান্ত

প্রেয়সীর মায়া-ক্রন্দনে রাজার মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে গেল। বংশের উজ্জ্বল-রত্ন পদ্মকুমারের প্রাণ-দণ্ডের আদেশ দিলেন রাজা নির্বিচারে। রাজাদেশ প্রতিপালিত হলো। ঘাতকেরা পদ্মকুমারকে বেত্রাঘাত করতে

করতে পর্বতাভিমুখে নিয়ে চল্‌ল। কুমার বুঝতে পারলেন---'এটা পাপিয়সী রাণীরই চক্রান্ত।'

প্রশমশীল পদ্ম কুমার রাজা ও রাণীর প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করলেন না। বরং তাঁদের প্রতি তাঁর অক্ষুণ্ণ রইল অনাবিল মৈত্রীভাব। তিনি চিন্তা করলেন--- "এঁরা অজ্ঞানী। ভাল-মন্দ উপলব্ধি করার ক্ষমতা এঁদের নেই। অজ্ঞজন পাপকর্মে লিপ্ত হয়ে দুঃখে নিমগ্ন হয়। সুতরাং এঁরা করুণার পাত্র। মানবগণ যুগপৎ ভোগ করে কর্মের শুভাশুভ ফল। কর্মরূপ বীজ থেকে যথাসদৃশ ফল উৎপন্ন হয়।"

কুমার সম্যকরূপে প্রতিষ্ঠিত আছেন বিশুদ্ধ শীল, ক্ষমা ও মৈত্রীধর্মে। এহেতু তাঁর অন্তরে প্রবাহিত হচ্ছে আনন্দের, শতধারা। এ অবস্থায় মৃত্যু হলে, সে মৃত্যু আনয়ন করে স্বচ্ছন্দ-সুখময় নব-জীবন। সত্যনিষ্ঠ পদ্মকুমার শীলগুণ চিন্তায় অভিনিবিষ্ট হয়ে পর্বত-শিখরে আরোহণ করলেন। সেই পর্বতের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা দিব্যজ্ঞানে এসব বিষয় অবগত হলেন। বিশুদ্ধ-চরিত মহাসত্ত্বের প্রতি তিনি বড়ো প্রসন্ন হলেন। করুণায় হৃদয় আর্দ্র হলো। সে মুহূর্তেই কুমারের কর্ণকুহরে ধ্বনিত হলো আকাশবাণী-- "ভয় নেই, ভয় নেই, কুমার।"

ধর্মই ধার্মিককে রক্ষা করে। মহাসঙ্কটময় গাঢ়-তিমিরে ধর্মই আলোক স্বরূপ। ধর্মই সর্বক্লেশ নিবারক মহান্ আশ্রয় স্বরূপ।

তখন পর্বতাষ্টক নামক নাগভবন থেকে মহাঋদ্ধিধারী নাগরাজ পলকের মধ্যে পর্বত-পাদদেশে সমাগত হলেন। এ নাগরাজই সেই ভবান্তরের সুমন, তথা আনন্দের জন্মান্তর। পুণ্য-তীর্থ সাধনার ধন বোধিসত্ত্বকে রক্ষার জন্য নাগভবন থেকে তিনি ছুটে এসেছেন আকুল অন্তরে। বৃহত্তম ফণা বিস্তার করে সেই প্রপাতেই করছেন প্রতীক্ষা। কেবল এ জন্মে নয়, অনন্ত জন্মে অগণিত বার মহাসত্ত্বের প্রাণরক্ষা, নিরাময়তা ও শান্তি-সুখ বিধান করে আপন জীবনকেও তিনি তুচ্ছ মনে করেছেন।

ক্রোধান্ধ-রাজা ভৃত্যদের প্রতি সন্দেহ পরবশ হয়ে স্বয়ং এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর নির্মম কঠোর আদেশে সেক্ষণেই কুমারকে ঊর্ধ্বপাদ-অধঃশির করে সেই ভয়ঙ্কর প্রপাতে নিক্ষেপ করা হলো। সে মুহূর্তেই দেবতা তাঁকে বক্ষে ধারণ করলেন। দেবতার দিব্য-স্পর্শে রাজপুত্রের সর্বাঙ্গ হলো তেজোময়; দিব্য সুখ ও শান্তি করলেন তিনি উপভোগ। অতঃপর দেবতা তাঁকে নিয়ে গিয়ে দিব্যাসনসম নাগরাজের শোভন-ফণায় সুরক্ষা করলেন। এই দেবতাই অন্তিম জন্মে হবেন মহামান্য অগ্রশ্রাবক শারীপুত্র।

চার

বোধিসত্ত্বকে পেয়ে অতিশয় আনন্দিত হলেন নাগরাজ। মহতের সঙ্গে মহতের, কল্যাণের সঙ্গে কল্যাণের, আরাধ্যের সঙ্গে আরাধকের হল শুভ মিলন। এ মিলন অতি পবিত্র, অতি মধুর। দেবোপম মানববেশ ধারণ করলেন নাগরাজ। পরমাহ্লাদে তাঁর উপাস্যকে বক্ষে নিয়ে ক্ষণ-কালের মধ্যেই নাগভবনে উপনীত হলেন।

পদ্মকুমার চমৎকৃত হলেন দেবৈশ্বর্যসম অনুপম বিভূতি মণ্ডিত সুরম্য নাগভবন দর্শনে। তিনি বুঝতে পারেন নি যে, এটা নাগভবন। সুদুর্লভ রত্ন-সমলঙ্কৃত বৈদুর্য-মণিময় বিচিত্র-প্রাসাদ; মনোরমা দেববালা সদৃশী নাগ-বালাদের প্রীতি-দায়িনী আরাধনা; দিব্য-বাদ্যের ললিত-মধুর সুতান লহরীর সমতালে নৃত্য-গীতে মুখরিত সমুজ্জ্বল হর্ম্য-তলে মণিরত্নে বিমণ্ডিত সুদৃশ্য পালঙ্কে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে সমাসীন আছেন কুমার। চিন্তা করছেন—"কি হতে কি হলো, এ কোথা এলাম, এখানকার সব কিছুই যে অতি আশ্চর্যজনক, জীবনে তো কখনও দেখিনি এমন অপরূপ দৃশ্য! কে ইনি মহাপুণ্যবান মহাজন? কেন আমার প্রতি এতো সদয়ভাব?"

এমন সময় সেখানে এলেন দিব্যকান্তিধর নাগরাজ। তিনি স্মিতহাস্যে জিজ্ঞাসা করলেন---"কেমন আছেন রাজকুমার? আপনার সেবা-যত্নের কোনোও ত্রুটি হচ্ছে না তো?"

কুমার উৎসুক অন্তরে বললেন---"আমি পরম সুখেই আছি। আপনি কে? এ আশ্চর্য মনোহর দেশের নাম কি?"

"এটা নাগরাজ্য, আমি নাগরাজ, এদেশের অধিপতি। আমার ঐশ্বর্যের অর্ধাংশ আপনাকে দান করলাম। সারাজীবন এখানেই আপনি সুখে ও নিরাপদে অবস্থান করুন।"

* * *

মহাসত্ত্বের প্রতি নাগরাজের অত্যধিক আদর-মমতা। তাঁর সেবা-যত্নের যেন কোনও ত্রুটি না হয়, তৎপ্রতি রাখলেন তিনি তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি। সুনিপুণা নাগবালাগণ মমতাময় সেবা-যত্নে কুমারের অন্তরে সন্তোষ বিধান করতে লাগল। রাজকুমার নাগভবনে অতি সুখেই অবস্থান করতে লাগলেন।

পাঁচ

জন্মান্তরের অপরিহার্য ঊর্ধ্বমুখী শোভন-সংস্কার বিরাগের সঞ্চার করল মহাসত্ত্বের অনাবিল অন্তরে। নাগভবনে তাঁর এক বৎসর অতীত হয়ে গেল। কিন্তু, নাগলোকের কোনও ঐশ্বর্য তার অন্তরকে আকৃষ্ট করতে পারল না। একান্ত কাম্য হলো তাঁর সংসার ত্যাগ, প্রব্রজ্যা। তাঁর প্রাণ ধাবিত হলো, নিবিড় অরণ্যানীর নির্জন প্রান্তে, পর্বত-কন্দরে। আধ্যাত্মিক সাধনায় নিমগ্ন থাকতে আকুল হয়ে উঠল তাঁর অন্তর। একদিন নাগরাজের নিকট ব্যক্ত করলেন তাঁর প্রাণের কথা।

নাগাধিপতি পদ্মকুমারের মুখে হঠাৎ একথা শুনে বড়ো বিমর্ষ হলেন। বললেন--- "কুমার, আপনার কি স্পৃহনীয় নয়, নাগভবনের এ অনুপম ঐশ্বর্য এবং অপরূপ ললিত-যৌবনা নাগবালাদের প্রাণ-ঢালা সেবা-যত্ন?"

গম্ভীর স্বরে বললেন কুমার--- "নাগেশ্বর, ঐশ্বর্যই তৃষ্ণার মূলাধার। তৃষ্ণাই দুঃখের জননী। এ তৃষ্ণা পাপগ্রহ সম যাতনা বহুল ও বিপদ-সঙ্কুল জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু-দুঃখ প্রপীড়িত এ সংসারে একমাত্র বৈরাগ্যই চিরশান্তি

বিধায়ক। নাগেন্দ্র, আপনার দয়াই আমাকে নূতন-জীবন দান করেছে। তাই আপনার নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ। আমি হিমালয়ের নির্জন অরণ্যেই অবস্থান করতে চাই। আপনি দয়া করে আমায় সেখানেই রেখে আসুন, এটাই আমার একান্ত অনুরোধ।''

মহাসত্ত্বের অন্যত্র গমন, নাগরাজের মোটেই ইচ্ছা নয়। তাঁর সান্নিধ্যে অবস্থানের জন্য কুমারকে বার বার অনুরোধ করলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই সম্মত হলেন না। অগত্যা অনিচ্ছা সত্ত্বেও নাগরাজকে তাঁর মনোবাসনা পূর্ণ করতে হলো। নাগাধিপের সাহায্যেই কুমার হিমালয়ের নির্জন প্রদেশে গঙ্গানদীর উপকূলে উপনীত হয়ে সেখানে একখানা আশ্রম নির্মাণ করলেন। কুমার এখানে ঋষি-প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে পূর্ণ-স্বস্তি অনুভব করলেন। দুঃসহ সংসার-নিগড় থেকে মুক্ত হয়ে মুক্তির নিশ্বাস ফেললেন।

নূতন ঋষি নির্জন আশ্রমে ষড়েন্দ্রিয়-সংযমের প্রতি সম্যক্ মনোযোগী হয়ে আধ্যাত্মিক ধ্যানে মগ্ন হলেন। পুণ্যময় ঋষি অচিরেই ধ্যান-সমাপত্তি ও পঞ্চ অভিজ্ঞান লাভ করলেন। ধ্যান-সুখের আস্বাদ পেলেন তিনি অনির্বচনীয়।

নাগরাজ প্রতিদিন তাপসের জন্য দিব্য-আহার নিয়ে আসেন। সেদিন তিনি ঋষি প্রবরের জ্যোতির্ময় প্রসন্নানন দর্শনে চমৎকৃত হলেন। তিনি বুঝতে পারলেন---তাপসের তপস্যা সিদ্ধ হয়েছে। উভয়েই প্রীতি-আলাপে প্রবৃত্ত হলেন। প্রসংগক্রমে ঋষি বল্লেন---''ক্ষমা ও মৈত্রী-করুণাই চিত্তের পবিত্রতা আনয়ন করে। চিত্তের মল স্বরূপ বৈরভাবের বিরামেই জীবন হয় সুন্দর ও শান্তিময়। শত্রুর চেয়েও মানুষের সমধিক ক্ষতিকারক বিপথগামী চিত্ত। আসক্তি-বন্ধন লৌহ-বন্ধন হতেও দৃঢ়তর। এ বন্ধন দুঃসহ-দুঃখের সৃষ্টি করে। নিরাসক্ত জনই সর্ব দুঃখের অন্ত করেন। বৈরাগ্যই প্রশান্তির আশ্রয়।''

এ অমৃতোপম বাণী শ্রবণে অভিভূত হয়ে পড়লেন নাগরাজ। বিকশিত

হলো তার জ্ঞান-প্রসূন। মহাসত্ত্বের সাহচর্য লাভে তিনি কৃতার্থ হলেন এবং নিজকে মনে করলেন পরম সৌভাগ্যবান। সমুজ্জ্বল আলোকসম সৎসমাগম।

(মহাপদ্ম জাতক--৪৭২)

মিত্রামিত্র লক্ষণ

পুণ্যশ্লোক সুমন সুকর্মের প্রভাবে ভবান্তরের কোনও এক জন্মে বারাণসীর অধিপতি হয়েছিলেন। গৌতম বোধিসত্ত্ব ছিলেন তাঁর প্রধান অমাত্য, অর্থধর্মানুশাসক। তিনি ছিলেন জ্ঞানে, কর্মদক্ষতায় ও বিচক্ষণতায় অপর অমাত্যগণ হতে শ্রেষ্ঠতম। তাঁর কীর্তিকলাপ কিন্তু, অমাত্যদের অসহ্য হল। তাঁদের অন্তরে ঈর্ষানল জ্বলে উঠল।

দুর্জন কিছুতেই সহ্য করতে পারে না গুণবানের গুণের প্রশংসা। গুণীকে হিংসা করে দুর্জন। সজ্জন যে বিষয়ে তুষ্ট হন, দুর্জন তাতেই হয় কুপিত। দুর্জন সর্প হতেও ক্রুরতর। এদের বিদ্বেষ-বিষ দুঃসহ। এরা স্বচ্ছন্দে হত্যা করতে পারে সাধুজনকে। দুর্জনের মাধুর্যে, নম্রতায় ও প্রিয়ালাপে যে-ব্যক্তি মুগ্ধ হয় ও বিশ্বাস স্থাপন করে, তার পতন অনিবার্য।

দুষ্টবুদ্ধি অমাত্যগণ রাজাকে প্রধান সচিবের বিরুদ্ধে নানা কথা বলতে লাগলেন। সবই কিন্তু, মিথ্যা আর অতিরঞ্জিত। সদ্বুদ্ধি পরায়ণ রাজা তাঁদের কথা শুনে অনুসন্ধান করে তাঁর কোনও দোষ দেখতে পেলেন না। তাই নৃপতি বিরুদ্ধ-বাদীর কোনও কথা বিশ্বাস করলেন না।

একদিন রাজা ধীর-চিত্তে চিন্তা করলেন--- "প্রধান অমাত্য মহান্ ব্যক্তি, সুপণ্ডিত ও শ্রেষ্ঠ রাজনীতিজ্ঞ। তাঁর প্রজ্ঞাগুণে রাজ্যের হচ্ছে শ্রীবৃদ্ধি।

আমার পরিষদের মধ্যে ইনিই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী। এঁর বিরুদ্ধে ওরা এতো কথা বলে কেন? মনে হয়, মহতের গুণ-গরিমা ওদের সহ্য হচ্ছে না। আমার প্রতি যে, ওরা কল্যাণমিত্রের ভাব দেখাচ্ছে, তাও তাদের দুর্বুদ্ধি প্রণোদিত মিথ্যামায়া মাত্র।"

অনন্তর একদিন রাজা প্রধান অমাত্যকে জিজ্ঞাসা করলেন--- "অমাত্য প্রবর, শত্রু এবং মিত্রের লক্ষণ কিরূপ? তাদেরকে অনায়াসে জানবার উপায় কি?"

প্রত্যুত্তরে মনীষী মহাসত্ত্ব বললেন--- "মহারাজ, শত্রুর ষোড়শবিধ লক্ষণ; আমি বলছি, মনোনিবেশ সহকারে শোনুন ---

১। আপনাকে দেখে যার মুখ বিষণ্ণ হয়, মুখে হাসি থাকে না,

২। আপনার কথা শোনে যে ব্যক্তি সুখী হয় না,

৩। আপনার সঙ্গে দেখা হলেই যে ব্যক্তি চোখ ফিরিয়ে নেয়,

৪। আপনি যা বলেন, তার বিপরীত বলে যে ব্যক্তি,

৫। যে ব্যক্তি আপনার শত্রুর সঙ্গে মিত্রতা করে,

৬। যে ব্যক্তি আপনার মিত্রকে শত্রুর মতো মনে করে,

৭। আপনার সুখ্যাতি শোনলে, যে ব্যক্তি প্রতিবাদ করে,

৮। আপনার নিন্দা শোনলে, যে ব্যক্তি আনন্দিত হয়,

৯। যে ব্যক্তি নিজের গোপন কথা আপনার নিকট প্রকাশ করে না, অথচ আপনার গোপন কথা অন্যের নিকট প্রচার করে,

১০। যে ব্যক্তি কোনো দিন আপনার কোনও কার্যের প্রশংসা করে না,

১১। আপনি যে সুবিজ্ঞ, যে ব্যক্তি তা স্বীকার করে না,

১২। আপনার ক্ষতিতে যে ব্যক্তি আনন্দিত হয়,

১৩। আপনার লাভের কথা শুনে যে ব্যক্তি ঈর্ষানলে জ্বলে,

১৪। উত্তম খাদ্য লাভ ক'রে যে ব্যক্তি আপনার কথা স্মরণ করে না,

১৫। আপনি যে, সুখাদ্য থেকে বঞ্চিত হলেন, তজ্জন্য যে ব্যক্তি দুঃখিত হয় না,

১৬। আপনি যে, উত্তম খাদ্য থেকে বঞ্চিত হলেন, তজ্জন্য যে ব্যক্তি

একটুও দুঃখিত হয় না এবং একবারও চিন্তা করে না।

মহারাজ, সুধীজন এ ষোড়শবিধ লক্ষণ দেখে অমিত্রকে পরিজ্ঞাত হন। এখন শোনুন ষোড়শবিধ মিত্রের লক্ষণ, যথা---

১। আপনার বিদেশ গমনকালে, অথবা প্রবাসে অবস্থান কালীন, যে ব্যক্তি আপনার কথা সর্বদা স্মরণ করেন,

২। বিদেশ থেকে আপনার প্রত্যাবর্তনে যে ব্যক্তি আনন্দিত হন,

৩। আপনার দর্শন লাভে যে ব্যক্তি অতিশয় উৎফুল্ল হন,

৪। যে ব্যক্তি আন্তরিকতার সহিত আপনার প্রবাস-জীবন ও আগমন পথের কথা জানতে চান,

৫। আপনার মিত্রকে যে ব্যক্তি প্রীতি-চক্ষে দর্শন করেন,

৬। যে ব্যক্তি আপনার শত্রুকে বর্জন করেন,

৭। আপনার দুর্নাম শোনলে যে ব্যক্তি প্রতিবাদ করেন,

৮। আপনার সুখ্যাতির কথা শোনলে, যিনি আনন্দিত হন,

৯। যিনি অকপটে নিজের গোপন কথা আপনাকে বলেন,

১০। আপনার গোপন বিষয় যিনি অন্যের নিকট প্রকাশ করেন না,

১১। যিনি সকলের নিকট আপনার গুণ-কীর্তন করেন,

১২। আপনার প্রজ্ঞার বিষয় দর্শনে যিনি এরূপ প্রশংসা করে বলেন--- আপনার মতো প্রজ্ঞাবান্ আর কা'কেও দেখা যায় না',

১৩। আপনাকে লাভবান দেখে যিনি অপার আনন্দ অনুভব করেন,

১৪। আপনার ক্ষতিতে যিনি দুঃখানুভব করেন,

১৫। যিনি সুখাদ্য পেয়ে, আপনার কথা স্মরণ করেন,

১৬। আপনি সুখাদ্য লাভে বঞ্চিত হলেন দেখে যিনি দুঃখিত হন।

মহারাজ, জ্ঞানী ব্যক্তি এ ষোড়শ প্রকার লক্ষণ দেখে প্রকৃত মিত্র নির্বাচন করে থাকেন।''

মহামাত্যের অপূর্ব বাক্যাবলী শ্রবণে রাজা অতীব আনন্দিত হলেন। তার সর্বতোমুখী জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে নৃপতির অন্তর শ্রদ্ধায় পূর্ণ হলো। এ অসাধারণ জ্ঞানের যথোপযুক্ত সম্মানের ব্যবস্থা করলেন নরনাথ।

গুণ-গ্রাহী ভূপতি জীবনের একমাত্র অবলম্বন স্বরূপ মহাপণ্ডিত সচিব প্রবরকে কল্যাণমিত্র রূপেই বরণ করে নিলেন।

বুদ্ধসেবক আনন্দই ছিলেন তখন এই গুণগ্রাহী রাজা। ইনি মহাসত্ত্বের সান্নিধ্য লাভে কৃতার্থ হয়েছিলেন। সজ্জন সতত সর্বত্র সুখী হন।

(মিত্রামিত্র জাতক--৪৭৩)

ব্রহ্মদত্তের মহাস্বপ্ন

এক

সুমন বহু জন্ম অতীতের পর কোনও এক জন্মে হয়েছিলেন বারাণসীর রাজা ব্রহ্মদত্ত। একদা নৃপতির মহাভয় ও সংকটময় অবস্থায় তাঁকে নির্ভয় ও আশ্বস্ত করেছিলেন এক ধ্যান-লাভী অভিজ্ঞান সম্পন্ন তাপস। তিনি এক জটিল রহস্যময় নিগূঢ়-তত্ত্বের মর্মোদ্‌ঘাটন করে ব্রহ্মদত্তের ত্রাসিত, বিচলিত ও সন্তাপিত অন্তরে বর্ষণ করেছিলেন শান্তিময় পীযূষধারা।

একদা রাজা ব্রহ্মদত্ত গভীর রাত্রে ষোড়শ প্রকার অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছিলেন। বড়ো আশ্চর্য রহস্যময় স্বপ্ন। অঘটন সংঘটন, বিস্ময়কর ব্যাপার! এতে অত্যধিক ভীত হয়ে পড়লেন ভূপতি। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে অবশিষ্ট রাত্রি আর নিদ্রা হলো না তাঁর। তিনি চিন্তা করলেন--- কুলপুরোহিত ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করবেন এ স্বপ্নরহস্য।

যথাসময়ে রাজ-দর্শনে এলেন পুরোহিত ব্রাহ্মণ। রাজা তাঁকে আদ্যোপান্ত বললেন সপ্ন-বৃত্তান্ত এবং এর ফলাফলও করলেন জিজ্ঞাসা। ব্রাহ্মণ চিন্তাযুক্ত হয়ে বললেন---"মহারাজ, এ অতি জটিল-তত্ত্ব। এর সমাধান করতে হলে, শাস্ত্র-বিশারদ বহু পণ্ডিত-ব্রাহ্মণ সম্মিলিত হয়ে বিচার করতে হবে।"

রাজা উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললেন--- "তাই করুন, আজই এর ব্যবস্থা করুন।"

সেদিনই সমবেত করা হলো রাজবাড়ীতে শাস্ত্র-বিশারদ পণ্ডিতাগ্রগণ্য বহু ব্রাহ্মণ। তাঁরা নানারূপ শাস্ত্র-বচন আওড়াতে লাগলেন এবং অ াক কষ্‌তে লাগলেন।

নিষ্কামী দিব্য-জ্ঞানীর যা বিষয়-বস্তু, ভোগ-বিলাসী সাধারণ ব্রাহ্মণগণ তা কি বুঝবেন! তবুও, যে কোনো একটা কিছু বলতেই হবে, না বললে বিপদ অনিবার্য। পরিশেষে ব্রাহ্মণগণ একমত হয়ে এক বাক্যেই প্রকাশ করলেন---"মহারাজ, বড়ো অশুভ--স্বপ্ন; অতি ভয়াবহ অনর্থকর দুঃস্বপ্ন। হয় রাজ্যনাশ, অর্থনাশ, আর নয় প্রাণ-নাশ। এ ত্রিবিধ অনর্থের মধ্যে নিশ্চয়ই যে কোনও একটা সংঘটিত হবে।"

ব্রাহ্মণদের কথা শুনে রাজা অধিকতর ভীত হয়ে পড়লেন। তাঁর প্রাণ কেঁপে উঠল। জিজ্ঞাসা করলেন---"এ বিঘ্ন নাশের উপায় কি?"

ব্রাহ্মণগণ বিজ্ঞের ভান দেখিয়ে বললেন--- "উপায় আছে মহারাজ, বহু ব্যয়-সাপেক্ষ। মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করতে হবে। এতে প্রয়োজন হবে— পশু, পক্ষী, স্বর্ণ, রৌপ্য, ঘৃত ও তণ্ডুলাদি বহুবিধ উপকরণ।"

রাজার প্রাণের চেয়ে কি ওসব বেশী? নৃপতির আদেশে সত্বর সংগ্রহ হলো যজ্ঞের সমস্ত উপকরণ। বিরাট ব্যাপার! মহা হুলুস্থূল পড়ে গেল রাজবাড়ীতে। শত শত পশু-পক্ষীর ত্রাস-রবে নিনাদিত হল রাজ-প্রাঙ্গণ।

দুই

ব্রাহ্মণদের মধ্যে ছিলেন এক তরুণ-বয়স্ক ব্রাহ্মণ-সন্তান। ইনি এখনও শিক্ষার্থী; খুব মেধাবী ও প্রজ্ঞাবান। তিনি আচার্যকে জিজ্ঞাসা করলেন--- "গুরুদেব, আপনি আমাকে বেদত্রয় শিক্ষা দিয়েছেন। অথচ, একের প্রাণ সংহারে অপরের যে, মঙ্গল হয়, একথা তো কোনো দিন শেখান নি; আমিও তো তা শাস্ত্রে দেখি নি! তবে একি করছেন আপনারা?"

আচার্য রুক্ষস্বরে বললেন--- "বাছা, এসব কথা বলো কেন? তোমার সে কথা এখন রেখে দাও। আমাদের ধনেরই প্রয়োজন। এ উপায়েই তো ধন লাভ হবে। তুমি তো রাজার ধন-রক্ষায় বড়ো ব্যস্ত হয়ে পড়েছো দেখছি!"

আচার্যের দুর্নীতি মূলক উক্তি শ্রবণে শিষ্য যৎপরোনাস্তি দুঃখিত ও মর্মাহত হলেন। শিষ্য ক্ষুব্ধস্বরে বললেন---"তা হলে, আপনাদের অভিরুচি অনুরূপই কাজ করুন; আমি কিন্তু, এতে সংশ্লিষ্ট থাকবো না।"

তখনই ব্রাহ্মণ-যুবক সে স্থান ত্যাগ করে চলে গেলেন। যাবার সময় রাজোদ্যানে প্রবেশ করলেন। উদ্দেশ্য, উদ্যানের দৃশ্যাবলী দর্শন করে মনোদুঃখ বিদূরিত হয়ে যদি একটু শান্তি পান। কিছুদূর অগ্রসর হয়ে দেখলেন, ছায়াচ্ছন্ন বৃক্ষমূলে যোগাসনে উপবিষ্ট আছেন এক জ্যোতির্ময় তাপস। তাঁর নেত্র ধ্যান-নিমীলিত, জটা বিলম্বিত ও প্রসন্ন বদন। তাকে দেখে চমৎকৃত হলেন ব্রাহ্মণ-যুবক। বিমুগ্ধ ও সশ্রদ্ধ অন্তরে বন্দনা করলেন তিনি তাপসের পুণ্যরেখা শোভিত পদারবিন্দ। উভয়ের পরিচয় হলো সংক্ষিপ্ত সন্তোষজনক আলাপের মাধ্যমে। জিজ্ঞাসা করলেন তাপস স্নিগ্ধ কণ্ঠে---"সৌম্য, তোমাদের রাজা যথাধর্ম রাজ্য পালন করেন তো?"

"হ্যাঁ, তপোধন, রাজা পরম ধার্মিক। কিন্তু, তাঁকে বিপথে পরিচালনা করছেন ব্রাহ্মণগণ। ষোড়শবিধ স্বপ্ন দেখে রাজা বড়ো ভীত হয়ে পড়েছেন। এর ফলাফল জানবার তাঁর খুব ইচ্ছা। অজ্ঞ--লোভান্ধ ব্রাহ্মণেরা তাঁকে সমধিক আতঙ্কগ্রস্ত করেছেন। এ সুযোগে আরম্ভ করে দিয়েছেন যজ্ঞের ঘটা। দয়া করে রাজাকে আপনি রক্ষা করুন। উদ্‌ঘাটন করুন স্বপ্নের প্রকৃত মর্ম। রক্ষা করুন নিরীহ প্রাণীদের প্রাণ।"

তাপস 'তথাস্তু' বলে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন।

ব্রাহ্মণ-যুবক সোৎসাহে বললেন-- "আমি এক্ষুণি রাজাকে ডেকে নিয়ে আসছি। আমি ফিরে না আসা অবধি দয়া করে আপনি অপেক্ষা করবেন।"

ব্রাহ্মণ-যুবক দ্রুত গিয়ে রাজাকে একথা বললেন। রাজা অতিশয় আনন্দিত হয়ে তৎক্ষণাৎ সানুচর উদ্যানে উপস্থিত হলেন। তিনি তাপসকে

দেখে প্রসন্ন হলেন এবং যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করে জিজ্ঞাসা করলেন -- ''শুনলাম, আমার স্বপ্ন-রহস্য আপনি বিবৃত করতে পারবেন, একথা কি সত্য ?''

''হ্যাঁ রাজন্, আপনি কিরূপ স্বপ্ন দেখেছেন, ক্রমশঃ এক একটা ব্যক্ত করুন।''

রাজা স্বপ্ন-বৃত্তান্ত বর্ণনা করতে আরম্ভ করলেন---

প্রথম স্বপ্ন---''আমি দেখলাম তপোধন, চারদিক থেকে চারটা কালো বর্ণের বৃষ সাড়ম্বরে যুদ্ধ করতে এসে রাজপ্রাঙ্গণে সমবেত হলো। বৃষ-যুদ্ধ দেখতে তথায় বহু লোক উপস্থিত হলো। বৃষ চতুষ্টয় তুমুল নিনাদ করে সংগ্রামের ভান করল মাত্র, কিন্তু সংগ্রাম না করেই পলায়ন করল। বলুন, এ স্বপ্নের তাৎপর্য কি ?''

তাপস মৃদু হাস্যে বললেন--- ''শুনুন রাজন্, আপনার জীবদ্দশায় ফলবে না এ স্বপ্নের ফল। এতে আপনার ভয়ের কোনও কারণ নেই। এর ফল দেবে সুদূর ভবিষ্যতে। তখন রাজা হবেন কৃপণ, অধার্মিক; মানুষেরা হবে পাপাচারী। পাপে কলুষিত হবে পৃথিবী। দেবতা রুষ্ট হবেন, তাই বৃষ্টি-বর্ষণ হবে না। সুতরাং উৎপন্ন হবে না ফসল, দুর্ভিক্ষের উঠবে হাহাকার। কোনো কোনো সময়ে চারদিক থেকে কালো-মেঘ উঠে আকাশ ছেয়ে ফেলবে। মেঘ-গর্জন ও বিদ্যুৎ বিকাশের ঘনঘটা হবে। সকলে তখন মনে করবে ---বৃষ্টি বর্ষণ হয়ে পৃথিবী ভাসিয়ে দেবে। মেয়েরা তাড়াতাড়ি রৌদ্রে দেওয়া কাপড়-শস্যাদি ঘরে ঢোকাবে। পুরুষেরা কোদালি হস্তে বের হবে জমিনের আলি বাঁধবার উদ্দেশ্যে। আপনার স্বপ্ন-দৃষ্ট বৃষ চতুষ্টয় সংগ্রাম না করে প্রস্থান করার মতো বর্ষণোন্মুখ মহামেঘও বর্ষণ না করে অন্তর্হিত হবে। এটি সুদূর ভবিষ্যৎ-অবস্থার ইঙ্গিত মাত্র। এতে আপনার ভয়ের কোনও কারণ নেই। লোভাতুর ব্রাহ্মণগণ লাভের প্রত্যাশায় এরূপ ভীতিপ্রদ কথার অবতারণা করেছে মাত্র। এবার বলুন আপনার দ্বিতীয় স্বপ্নের বৃত্তান্ত।''

দ্বিতীয় স্বপ্ন---"দেখলাম, মৃত্তিকা ভেদ করে উঠল অগণিত ছোট ছোট গাছ। কোনোটি বিতস্তি প্রমাণ, আর কোনোটি এক হস্ত প্রমাণ হয়েই ফল-পুষ্পে সুশোভিত হলো। এ স্বপ্নের মর্মার্থ কি?"

"রাজন্, সুদূর ভবিষ্যতে পৃথিবী হবে পাপে ভারাক্রান্ত। মানবগণ হবে পাপ-সন্তাপে অল্পায়ু। এ স্বপ্নের ফল ফলবে তখনি। মানুষের বেড়ে যাবে ষড় রিপুর তীব্রতা; কামরাগের প্রভাব হবে প্রবলতর। কন্যাগণ অল্প বয়সে ঋতুবতী হয়ে পুরুষের সংসর্গে এসে অল্প বয়সেই বহু সন্তান প্রসব করবে। স্বপ্নে দৃষ্ট পুষ্পিত ছোট গাছ---অল্প বয়স্কা কন্যাগণ পুষ্পবতী হবার পূর্বাভাস। গাছের ফলিত অবস্থা হলো---অল্প বয়স্কাদের সন্তান প্রসব করার পূর্ব ইঙ্গিত। এবার তৃতীয় স্বপ্নের কথা বলুন।"

তৃতীয় স্বপ্ন---"দেখলাম, সদ্যোজাত গোবৎস থেকে গাভীগুলি স্তন্যপান করছে! এ কেমন ব্যাপার?"

"নৃপবর, সুদীর্ঘদিন পরে মানব-সমাজে দেখা দেবে বয়োজ্যেষ্ঠের প্রতি অসম্মান। মাতা-পিতা ও শ্বশুর-শাশুড়ী প্রভৃতি গুরুজনের প্রতি অগৌরব ও অবহেলা। নিজেরাই করবে ঘর-সংসারের কর্তৃত্ব। বৃদ্ধদের অন্ন-বস্ত্রের ব্যবস্থা হবে ছেলেদের ইচ্ছাধীন। বাছুর থেকে স্তন্যপায়িনী গাভীতুল্য সর্বতোভাবে আপন পুত্র ও পুত্রবধূর অনুগ্রহভাজন হয়েই জীবন ধারণ করতে হবে। বলুন, এখন চতুর্থ স্বপ্নের বিবরণ।"

চতুর্থ স্বপ্ন---"দেখলাম, ভার বহনে সমর্থ ও বলিষ্ঠ গরুগুলিকে গাড়োয়ান শকট থেকে অপনীত করে বিতাড়িত করল, তৎস্থলে তরুণ অসমর্থ গোবৎস করল যুগবদ্ধ। ফলে গোবৎসগুলি ভার বহনে অসমর্থ হয়ে এক পদও অগ্রসর হতে পারল না। এর তাৎপর্য কি?"

"মহারাজ, সুদূর ভবিষ্যতে রাজাগণ হবেন অধার্মিক ও অবিবেচক। তাঁরা প্রবীণ ও নিপুণ কর্মচারীদের মর্যাদা রক্ষা করবেন না। তাদের কর্ম-চ্যুত করে, তৎস্থলে নিয়োগ করবেন তরুণ অনভিজ্ঞ কর্মচারীদের। তারা কর্ম সম্পাদনে অপারগ হবে। গোবৎসের অক্ষমতার দরুণ শকট অচল হওয়ার মতো রাজ্যরূপ শকটও অচল হয়ে পড়বে। এখন পঞ্চম

স্বপ্ন কিরূপ বলুন।''

পঞ্চম স্বপ্ন---''দেখলাম, একটা অশ্বের দু'দিকে মুখ। লোকেরা দু'মুখেই আহার দিচ্ছে। অশ্বটি দু'মুখেই খাচ্ছে। এর মর্মার্থ কি?''

''রাজন্, বহু যুগ-যুগান্তর পরে পাপমতি-অজ্ঞানী রাজাগণ লোভী ও নীচাশয় লোকদের বিচারকের পদে নিযুক্ত করবেন। তারা বাদী-বিবাদী উভয় পক্ষ থেকেই উৎকোচ নেবে। এবার বলুন ষষ্ঠ স্বপ্নের কথা।''

ষষ্ঠ স্বপ্ন---''দেখলাম, মহার্ঘ স্বর্ণপাত্রে প্রস্রাব করার জন্য লোকেরা অনুরোধ করছে এক বৃদ্ধ শৃগালকে। এর অর্থ কি?''

''মহারাজ, দীর্ঘকাল পরে অধার্মিক রাজাগণ কুলীন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের অবিশ্বাস ও অমর্যাদা করবেন। এ কারণে তাঁরা নির্ধন হবেন। হীন ব্যক্তিরা হবে ধনশালী। কুলীনগণ জীবিকা নির্বাহার্থে অকুলীনের আশ্রয় নেবেন এবং তাদের হাতে কন্যাদান করবেন। স্বর্ণপাত্রে শৃগালের প্রস্রাব করা যেরূপ, কুলীনের কন্যার সহিত অকুলীনের সহবাসও তদ্রূপ। বলুন এবার সপ্তম স্বপ্নের কথা।''

সপ্তম স্বপ্ন---''দেখলাম, এক ব্যক্তি চৌকিতে বসে দীর্ঘ-রজ্জু প্রস্তুত করছে। চৌকির নীচে বসে রয়েছে এক ক্ষুধাতুর শৃগালী। নিষ্পন্ন রজ্জু যা নিম্নে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে, শৃগালী অমনি তা গলাধকরণ করছে লোকটির অজ্ঞাতে। এর তাৎপর্য কি?''

''নৃপবর, সুদূর ভবিষ্যতে নারীগণ হবে পরপুরুষ লোলুপ, অলঙ্কার লোলুপ, সুরা লোলুপ, ভ্রমণ লোলুপ ও প্রমোদ পরায়ণা। পুরুষেরা অতিকষ্টে যে ধনোপার্জন করবে, দুশ্চরিত্রা রমণীরা তা বিনষ্ট করবে। খাদ্য, ভোজ্য, পানীয় ও বিলাস-দ্রব্যে উপপতির সন্তোষ বিধান করবে। অভাব-অনটনের দিকে দৃক্‌পাত করবে না তারা। সতত উৎকণ্ঠিত হয়ে থাকবে উপপতির প্রতীক্ষায়। পুনঃ পুনঃ সতৃষ্ণ-নেত্রে নিরীক্ষণ করবে পথপানে; আকুল অন্তরে দেখবে ঘরের অথবা প্রাচীরের ছিদ্রপথে। যে বীজ আগামী কল্য বপন করা হবে, উহা পর্যন্ত রন্ধন করে স্বামীকে খেতে দেবে।

অজ্ঞাতে শৃগালীর রজ্জু-ভক্ষণ স্বরূপ অসচ্চরিত্রা স্ত্রীলোক স্বামীর অগোচরে সমস্তধন বিনষ্ট করবে। বলুন এখন অষ্টম স্বপ্নের বিবরণ।"

অষ্টম স্বপ্ন---"দেখলাম, রাজদ্বারে বৃহৎ একটি জলপূর্ণ কলসীর চর্তুদিকে রয়েছে বহু শূন্যকুম্ভ। জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সকলেই ঘটে ঘটে জল এনে ঢালছে সেই পূর্ণকলসে। কলসী প্লাবিত হয়ে স্রোতাকারে জল চলে যাচ্ছে, তবুও ঢালছে। শূন্যকলসীর প্রতি কিন্তু কারও দৃক্‌পাত নেই। এর মর্মার্থ কি?"

"রাজন্, পৃথিবীর ধ্বংসকাল আসন্ন হলে, নৃপতিগণ হবেন দরিদ্র ও কৃপণ। দরিদ্ররাজা প্রজাগণকে আপন কৃষিকার্যে নিয়োজিত করবেন। উৎপন্ন ফসলে কেবল পূর্ণ করবে রাজ-ভাণ্ডার, পূর্ণ-কলসে জল ঢালার মতো। শূন্যকুম্ভসম প্রজাদের হবে শূন্য-ভাণ্ডার। তৎপ্রতি দৃক্‌পাত করারও তাদের অবসর মিলবে না। এবার বলুন নবম স্বপ্নের কথা।"

নবম স্বপ্ন -"দেখলাম, পঞ্চবিধ পদ্ম-শোভিত এক গভীর সরোবর। এর চার ধারেই স্নান-ঘাট। দ্বিপদ ও চতুষ্পদ প্রাণীসমূহ জল পানের উদ্দেশ্যে চতুর্দিক থেকে এসে সরোবরে অবতরণ করছে। আশ্চর্যের বিষয়, প্রাণীদের অবতরণ স্থানের জল স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল, অথচ মধ্যভাগ পঙ্কিল, এর তাৎপর্য কি?"

"নৃপবর, সুদূর ভবিষ্যতে রাজাগণ হবেন অধার্মিক ও স্বেচ্ছাচারী। উপেক্ষা করবেন রাজনীতি। উৎকোচ ও অবিচারে প্রজাগণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠবে। রাজার দয়া, ক্ষান্তি ও প্রীতি হতে বঞ্চিত হবে প্রজাগণ। নির্মম ভাবে নিষ্পীড়ন করে প্রজাদের থেকে কর আদায় করবেন। প্রজাগণ করদানে অসমর্থ হয়ে, রাজভয়ে গ্রাম-নগর ছেড়ে প্রত্যন্ত প্রদেশের আশ্রয় নেবে। সরোবরের মধ্যস্থল পঙ্কিল স্বরূপ রাজ্যের মধ্যপ্রদেশ হবে জন-শূন্য। তট-সন্নিধানে স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল জল---প্রত্যন্ত-প্রদেশ জনাকীর্ণ ও সমৃদ্ধ হবার পূর্বাভাস। এ সপ্নের এরূপই মর্মার্থ। দশম স্বপ্ন কিরূপ বলুন।"

দশম স্বপ্ন---"দেখলাম, একটা পাত্রে চাউল পক্ব হচ্ছে। কিন্তু,

চাউলগুলি তিন প্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হলো, কতেক সুপক্ব হলো, কতেক গলে গেলো, আর কিছু রয়ে গেলো তণ্ডুল; এর মর্মার্থ কি?"

"মহারাজ, দীর্ঘকাল পরে রাজা-প্রজা সবাই হবে পাপাচারী; দেবতাগণও হবেন মিথ্যাদৃষ্টি পরায়ণ। দেবগণ বারিবর্ষণে ব্যাঘাত জন্মাবেন। কোথাও বৃষ্টি হবে, কোথাও হবে না, আর কোথাও অতি বৃষ্টিতে শস্য নষ্ট হবে। স্বপ্নদৃষ্ট চাউল সুপক্বের মর্মার্থ হলো---সুবৃষ্টির স্থান হবে সুফলা; চাউল অপক্ব থাকা---অনাবৃষ্টি হেতু ফসলহীন হওয়া; আর চাউল গলে যাওয়া---অতি বৃষ্টি হেতু শস্য নষ্ট, এমন কি, শস্যের গাছ পর্যন্ত পঁচে নষ্ট হয়ে যাওয়ার এটি পূর্বাভাস মাত্র। এবার বলুন একাদশ স্বপ্ন-বৃত্তান্ত।"

একাদশ স্বপ্ন---"দেখলাম, পঁচা ঘোলের বিনিময়ে প্রদত্ত হচ্ছে মূল্যবান চন্দন। এর তাৎপর্য কি?"

"রাজন্, উত্তরকালে শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ লোভী ও নির্লজ্জ হবেন। লোভ-বশে বর্জন করবেন বৈরাগ্য, সদ্ধর্ম। অর্থ প্রাপ্তির আশায় বাজারে বা রাজদ্বারে বসে অকুণ্ঠ-কণ্ঠে শোনাবেন ধর্মবাণী। অমূল্য ধর্মের গৌরব রক্ষা করবেন না। পঁচা ঘোলের বিনিময়ে মহার্ঘ চন্দন প্রদান যেমন, অর্থ-লালসায় অমূল্য-ধর্ম দেশনাও তেমন। দ্বাদশ স্বপ্নের বিবরণ কিরূপ বলুন।

দ্বাদশ স্বপ্ন---"দেখলাম, জলে অতর্কিতে ডুবে গেলো একটা শূন্য-গর্ভ অলাবুপাত্র। এর মর্মার্থ কি?"

"নৃপবর, সুদূর ভবিষ্যতে দেখা দেবে এর কুফল। তখন রাজা হবেন অধার্মিক, সদ্বংশীয় ব্যক্তিগণ হবেন দরিদ্র ও অবজ্ঞার পাত্র। নীচবংশজ ব্যক্তিদের বাড়বে সম্মান, তারাই করবে প্রভুত্ব। রাজদরবারে ও বিচারালয়ে অকুলীনের অন্তঃসারশূন্য কথাই হবে মূল্যবান ও গ্রহণীয়। শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের মধ্যেও হবে ঠিক একইরূপ অবস্থা। বাচাল ও দুঃশীলের কথাই হবে শক্তিশালী ও গ্রহণযোগ্য। শীলবানের কল্যাণপ্রদ কথার প্রতি কেহ কর্ণপাতও করবে না। মিথ্যা ও অসার কথাই হবে সারবত্তারূপে প্রতিপন্ন' যেমন শূন্যগর্ভ অলাবুপাত্র সারবস্তুর মতো জলে ডুবে গেলো। এ স্বপ্নের

এরূপই মর্মার্থ। এখন ত্রয়োদশ স্বপ্নের বিষয় বলুন।"

ত্রয়োদশ স্বপ্ন—"দেখলাম, গৃহপ্রমাণ বহুতর শিলাখণ্ড জলে ভেসে যাচ্ছে। এর মর্মার্থ কি?"

"মহারাজ, এর ফল রয়েছে সুদূর উত্তর কালের গর্ভে। গুরুভার শিলাখণ্ড জলে ভেসে যাওয়ার মতো বৃথা ভেসে যাবে তখন কুলীনদের সারোক্তি। বিদ্রূপহাস্যে উড়িয়ে দেবে যোগ্য ব্যক্তির মূল্যবান কথা। শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের অবস্থাও হবে তাই। দুর্জনের কথার নিকট ভেসে যাবে সজ্জনের সারপূর্ণ কথা। এ স্বপ্নের এরূপই মর্মার্থ। এখন বলুন চতুর্দশ স্বপ্নের কথা।"

চতুর্দশ স্বপ্ন---"দেখলাম, বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র মণ্ডূক (ভেক) দ্রুতবেগে গিয়ে একটা প্রকাণ্ড বিষধর সর্পকে ধরে খেয়ে ফেল্‌ল, পদ্ম মৃণালের মতো। এর তাৎপর্য কি?"

"রাজন্, সুদীর্ঘকাল পরে মানুষেরা তীব্র কামরিপুর তাড়নায় যুবতী-ভার্যার বশীভূত হয়ে পড়বে। স্বামীকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করে বসবে, ক্রীত-দাসের মতো। গৃহের যাবতীয় সম্পত্তি হবে পত্নীর আয়ত্তাধীন। স্বামী যদি জানতে চায়---'এ জিনিষটা কোথায়?' তখন অর্ধাঙ্গিনী ভ্রূকুটি-বাক্যে বলে উঠবে--- 'প্রয়োজন কি তোমার সে খোঁজে? যেখানেই থাকুক না কেন, তাতে তোমার কি আসে যায়?' এরূপ বাক্যবাণে প্রিয়তমা ভার্যা স্বামীকে জর্জরিত করবে। ক্ষুদ্র মণ্ডূকের পক্ষে কৃষ্ণসর্প ভক্ষণ যেরূপ, স্ত্রীর নিকট স্বামী ক্রীতদাস বনে' যাওয়াও সেরূপ। এবার পঞ্চদশ স্বপ্ন-বিবরণ কিরূপ বলুন।"

পঞ্চদশ স্বপ্ন---"বহু সুবর্ণ-রাজহংসে পরিবৃত হয়ে এক স্বাভাবিক দোষ-দুষ্ট গ্রাম্যকাককে বিচরণ করতে দেখলাম। এর মর্মার্থ কি?"

"মহারাজ, সুদূর ভবিষ্যতে এ স্বপ্নের কুফল প্রসব করবে। তখন নরপতিগণ হবেন পাপাচারী। অতি শোচনীয় হবে তাঁদের অবস্থা। যুদ্ধ-বিদ্যায় হবেন অনভিজ্ঞ। রাজ্যচ্যুত হবার ভয়ে রাজবংশের কোনও ব্যক্তিকে

দেবেন না উচ্চ-পদ। সেই গৌরবময় পদে নিযুক্ত করবেন নীচ বংশজ ব্যক্তিকে। রাজকুলের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ তাদের সেবা করবেন এবং তাদের অনুগ্রহেই জীবিকা নির্বাহ করবেন। এর মর্মার্থ এরূপই। এবার বলুন ষোড়শ স্বপ্নের বৃত্তান্ত।"

ষোড়শ স্বপ্ন---"দেখলাম তপোধন, অদ্ভুত ব্যাপার। ছাগল বাঘকে দৌড়ে ধরে মুড় মুড় করে খেয়ে ফেল্‌ল। দূরে ছাগকে দেখে বাঘগুলি ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছে এবং সন্তর্পণে ঝোপের আশ্রয় নিচ্ছে। এর মর্মার্থ কি?"

"রাজন্, সুদীর্ঘদিন পরে অধার্মিক নৃপগণ হীন জনকে গৌরব ও প্রভুত্বের অধিকার দান করবেন। সম্ভ্রান্তজন হবেন তাদের আজ্ঞাবহ। ক্ষমতাশালী হীন বংশের লোকেরা সম্ভ্রান্তদের সমস্ত সম্পত্তি আত্মসাৎ করবে। এর প্রতিবাদ করা হলে, বেত্রাঘাতে জর্জরিত হতে হবে এবং ওরা গলা-ধাক্কা দিয়ে ঘর থেকে বের করে দেবে। 'রাজাকে বলে ছেদন করাবো হস্ত-পদ, দুর্দশার ঘটাবো চূড়ান্ত' এ বলে ভয় দেখাবে। অগত্যা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ ভীত হয়ে এরূপ বলতে বাধ্য হবেন---"হ্যাঁ প্রভু, এসব সম্পদ আপনাদেরই, আমাদের নয়।' তখন সদ্বংশজ ব্যক্তিগণ প্রাণ-ভয়ে ঘরের মধ্যে আত্মগোপন করে থাকবেন, ছাগ-ভয়ে যেমন বাঘের পলায়ন। শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের অবস্থাও ঠিক এরূপই হবে। অধার্মিকের উৎপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে উঠবেন সাধু-সজ্জন। তাই তাঁরা ভয়ে পালিয়ে যাবেন, নির্জন অরণ্যের আশ্রয় নেবেন। এ স্বপ্নের এরূপই মর্মার্থ। এতে আপনার ভয় বা আশঙ্কার কিছুই নেই।

মহারাজ, এখন চিন্তা করে দেখুন, এ ষোড়শ স্বপ্নে আপনার ভয়ের কোনও কারণ বিদ্যমান নেই; যজ্ঞের আর প্রয়োজন কি? প্রাণী হত্যায় কি কখনও কল্যাণ সাধিত হয়? যে ব্যক্তি নিজের প্রাণ রক্ষার ইচ্ছায় পরের প্রাণ সংহার করে, সে নিশ্চয়ই পাষণ্ড। প্রাণীর প্রতি যার দয়া নেই, সে মানব নয়, দানব। এ হত্যা-যজ্ঞের প্ররোচনা দিয়েছে যারা, তারা সজ্জন নয়; নিশ্চয়ই তারা লুব্ধ ও পিশাচ প্রকৃতির দুর্জন।

সূর্য সমগ্র সৌরজগৎকে আলোকিত করে; কিন্তু, অন্ধকার অখিল বিশ্বকে তমসাচ্ছন্ন করে। সজ্জন আদিত্যসম মানবের অন্তর্জগৎকে উদ্ভাসিত করেন। দুর্জন অন্ধকার স্বরূপ মনোজগৎকে অন্ধীভূত করে।

মহারাজ, আপনি মৈত্রীধর্মে প্রতিষ্ঠিত হউন। এতেই আপনার কল্যাণ সাধিত হবে; হৃদয় হবে সন্তাপহীন, জীবন হবে পুণ্যময়, নিরাময়। যজ্ঞার্থে সংগৃহীত বন্দী প্রাণীদের মুক্তি প্রদান করুন। সুখী হোক প্রাণীকুল।"

তাপস রাজাকে এরূপে বহুবিধ উপদেশ দিলেন। শীল-বিশুদ্ধি, চিত্ত-বিশুদ্ধি ও সুগতি-দুর্গতির করলেন বিশ্লেষণ। মহাসত্ত্বের অমৃতময় বাণী শুনে নরেন্দ্র অত্যধিক আনন্দিত হলেন। তাঁর ত্রাসভাব বিদূরিত হলো। সকৃতজ্ঞ অন্তরে তিনি তাপস-চরণে হলেন প্রণত। তপস্বী তাঁকে আশীর্বাদ করে ধ্যানবলে উঠলেন আকাশে। আবার মেঘমন্দ্র স্বরে শোনালেন রাজাকে সতর্কবাণী--- "রাজন্, পাপমতির পাপকথায় আর কখনও বিশ্বাস স্থাপন করবেন না।" এ বলে নৃপতির নিকট বিদায় নিয়ে তিনি বায়ু-সাগরে ভেসে চললেন হিমালয়-অভিমুখে। বিস্ময়াবিষ্ট হলেন নরনাথ। তাপসের এ বিচ্ছেদে তাঁর হৃদয় বেদনা-ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল।

এ তাপসই গৌতম বোধিসত্ত্ব। ইনি বিশুদ্ধাত্মা, ধ্যানলাভী ও পঞ্চ অভিজ্ঞান * সম্পন্ন। হিমালয়ের নির্জন গিরি-গুহায় নিয়ত তিনি ধ্যান-সুখেই বিহরণ করতেন। সেদিন ধ্যানযোগে তিনি অবগত হয়েছিলেন--- 'রাজার অবস্থা ও যজ্ঞের আয়োজন বৃত্তান্ত।' যজ্ঞোপলক্ষে বন্ধনদশা প্রাপ্ত প্রাণীসমূহের প্রতি করুণার উদ্রেক হয়েছিল তাঁর করুণাময় অন্তরে। ইহাও জ্ঞাত হয়েছিলেন তিনি--- 'যে কারণে রাজা ত্রাসিত হয়েছেন, সে রহস্যের মর্মোদ্‌ঘাটন করতে হবে তাঁকেই।'

দিব্য-দৃষ্টির প্রভাবে তিনি আরো জ্ঞাত হয়েছিলেন---"অতীত জন্মে এই ব্রহ্মদত্তের ● সঙ্গে তাঁর বহুবার মিলন ঘটেছিল। অনাগতেও সংযোগ ঘটবে বহুবার, যা পরস্পরের মধ্যে মমতায়, হৃদ্যতায় ও ঐকান্তিকতায়

* দিব্যঋদ্ধি, দিব্য কর্ণ, পরচিত্তজ্ঞ, জাতিস্মর জ্ঞান ও দিব্যচক্ষু।
● আনন্দ ছিলেন তখন রাজা ব্রহ্মদত্ত।

করবে অনুপমতার রেখাপাত। উভয়ের সংমিশ্রিত প্রবল কর্মশক্তি—রচনা করবে অচ্ছেদ্য যোগসূত্র।' এ বৃত্তান্ত বিদিত হয়ে মহাসত্ত্ব চিন্তা করেছিলেন— "আমায় এখন ব্রহ্মদত্তকে রক্ষা করতে হবে, বিদূরিত করতে হবে তাঁর অশান্তি ও আতঙ্কভাব। অতঃপর তিনি ঋদ্ধি-প্রভাবে ক্ষণ-কালের মধ্যেই উপনীত হয়েছিলেন রাজোদ্যানে।

(মহাস্বপ্ন জাতক---৭৭)

বিদেহ তাপস

এক

সুদূর অতীতের কথা। সুমন অপর এক জন্মে বিদেহপতির জ্যেষ্ঠ পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর নাম ছিল---'বিদেহ'। রাজার মৃত্যুর পর পিতৃ সিংহাসনের অধিকারী হলেন যুবরাজ বিদেহ। রাজপদে অভিষিক্ত হয়ে উত্তমরূপে প্রতিপালন করতে লাগলেন রাজধর্ম।

সে সময়ে গান্ধার-রাজের পুত্ররূপে জন্ম নিয়েছিলেন গৌতম বোধিসত্ত্ব। তিনিও পিতার মৃত্যুর পর পিতৃ সিংহাসন অলঙ্কৃত করলেন এবং রাজধর্ম অক্ষুণ্ন রেখে প্রজা পালনে রত হলেন। গান্ধাররাজ এবং বিদেহপতি উভয়ের মধ্যে কোনো দিন পরস্পরের দেখা-সাক্ষাৎ হয় নি। অথচ উভয়ের অন্তরে পরস্পরের প্রতি স্বতঃই সঞ্জাত হলো মধুর প্রীতিভাব, অন্তরঙ্গতা ও সহৃদয়তা। একে অন্যের নিকট মহার্ঘবস্তু উপায়ন পাঠিয়ে প্রীতিভাবের বিনিময় করতে লাগলেন। এর মূলকারণ কি?

মলয়-পর্বত দূরস্থিত হয়েও মৃদু-মধুর বায়ুদানে তাপিত-প্রাণ যেমন শীতল করে, সেরূপ সজ্জনগণও পূর্বসংস্কারের প্রেরণায় দূরস্থিত অদৃষ্টপূর্ব

ও অপরিচিত সজ্জনের অন্তরে সঞ্চার করেন প্রীতিভাব, হরণ করেন সন্তাপ। হৃদয়ের আকর্ষণ চুম্বকের আকর্ষণ হতেও শক্তিশালী। অদর্শনেও সঞ্জাত হয়—যে আকর্ষণ, তা অতীত জন্মে পরস্পরের মধ্যে যে, প্রগাঢ় মমতার একটা সুকঠিন শৃঙ্খল রচিত হয়েছিল, তারই সমুজ্জ্বল নিদর্শন। তা লৌহ-শৃঙ্খল হতেও দৃঢ়তর। ভ্রমর যেমন ফুলের মধুর-গন্ধে আকুল হয়ে ছুটাছুটি করে, তেমনি ভবান্তরের প্রেম-ভালবাসার মোহন রেখা-লাঞ্ছিত জনগণও একে অন্যের চিত্ত-কোকনদের সুরভিগন্ধে আকুল ও বিহ্বল হয়ে পড়ে।

এক পূর্ণিমা রজনী। মহাসত্ত্ব গান্ধাররাজ অষ্টাঙ্গ উপোসথশীলে অধিষ্ঠিত হয়ে দ্বিতল প্রাসাদোপরি বসে অমাত্যগণকে পরিবেষণ করছেন নীতিমূলক উপদেশ। এমন সময় চন্দ্র হলো রাহুগ্রস্ত। স্নিগ্ধোজ্জ্বল চন্দ্রিকা হলো মন্দীভূত। রাহু-কবলিত শশাঙ্কের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে মহাসত্ত্ব ধীর-চিত্তে চিন্তা করলেন—"এ যে দেখছি, চাঁদ রাহুগ্রস্ত হয়ে নিষ্প্রভ হয়েছে। রাজ্য, ঐশ্বর্য ও স্ত্রী-পুত্রাদি সমস্ত বিষয়াশয় রাহু স্বরূপ নয় কি? বিষয়াসক্ত ব্যক্তিকেই নিষ্প্রভ হতে হয়, রাহুগ্রস্ত চাঁদের মতো। যা'তে আমাকে হীনপ্রভ হতে না হয়, সেই উপায়ই অবলম্বন করতে হবে।

তৃষ্ণাই দুঃখের জনয়িত্রী। একমাত্র বিরাগই দুঃখ-নিবৃত্তির উপায়, এরই আশ্রয় নিতে হবে, শুধু অপরকে উপদেশ দিয়ে কি হবে? প্রথমে আত্মজয়ে নিজকে করতে হবে প্রমুক্ত, তারপর অন্যের কথা। আমি অনাসক্ত হয়ে তীব্র-বৈরাগ্যের আশ্রয় নেবো।"

ত্যাগ-মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হলো গান্ধাররাজের অন্তর। কারাবাসের দৃঢ়-বন্ধনসম মনে হলো তাঁর রাজত্ব ও প্রভুত্ব; এমন কি, রাজ-পরিচ্ছদও। সুতরাং পরদিবসই তিনি সব কিছুই ত্যাগ করে হিমালয়ের নির্জন অরণ্যের আশ্রয় নিলেন। ত্যাগই শান্তি। মহান্ ত্যাগের মাধ্যমে উপভোগ করলেন পরা-শান্তি। এখন নিজকে মনে করলেন নিগড়মুক্ত পরম স্বাধীন। আনন্দিত মনে বরণ করে নিলেন তিনি ঋষি-প্রব্রজ্যা। উপভোগ করলেন প্রব্রজ্যার অনাবিল সুখ। একাগ্রতায় মগ্ন হলেন ধ্যানে। অচিরে সিদ্ধ হলে

ধ্যান ও পঞ্চ অভিজ্ঞান। তদবধি তিনি নির্জন গিরি-গুহায় ধ্যান-সুখে অবস্থান করতে লাগলেন।

দুই

আসক্ত মানব-মন যা চায়, অনুরাগীর যা একান্ত কাম্য, যা পরম সুখময় ও রসময় বলে বিবেচিত হয়, বিদেহপতি তথাবিধ সর্বসুখের অধিকারী হয়েও, তাঁর অন্তরের নিভৃত স্থানে উঁকি-ঝুঁকি মারতে লাগল বিরাগের বিদ্যুৎ-শিখা। একদিন শুনতে পেলেন তিনি--- 'তাঁর পরম সুহৃদ গান্ধার-রাজ সর্বস্ব ত্যাগ করে প্রব্রজ্যার আশ্রয় নিয়েছেন।' এ সংবাদ তাঁর কর্ণে যেন সুধা বর্ষণ করল। তাঁর হৃদয়-গুহায় নিলীন দীপ্ত-বৈরাগ্য বিকাশ প্রাপ্ত হলো তীব্রতর, বিদ্যুল্লিলাসিনী মেঘমালা-মুক্ত তেজোগর্ভ দিনমণির মতো।

তিনি চিন্তা করলেন---"আমি কেন আর আসক্তির মোহ-বন্ধনে আবদ্ধ থাকবো? রাজত্ব, ঐশ্বর্য ও স্ত্রী-পুত্র সমস্ত বিষয়-বস্তুই তো আধি-ব্যাধির কারণ। নিরন্তর বর্ধিত হচ্ছে তৃষ্ণা-সন্তাপ। তৃষ্ণাই দুঃখের জননী। তৃষ্ণার হ্রাস করতে হলে, প্রব্রজ্যাই প্রকৃষ্ট পন্থা। বন্ধুর পদাঙ্কানুসরণই আশু কর্তব্য।"

যথাসত্বর বিদেহপতি নৈষ্ক্রম্য-ধর্মের আশ্রয় নিলেন। হিমালয়ের নির্জন স্থানে পর্ণ-কুটীর নির্মাণ করে ঋষি-প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেন এবং নিবিষ্ট-চিত্তে সাধনায় মগ্ন হলেন। একদা ঘটনাক্রমে রাজর্ষিদ্বয়ের দেখা হয়ে গেল। কেউ কাউকে চিনতে পারলেন না। তবুও একে অন্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন। আকাশে বিদ্যুৎ বিকাশের মতো উভয়ের চিত্তপটে ফুটে উঠল অজেয় আকর্ষণের দীপ্তিময় মোহনরেখা। আলাপ হলো প্রীতিপ্রদ। তদবধি প্রতিদিনই গান্ধার তাপসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান বিদেহ-তাপস। নীতিমূলক আলোচনার মাধ্যমে উভয়েই উপভোগ করেন বিমল আনন্দ।

তিন

সেদিন ছিল পূর্ণিমাতিথি। সবেমাত্র সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে। রাজর্ষিদ্বয় বৃক্ষমূলে বসে ধর্মালাপ করছেন। চন্দ্রিকোদ্ভাসিত অরণ্যের অপূর্ব শোভায় ঋষিদ্বয়ের বিরাগ-প্রবণ অন্তরে জেগে উঠল পুলকোচ্ছ্বাস। এমন সময় রাহুগ্রস্ত হলো চন্দ্র। শশি-প্রভা হলো বিমর্ষ। শশাঙ্কের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বিদেহ তাপস মহাসত্ত্বকে জিজ্ঞাসা করলেন--- "আচার্য প্রবর, সুধাংশুকে গ্রাস করে প্রভাহীন করল কে?"

প্রত্যুত্তরে বোধিসত্ত্ব বললেন--- "একে বলা হয় রাহু। প্রভাস্বর সুধাংশুর একমাত্র রাহুই উৎপীড়ক। একদিন রাহুগ্রস্ত চন্দ্র দেখে আমার বৈরাগ্যের সঞ্চার হয়েছিল। বিষয়াশয় রাহুসম উৎপীড়ক। এতে আসক্ত হয়ে আমাকে যেন প্রভাহীন হতে না হয়, এর উপায় করতে গিয়ে, নিতে হলো বিরাগোজ্জ্বল প্রব্রজ্যার আশ্রয়।"

বিদেহ তাপস মুগ্ধ-বিস্ময়ে বললেন---"তা হলে আচার্য, আপনিই গান্ধাররাজ!"

"হ্যাঁ, আমিই ভূতপূর্ব গান্ধাররাজ।"

"আচার্য! আমি ছিলাম বিদেহের রাজা। ইতঃপূর্বে আমাদের পরস্পরের দেখা-সাক্ষাৎ না হলেও, পবিত্রোজ্জ্বল সৌহার্দ্যের সঞ্চার হয়েছিল নয় কি? আপনার কথা চিন্তা করতেই কেন জানি না, আমার অন্তর প্রীতি ও মমতায় ভরে উঠতো।"

গান্ধার তাপস স্মিতহাস্যে জিজ্ঞাসা করলেন--- "আপনি কেন প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেন?"

"যখন শোনলাম, আপনি রাজৈশ্বর্য ও বিলাস-বিভব সব কিছুই ত্যাগ করে সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করেছেন, তখন আমার অন্তরেও জেগে উঠল বৈরাগ্যের প্রবল স্পৃহা। চিন্তা করলাম---'বন্ধু আমার মহাজ্ঞানবান। নিশ্চয়ই তিনি মহৎগুণ দর্শন করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছেন। আমিও বন্ধুকে অনুসরণ করবো।"

পুণ্যময় বোধিসত্ত্ব দিব্য-দৃষ্টিতে দর্শন করলেন---'অন্তিম জন্মে তিনি যখন বুদ্ধ হবেন, এ বিদেহ-তাপস তখন বুদ্ধ-সেবক আনন্দ নামে খ্যাত হবেন। অতীতেও বহুজন্মে তাঁদের মিলন ঘটেছে, উত্তর কালেও মিলন ঘটবে বহুবার ; বন্ধন রয়েছে এর অচ্ছেদ্য যোগ-সূত্রে।'

বিদেহ-তাপস মহাসত্ত্বকে আচার্যজ্ঞানে ভক্তি করতেন ; সযত্নে করতেন তাঁর সেবা-পরিচর্যা এবং ফল, মূল ও পানীয় দানে করতেন গুরুপূজা। গান্ধার-তাপস এ বিনীত শিষ্যকে নিত্য পরিবেষণ করতেন অমূল্য উপদেশ। আচার্যের গভীর জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে বিস্ময়াবিষ্ট হতেন বিদেহ-তাপস। সজ্জনদ্বয় চিত্ত-সমতায় যেন এক বৃন্তে দু'টি ফুল।

অরণ্য-বিহারীদের কোন কোন সময়ে লবণ ও অম্ল সেবনের প্রয়োজন হয়। দীর্ঘদিন তদভাবে পাণ্ডুরোগ হবার সম্ভাবনা। সে কারণে একদা তাপসদ্বয় কোন এক গ্রামে উপনীত হয়ে অন্ন-ভিক্ষায় রত হলেন। তাঁদের সুসংযতভাব ও তেজোদীপ্ত সৌম্য-মূর্তি দর্শনে জনগণ চমৎকৃত হলো, ভক্তিরসে হৃদয় হলো আপ্লুত। তাদের একান্ত আগ্রহ হলো---তাপসদ্বয় যেন তাদের সন্নিকটেই অবস্থান করেন। শুদ্ধাচারীর সান্নিধ্য লাভে জীবন-মন পবিত্র ও সার্থক করতে চায় তারা। গ্রামবাসীর সানুনয় অনুরোধ ঋষিদ্বয় উপেক্ষা করতে পারলেন না। তাঁদের অনুমতিক্রমে গ্রামের অনতিদূরে অরণ্য-প্রদেশে লোকেরা আশ্রম নির্মাণ করে দিল। তাপসদ্বয় সেখানে অবস্থান করতে লাগলেন। জনগণ অবগত আছে যে, লবণাম্ল সেবনের উদ্দেশেই তাপসগণ লোকালয়ে এসে থাকেন। সুতরাং তাপস-দ্বয়ের ভিক্ষার সময় তারা স্বতন্ত্রভাবে লবণ দান করতে লাগল।

একদিন ভিক্ষায় অতিরিক্ত লবণ পেয়ে ভুক্তাবশিষ্ট লবণ বিদেহ-তাপস ঘাসের আঁটিতে সযত্নে রেখে দিলেন। দৈবক্রমে একদিন মোটেই লবণ পাওয়া গেল না। সেদিন বিদেহ-তাপস পূর্ব-রক্ষিত লবণ গান্ধার-তাপসকে খেতে দিলেন। তিনি সন্দিগ্ধ-চিত্তে জিজ্ঞাসা করলেন--- "লবণ কোথা থেকে এলো ? আজ ভিক্ষায় তো লবণ পাওয়া যায় নি ?"

প্রত্যুত্তরে বিদেহ-তাপস বললেন--- "পূর্বে একদিন ভিক্ষায় অধিক

পরিমাণ লবণ পাওয়া গিয়েছিল। পরে প্রয়োজন হতে পারে মনে করে উদ্বৃত্ত লবণ রেখে দিয়েছিলাম।''

বিরাগ-প্রবণ ন্যায়নিষ্ঠ মহাসত্ত্ব বিদেহ তাপসকে তিরস্কার করে বললেন--- ''ছিঃ নির্বোধ, তিন শত যোজন বিস্তৃত বিদেহরাজ্য, হীরা-মুক্তা ও মণি-মাণিক্যপূর্ণ রত্ন-ভাণ্ডার নিষ্ঠীবনবৎ ত্যাগ করে অকিঞ্চন মনোবৃত্তি নিয়ে নিষ্কাম প্রব্রজ্যার আশ্রয় নিয়েছো, এখন আবার লবণে জন্মেছে তৃষ্ণা, ছিঃ!''

স্বাধীনচেতা বিদেহ তাপস মহাসত্ত্বের ভর্ৎসনায় মর্মাহত হলেন। আভিজাত্য মনোভাব বিদ্যমান হেতু এ অনুশাসন তাঁর অসহ্য হলো। বললেন তিনি দৃপ্তকণ্ঠে --- ''আপনি না প্রব্রজ্যার সময় বলেছিলেন--- 'অন্যকে উপদেশ দিয়ে কি হবে, নিজকেই উপদেশ দেবেন?' এখন কেন আমায় ভর্ৎসনা করছেন আচার্য? আপনি এতো বড় গান্ধাররাজ্য, ঐশ্বর্য পরিপূর্ণ রত্ন-ভাণ্ডার ত্যাগ করে এবং রাজোচিত শাসন-অনুশাসন থেকে বিরত হয়ে, এখন আবার শাসনের ইচ্ছা করছেন। আচার্য, আপনার এ কেমন ব্যবহার?

সত্য-সন্ধানী দৃঢ়চেতা বোধিসত্ত্ব আচার্যোচিত দীপ্ত কণ্ঠে বললেন--- 'কায়িক, বাচনিক ও মানসিক সকল দিক দিয়েই বিশুদ্ধি বাঞ্ছনীয়। অধর্মাচরণ দেখলেই আমার অন্তরে ঘৃণার উদ্রেক হয়। যা নীতি-বিগর্হিত, তা সর্বথা বর্জনীয়। অন্যকে আমি ধর্মোপদেশই দিয়ে থাকি; কেউ যেন পাপে লিপ্ত না হয়, এ-ই আমার একান্ত ইচ্ছা।''

''আচার্য, আপনার কঠোর বাক্যে আমার অন্তরে বড়ো কষ্ট পেয়েছি। বাক্য সংগত হলেও, তা যদি হয় অপ্রিয়-সত্য, এতে যদি অপরের অন্তরে আঘাত লাগে, তবে তা বলা উচিত নয়।''

মহাসত্ত্ব যেদিন দিব্যজ্ঞানে অবগত হয়েছিলেন, বিদেহ-তাপসই ভাবী-আনন্দ, সেদিন থেকেই তাঁর শোভন অন্তরে জেগে উঠেছিল বিদেহ-তাপসের প্রতি অপরিমেয় মৈত্রী ও অনুকম্পা। তাই তাঁর বিরাগ বর্ধন মানসেই বোধিসত্ত্ব তাঁকে কঠোরভাবে শাসন করতেন। যথা, পিতৃ-হৃদয়ে স্নেহ গোপন রেখে পুত্রকে পিতা কঠোর-শাসন করে থাকেন। সুতরাং ভাবী-

আনন্দকে সম্বোধন করে বললেন তিনি--- "হে আনন্দ, সুদক্ষ কুম্ভকার যেমন মৃৎপাত্রে পুনঃ পুনঃ আঘাত করে সুদগ্ধ-পাত্র নির্বাচন করে নেয়, তেমনি হে আনন্দ, পুনঃ পুনঃ উপদিষ্ট হয়ে সম্যক্-মার্গের অনুবর্তী হয় যারা, তাদেরই গ্রহণ করতে হবে; তারাই প্রকৃত সুগত-শিষ্য। সুশিক্ষা প্রাপ্ত সজ্জনই সুবাধ্য, সদাচারী ও সুবিনীত হয়। সুবাধ্য শিষ্যগণই সুপথে পরিচালিত হয়।"

পুণ্য-সংস্কার মণ্ডিত বিদেহ-তাপস আচার্যের উপদেশে লজ্জিত, বিনীত ও সঙ্কুচিত হয়ে পড়লেন। ক্ষমা-ভিক্ষা চেয়ে মহাসত্ত্বকে তিনি বন্দনা করলেন। উভয়ের চিত্ত আবার প্রীতিময় হলো। এরপর তাপসদ্বয় হিমালয়ের পূর্বস্থানে ফিরে গেলেন। বোধিসত্ত্ব বিদেহ তাপসকে 'কসিন-ভাবনা' শিক্ষা দিলেন। তিনি অনন্য-মনে ভাবনায় রত হয়ে অচিরেই ধ্যান-সমাপত্তি ও পঞ্চ অভিজ্ঞান লাভ করলেন।

সেই অতীতের সত্যযুগে মানুষের পরমায়ু ছিল ত্রিশ হাজার বৎসর। প্রশান্তমনা তাপসদ্বয় এ সুদীর্ঘকাল ঐক্য ও সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হয়ে নির্জন গিরি-গুহায় ধ্যান-সুখেই জীবন অতিবাহিত করলেন। মৃত্যুর পর এ শুদ্ধচিত্ত ব্রহ্মচারীদ্বয় ব্রহ্মলোকেই প্রাদুর্ভূত হলেন।

(গান্ধার জাতক—৪০৬)

অপর জন্ম

সুমন কর্ম-বিবর্তনে জন্ম হতে জন্মান্তর পরিগ্রহ করে অনুক্রমে সংখ্যাতীত জন্ম অতিক্রম করার পর অন্যতম এক জন্মে তিনি কশ্যপ বুদ্ধকে সম্প্রাপ্ত হলেন। অত্যধিক পুণ্যবান যাঁরা, তাঁরাই সম্যক্ সম্বুদ্ধের সাক্ষাৎ লাভ করেন। সে জন্মে তিনি ছিলেন ধনকুবের। শোভন-সংস্কারের প্রভাবে তাঁর চিত্ত-গতি ছিল কুশলাভিমুখী।

একদা তিনি কশ্যপ বুদ্ধের শিষ্য এক বিশুদ্ধচিত্ত ভিক্ষুকে এক খানা

নূতন বস্ত্র দান করেছিলেন। ভিক্ষু দেশনা করলেন বস্ত্রদান প্রসংগে অপূর্ব দান-মাহাত্ম্য এবং শীল-ভাবনার হৃদয়গ্রাহী কথা। ধর্ম শুনে ধনপতির অন্তরে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও উৎসাহ জাগ্রত হলো। তদবধি তিনি বিবিধ পুণ্যার্জনে ব্রতী হলেন। সে সময়ে মানুষের পরমায়ু ছিল বিশ হাজার বৎসর। এই সুদীর্ঘকাল তিনি নিজকে কুশল ধর্মে নিয়োজিত রেখে মৃত্যুর পর মহাপুণ্য-ঋদ্ধি সম্পন্ন দেবপুত্ররূপে প্রাদুর্ভূত হলেন তাবতিংস দেবপুরে।

* * * *

দেবপুত্র দেবলোকের আয়ুস্কালের অবসানে দেবলোক থেকে চ্যুত হয়ে বারাণসীরাজের জ্যেষ্ঠ পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করলেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি রাজপদে অভিষিক্ত হলেন। একদিন তিনি দ্বিতল প্রাসাদে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় দেখতে পেলেন---উত্তর দিক আলোকিত করে আকাশ পথে আসছেন আটজন পচ্চেক বুদ্ধ। তাঁদের দেখা মাত্রই রাজার অন্তরে প্রগাঢ় শ্রদ্ধার সঞ্চার হলো। তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে বুদ্ধগণকে জানালেন সাদরাহ্বান। নৃপতির চিত্তভাব জ্ঞাত হয়ে তাঁরা এসে অবতরণ করলেন রাজপ্রাঙ্গণে। সেদিন রাজ-প্রাসাদেই তাঁদের আহারকৃত্য সম্পাদিত হলো। রাজা রাজখাদ্যে তাঁদেরকে পরিতৃপ্ত করলেন।

নায়ক-বুদ্ধ ধর্মদেশনা করলেন। অপূর্ব সারগর্ভ বাণী শুনে নরেন্দ্র অতি আনন্দিত হলেন। তিনি ইচ্ছা করলেন প্রতিদিন যেন এরূপ পুণ্য-ক্ষেত্রে দান দিতে পারেন এবং শুনতে পান যেন এরূপ মধুর-বাণী। বুদ্ধগণের নিকট তাঁর অন্তরের কথা নিবেদন করলেন এবং রাজোদ্যানে অবস্থানের জন্য করলেন প্রার্থনা।

বুদ্ধগণ সম্মত হলেন। রাজোদ্যানে আট খানা আবাস-কুটির প্রস্তুত হলো। নৃপতি সুদীর্ঘকাল বুদ্ধগণের পরিচর্যা করলেন। তখন মনুষ্যের পরমায়ু ছিল দশ হাজার বৎসর। এ সুদীর্ঘ দিন নরপতি দান-শীলাদি পরমার্থ ধর্মে নিজকে নিয়োজিত রেখে সার্থক করেছিলেন মানব-জীবন।

এ পুণ্যরাশি তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনকে সমুজ্জ্বল করে তুলেছিল। এ মহা-পুণ্যবান সজ্জন একদিন মানব-জীবন সংবরণ করে তুষিত স্বর্গে প্রাদুর্ভূত হয়েছিলেন। সেখানে তিনি গৌতম বোধিসত্ত্বের সাহচর্য লাভ করেছিলেন। এ জন্মই তাঁর দেবলোকে অন্তিম জন্ম।

* * * *

রাজনন্দন সুমন সম্যক্ সম্বুদ্ধের প্রধান সেবকত্ব লাভের ঐকান্তিক কামনা নিয়ে পূর্ণোদ্যমে অগ্রসর হলেও, এর চরমসীমা সম্প্রাপ্ত হতে তাঁকে পঞ্চদশ সম্বুদ্ধ-যুগ অতিক্রম করতে হয়েছিল। যথা—পদুমোত্তর, সুমেধ, সুজাত, প্রিয়দর্শী, অর্থদর্শী, ধর্মদর্শী, সিদ্ধার্থ, তিষ্য, ফুষ্য, বিপর্শী, শিখী, বিশ্বভূ, ককুসন্ধ, কোনগমন ও কশ্যপ সম্বুদ্ধ। সর্বসমেত এক লক্ষ কল্পকাল অপ্রমাণ দুঃখের মাধ্যমে ঘটেছিল তাঁর ঐকান্তিক কামনা-বাসনার অনবশেষ পর্ণতা প্রাপ্তির পরিসমাপ্তি।

(মনোরথ পূরণী--আনন্দ স্থবির বর্ণনা)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অন্তিম জন্ম

এক

এক শুভক্ষণে পুণ্য-বিভূতি মণ্ডিত এক দেবপুত্র তুষিত স্বর্গ ত্যাগ করে প্রথিতযশাঃ শাক্যকুলের রাজপরিবারে জন্ম নিয়েছিলেন। ইনিই আমাদের পূর্ব পরিচিত সেই সৌভাগ্যবান সুমন, কালক্রমে যিনি 'আনন্দ' নামে হয়েছিলেন জগৎ বরেণ্য। এ অবিস্মরণীয় জন্মই তাঁর অন্তিম জন্ম।

কীর্তিমান যশোমন্দির নিভ কপিলবাস্তু নগরে এক সময় রাজত্ব করতেন এক মহিমময় রাজা। তাঁর নাম---জয়সেন। তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম 'সিংহহনু'। মহারাজ জয়সেনের মৃত্যুর পর পিতৃ সিংহাসন অলঙ্কৃত করলেন পুণ্যবান সিংহহনু। নৃপবর সিংহহনুর প্রধানা মহিষী পুণ্যময়ী কাত্যায়নীর গর্ভে জন্ম নিলেন মহা রত্নোপম পঞ্চ পুত্র। তাঁদের নাম যথাক্রমে---শুদ্ধোদন, অমিতোদন, ধৌতোদন, শুক্লোদন ও অশুক্লোদন।

শাক্যকুল-তিলক শুদ্ধোদন---মহারাজ সিংহহনুর প্রথম পুত্র। বলা বাহুল্য, পিতার মৃত্যুর পর শুদ্ধোদনই শাক্যরাজ্যের রাজা হয়েছিলেন। তদীয় অনুজ রাজকুমার অমিতোদনই মহামান্য আনন্দের জনক।

অমিতোদনের প্রিয়তমা পত্নীর নাম---'জনপদকল্যাণী'। ইনি ছিলেন শীলবতী, করুণাময়ী, সতী-সাধ্বী ও পতিগতপ্রাণা। এই পুণ্যশ্লোকা মহিলা একদিকে যেমন বহু সদ্‌গুণে বিমণ্ডিতা, অন্যদিকেও ছিলেন অপরূপ লাবণ্যবতী ও পুণ্য-লক্ষণ সমলঙ্কৃতা। তাঁর কমনীয়-কান্তি ও লালিত্যময় সৌন্দর্যের উজ্জ্বলতায় রাজপুরী যেন আলোকময় হয়েছিল। এমন শোভন-

মোহন অনিন্দ্য-রূপশালিনী ছিলেন বলে মাতা-পিতা আদর করে তার নামকরণ করেছিলেন---'জনপদকল্যাণী'।*

গৌতম বোধিসত্ত্ব পারমিতায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়ে দেবলোকের অন্যতম অমরধাম সুখৈশ্বর্য ও সৌন্দর্যের শ্রেষ্ঠতম তুষিতপুরে অপেক্ষা করছিলেন অন্তিম জন্ম পরিগ্রহণের জন্য। তাঁর ছিলেন এক একনিষ্ঠ সহচর প্রিয়তম সুহৃদ মহাপুণ্যবান দেবপুত্র। এই মহীয়ান দেবপুত্রই---ভাবী-আনন্দ। ইনি এক শুভক্ষণে প্রথম কললরূপে * প্রতিসন্ধি গ্রহণ করলেন জনপদকল্যাণীর পুণ্য-পূত গর্ভে। মহীয়সী নারীর জঠরে আবির্ভূত হলেন মহিমময় সত্ত্ব। মহাসৌভাগ্যের উদয় হলো এই পুণ্যবতী নারীর। তাঁর সকল দিক হলো কল্যাণময়, সুখৈশ্বর্যের অভিবৃদ্ধি। তার শরীরবর্ণ হলো সমুজ্জ্বল, লালিত্য-প্রভায় হলেন তিনি অতিশয় জ্যোতির্ময়ী।

বিশ্বমাতার শ্রেষ্ঠ সন্তান ভাবী বুদ্ধ সিদ্ধার্থ এক স্মরণীয় তিথিতে লুম্বিনী উদ্যানে মাতৃগর্ভ থেকে অভিনিষ্ক্রান্ত হয়েছিলেন। *

---

* পালি সাহিত্যে এই নামের অন্ততঃ চারিজন রমণীর উল্লেখ দেখা যায়--(১) যশোধরার নামান্তর; (২) যার সহিত বুদ্ধের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নন্দের বিবাহ স্থির হয়েছিল, (৩) আনন্দের মাতা, (৪) একজন বারবনিতা (তৈলপাত্র জাতক--৯৬)। বোধ হয় 'জনপদ কল্যাণী' নাম নহে, রূপ বর্ণনাত্মক উপাধি মাত্র। (ঈশান ঘোষ অনূদিত জাতক প্রথম খণ্ডের পরিশিষ্ট)

● পঠমং কললং হুত্বা সরীরং সুখুমং ইদং,
কিমীব বচ্চ-কূপম্হি জাযতে মাতুকুচ্ছিযং।

মাতৃগর্ভে প্রথম প্রতিসন্ধি বা জন্মলাভ করে বিষ্ঠাকূপে অতি সূক্ষ্ম ক্রিমির ন্যায় সূক্ষ্ম (অদৃশ্য) 'কলল' রূপে।

● চক্খুদস্সনতিক্কন্তং তিলতেলং 'বনাবিলং,
দুগ্গন্ধাতিপটিক্কূলং সুক্কসোণিত নিস্সিতং।

এ কলল চক্ষুগোচরাতীত, অনাবিল তিলতৈল সদৃশ। পিতার শুক্র ও মাতার শোণিত সংমিশ্রণে উৎপন্নহেতু তা অতি ঘৃণিতও। দুর্গন্ধময় (কায়বিরতি)

+ আনন্দের জন্মকাল সম্পর্কে এই গ্রন্থের মুখবন্ধ দ্রষ্টব্য।

তদনন্তর অপর এক শুভক্ষণে শাক্যরাজান্তঃপুরে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন আর এক জ্যোতির্ময় শিশু। বিশ্বমাতা আর একটি পুণ্যময় সন্তান লাভ করেছিলেন আপন অঙ্কে, আনন্দ-সায়রের আনন্দ-লহরীসম আনন্দ-প্রতীক।

সদ্যোজাত শিশু দর্শনে জ্ঞাতিগণ হলেন আনন্দিত, তাই এ শিশুর নামকরণ করা হলো---'আনন্দ'। আনন্দময় 'আনন্দ'---আনন্দের পীযূষ-ধারা, বহন করে নেমে এলেন যেন অমরাপুরী থেকে মর্ত্যধামে। আনন্দ-হাস্যে আনন্দময় জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করে পরম সুখে শশিকলাসম সংবর্ধিত হতে লাগলেন এ পুণ্যময় শিশু। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর হলো অতিক্রান্ত। নয়ন-মোহন, প্রাণ-জুড়ানো অষ্টাদশ বসন্ত-পরিবেষ্টিত হয়ে অপরূপ বেশে শোভমান হলেন আনন্দ। সুগঠিত তাঁর অঙ্গ-সৌষ্ঠব, কমনীয় কান্তি, লালিত্যময় আনন, মাধুর্যপূর্ণ দৃষ্টি-ভঙ্গি, সুমধুর কণ্ঠস্বর, করুণামাখা শোভন-অন্তর, জ্যোৎস্নার মতো শান্ত-স্নিগ্ধ আচরণ; এক কথায় বলতে গেলে---মনোরম, অতি মনোরম!

শ্রাবণের দুকূল প্লাবিতা স্রোতস্বিনীর মতো তাঁর ফুল্ল-উচ্ছ্বসিত ভদ্র-যৌবন মনোহারিত্বে হয়েছে ভরপূর। দর্শনে আনন্দ, কথনে আনন্দ, শ্রবণে আনন্দ, চিন্তনে আনন্দ, তাঁর সব কিছুই আনন্দময়!

দুই

বুদ্ধাঙ্কুর সিদ্ধার্থ পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়ক্রমকালে লাভ করলেন সর্বজ্ঞতা জ্ঞান। বোধিতরু সন্নিকটে সাত সপ্তাহ অতিক্রমের পর আষাঢ়ী পূর্ণিমায় ঋষিপতন-মৃগদায়ে *পঞ্চ বর্গীয় ভিক্ষুর নিকট প্রবর্তন করলেন ধর্মচক্র। প্রচারিত হলো জগতে প্রথম একমাত্র মুক্তির বাণী। তিনি সেখানে প্রথম বর্ষাবাস উদ্‌যাপনান্তে বহির্গত হলেন দেশ-দেশান্তরে; প্রচার করলেন তাঁর স্বয়ং-দৃষ্ট সত্যধর্ম। আশ্চর্য-পুরুষ তথাগতের অমৃতোপম অদ্বিতীয় লোকোত্তর

* বর্তমান নাম---সারনাথ।

ধর্মের বিচিত্র-দেশনার প্রভাবে অচিরেই পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষু, যশঃ প্রমুখ ষাটজন এবং উরুবিল্ল ও গয়াশীর্ষের জটিল-ভ্রাতৃত্রয় প্রমুখ সহস্র জন অর্হত্ব ফল লাভ করে আত্যন্তিক দুঃখের করলেন নিবৃত্তি, সাক্ষাৎ করলেন চির-শান্তিময় নির্বাণ।

এই বিশুদ্ধ শিষ্যগণ পরিবৃত হয়ে অমিতাভ বুদ্ধ মগধের রাজধানী রাজগৃহে উপনীত হলেন। তথায় বেণুবন উদ্যানে দু'মাস অবস্থান করে মগধবাসীকে দেশনা করলেন মুক্তিপ্রদ অমোঘ-বাণী। ফলে নৃপতি বিম্বিসার প্রমুখ একাদশ অযুত নর-নারী উপলব্ধি করলেন সত্যধর্ম, সাক্ষাৎ করলেন স্রোতাপত্তি ফল।

সিদ্ধার্থ ছিলেন মহারাজ শুদ্ধোদনের প্রাণ-প্রতিম পুত্র। শুদ্ধোদনের গোপন-মনের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষার মূলোচ্ছেদ ক'রে একদা কুমার গভীর নিশীথে ছুটে গিয়েছিলেন অসীমের সন্ধানে। সেদিন থেকে কপিলবাস্তুর রাজপুরী হয়েছিল শোকাহত ও নিরানন্দময়। দীর্ঘ সাত বৎসর পরে কপিলবাস্তুর রাজপুরীতে সংবাদ এল, সংসার-ত্যাগী সিদ্ধার্থ নিজ সাধনা-বলে জ্ঞাত হয়েছেন--- দুঃখ-মুক্তির পবিত্রমার্গ। এখন তিনি তথাগত বুদ্ধরূপে জগতে পরিচিত। রাজা শুদ্ধোদন আরো জানতে পারলেন--- মগধরাজ বিম্বিসারের প্রার্থনায় বুদ্ধ এখন মগধের রাজগৃহে ধর্ম প্রচারে রত আছেন। বৃদ্ধরাজা প্রিয় পুত্রকে দর্শনেচ্ছায় আকুল হয়ে পড়লেন। যথা-শীঘ্র তিনি রাজগৃহে সংবাদ পাঠালেন---"সত্বর যেন শাক্যমুনি বৃদ্ধ-পিতাকে দর্শন দেন।"

অতঃপর সম্বুদ্ধ পিতৃদর্শন মানসে শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে কপিল নগরাভিমুখে যাত্রা করলেন। বলা বাহুল্য, রাজগৃহ থেকে কপিল নগরে উপস্থিত হতে দু'মাস সময়ের প্রয়োজন হয়েছিল।*

* তথাগত বুদ্ধত্ব লাভের দশমাস পরে ফাল্গুনী পূর্ণিমা দিবসে রাজগৃহ হতে যাত্রা করে দু'মাস পরে বৈশাখী পূর্ণিমায় কপিলপুরে উপস্থিত হয়েছিলেন। সাত বৎসর পরে পিতা-পুত্রের দর্শন লাভ ঘটেছিল।

তথাগত বুদ্ধ কপিলপুরে আগমন করছেন, এ শুভ-সংবাদ শাক্যরাজ্যে যথাসত্বর প্রচারিত হলো। সমগ্র শাক্যরাজ্য আনন্দ-হিল্লোলে আলোড়িত হয়ে উঠল। সোল্লাসে ধ্বজা-পতাকা হস্তে অভ্যর্থনা করে নিলেন শাক্য-মুনিকে মহারাজ শুদ্ধোদন প্রমুখ শাক্যবৃন্দ। কপিলবাস্তুর নিগ্রোধারামে সমাগত হলেন সপারিষদ সম্বুদ্ধ।

বলা বাহুল্য, জ্ঞাতিগণ অসাধারণ পুণ্য-পুরুষ তথাগতকে সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করতে পারলেন না। আভিজাত্য গর্ব-স্ফীত শাক্যগণ সিদ্ধার্থকে দেখতেন যে চক্ষে, এখনও সে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই আলাপ ও ব্যবহার করতে লাগলেন লোকগুরু সম্বুদ্ধের সহিত। তাঁদের অহঙ্কার নির্মূল করার মানসে মহামানব বুদ্ধ অভিজ্ঞান ধ্যান-প্রভাবে গগনমণ্ডলে রচনা করলেন সমুজ্জ্বল রত্নময় চংক্রমণ-বীথি। সেই বৈচিত্র্যময় চংক্রমণ-বীথিতে জ্যোতির্ময় শ্রীপাদ-বিক্ষেপে চংক্রমণে রত হলেন বুদ্ধলীলায় জগজ্জ্যোতিঃ অমিতাভ। তাঁর হেমবরণ দেহ থেকে বিচ্ছুরিত হতে লাগল স্নিগ্ধ-সুন্দর ষড়রশ্মি। রশ্মির উজ্জ্বল প্রভায় উদ্ভাসিত হলো নভোমণ্ডল। অপূর্ব প্রভাস্বর বর্ণে আলোকিত হলো কপিলপুরী। পুণ্য-লক্ষণ পরিশোভিত পুণ্য-পুরুষ বুদ্ধ নভঃস্থলে পদ্মাসনে সমাসীন হয়ে সুমধুর ব্রহ্মস্বরে পরিবেষণ করলেন ঋদ্ধিময় দেশনা। প্রাঞ্জল-সাবলীল বাক্যবিন্যাসে লোকোত্তর ধর্মের নিগূঢ়-তত্ত্ব করলেন উদ্‌ঘাটন।

শাক্যগণ হলেন বিস্ময়ে স্তম্ভিত, বিমোহিত ও অভিভূত। উপলব্ধি করলেন--- 'গৌতম অপ্রতিম প্রভাবশালী, অনন্যসাধারণ গুণ-গরিমা মণ্ডিত! তাঁদের থেকে বহু ঊর্ধ্বে, বহু উন্নত; শাক্যকুলের গৌরব-মুকুট! কেবল আমাদের নয় গৌতম, জগতের আলো, জগতের নমস্য, জগতের মহাচক্ষু!

শাক্যগণ সুগতের প্রতি সমধিক প্রসন্ন হলেন। অন্তর হলো শ্রদ্ধায় পূর্ণ, মস্তক হলো অবনত। শাক্যমুনিকে শ্রেষ্ঠত্বে বরণ করে নিলেন শুদ্ধোদন প্রমুখ জ্ঞাতিগণ। নতশিরে বন্দনা করলেন তাঁকে।

এমন সময় বর্ষণ হলো পুষ্কর বৃষ্টি। যিনি ইচ্ছা করলেন, তিনিই মাত্র সিক্ত হলেন; অন্যের শরীরে কিন্তু, এক বিন্দুও পড়লো না। এতে আরো অধিক আশ্চর্যান্বিত হলেন শাক্যগণ। এ বিস্ময়কর বৃষ্টির কথা-প্রসংগে বুদ্ধ বর্ণনা করলেন 'বেস্‌সন্তর' কাহিনী।

তিন

দেশনার পরিসমাপ্তি করলেন অমিতাভ। অন্তরীক্ষে তিনি অন্তর্হিত হয়ে স্বস্থানে উপবিষ্টাবস্থায় করলেন আত্মপ্রকাশ। চমৎকৃত হলেন শাক্যগণ। শাক্যসিংহের ব্যক্তিত্বের অসাধারণত্ব উপলব্ধি করে গরিষ্ঠ-শ্লাঘায় জ্ঞাতিদের অন্তর হলো পরিপূর্ণ। পুত্র-গৌরবে বক্ষ স্ফীত হয়ে উঠল শুদ্ধোদনের। বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন জ্ঞাতিগণ সুগতের প্রতি গভীর-শ্রদ্ধা নিবেদন করে একে একে বিদায় নিলেন। রাজাও প্রস্থান করলেন নীরবে, আনন্দিত মনে।

রাজভবনে সশিষ্য বুদ্ধের উদ্দেশ্যে পরবর্তী দিনের জন্য উৎকৃষ্টতম খাদ্য-ভোজ্য প্রস্তুত হতে লাগল। তাঁরা কিন্তু, জানেন না যে, বুদ্ধ অথবা বুদ্ধশিষ্যগণ অনিমন্ত্রিত অবস্থায় কারও গৃহে আহার গ্রহণ করেন না। পরদিবস বুদ্ধ যথারীতি সশিষ্য ভিক্ষার্থী হয়ে কপিলপুরে উপনীত হলেন। এ সংবাদ শুনে রাজা শুদ্ধোদন বিচলিত হলেন। চিন্তা করলেন—"রাজ-পুত্র হয়ে ভিক্ষাচরণ! বড়ো অপমান।"

দুঃখিত অন্তরে তিনি দ্রুত গিয়ে বুদ্ধের সম্মুখে স্থিত হলেন। রুদ্ধস্বরে বললেন—"সিদ্ধার্থ, এ-কি, রাজপুত্র হয়ে ভিক্ষাচরণ! বড়ো লজ্জা, বড়ো অপমানের বিষয়। এতে শুধু তুমি যে, নিজের গৌরব নষ্ট করছো তা নয়, সমগ্র রাজকুলের গৌরব বিসর্জন দিচ্ছো।"

"মহারাজ, ভিক্ষাচর্যাই আমাদের বংশ-প্রথা।"

"বলো কি পুত্র! ভিক্ষাচর্যাই আমাদের বংশপ্রথা! কই, শাক্য বংশে তো এমন প্রথা নেই! বরং ভিক্ষাবৃত্তিকে শাক্যেরা অতি হেয় মনে করে।"

"মহারাজ, শাক্যবংশ আপনাদের বংশ, কিন্তু ভিক্ষাজীবী বুদ্ধবংশেই আমার জন্ম। ভিক্ষাচরণে জীবিকা নির্বাহ করাই বুদ্ধগণের চিরন্তন প্রথা।"

অতঃপর সুগতের উদাত্ত কণ্ঠে ধ্বনিত হলো মুক্তির বাণী--- "মহারাজ, পরিহার করুন মোহনিদ্রা। উঠুন, জাগ্রত হউন, আর প্রমাদের বশবর্তী হবেন না, সত্যধর্মের অনুসরণ করুন, ধর্মচারী সুখেই বিহরণ করে, উজ্জ্বল হয় তাদের ভবিষ্যৎ জীবন।"

বুদ্ধের এই সারগর্ভ বাণী শোনা মাত্রই শুদ্ধোদন হলেন স্রোতাপন্ন। চকিতে ভেঙ্গে গেল তার মোহনিদ্রা। পরমামৃতের আস্বাদ পেলেন অনুপম। অন্তর হলো আনন্দময়। তখন তিনি কৃতাঞ্জলি পুটে অনুরোধ করলেন— "ভগবন্, আপনি দয়া করে সশিষ্য রাজপ্রাসাদে আসুন, সেখানেই আপনাদের আহার প্রস্তুত করা হয়েছে।"

তথাগত সশিষ্য রাজপ্রাসাদে উপনীত হলেন। আহারকৃত্য সমাপন হলে মহাপ্রজাপতী গৌতমী শাক্য-মহিলাগণ পরিবৃতা হয়ে শাক্যমুনিকে দর্শন মানসে উপস্থিত হলেন। তিনি সুগতের অতি সমীপবর্তিনী হয়ে সতৃষ্ণ ও সস্নেহ অন্তরে উপবেশন করলেন। উদ্দেশ্য, তিনি আজ চোখ-ভরে দেখবেন তাঁর হৃদয়-রতন গৌতমকে। প্রগাঢ় মমতাময় অন্তরে, সবিস্ময়ে দেখতে লাগলেন পুণ্য-পুরুষ সম্বুদ্ধের পুণ্যশ্রী। পুণ্য-লক্ষণ সমলঙ্কৃত রশ্মি-সমুজ্জ্বল, সৌম্য-প্রসন্ন অপরূপ-মূর্তি দেখে রাণী চমৎকৃতা হলেন। প্রাণ ভরে উঠল তাঁর অনুপম আনন্দে। ভাবলেন-- "কী অপূর্ব মহিমায় মহিমান্বিত পুত্র আমার! নক্ষত্র-বেষ্টিত পূর্ণচন্দ্রের মতো ভিক্ষুগণ-পরিবৃত আমার পুত্র অনুপম শোভা ধারণ করেছে।"

আজ আনন্দ-বন্যায় প্লাবিত হলো গৌতমীর হৃদয়-রাজ্য। তাঁর অন্তরের নিধি, সাধনার ধন, পুত্রাদপি পুত্রের দর্শন পেয়ে সুদীর্ঘ দিনের জমাট-বাঁধা অফুরন্ত স্নেহ-মমতা ঝরে পড়তে লাগল যেন গৌতমের সর্বাঙ্গে, বাদল-ধারার মতো। তখন মহাপ্রজাপতির গণ্ডদ্বয় প্লাবিত করে প্রবাহিত

হলো আনন্দাশ্রু।

সম্বুদ্ধ অভিজ্ঞান-প্রভাবে জ্ঞাত হলেন গৌতমীর চিত্তভাব। তাঁর চিত্তানুকূল মুক্তির বাণী তখন ধ্বনিত হয়ে উঠল তথাগতের কম্বুকণ্ঠে---"হে গৌতমি, মোহ-মুক্ত করো চিত্ত। এ অনিত্যময় সংসারে তোমার বলতে কিছুই নেই। স্নেহ-মমতা, বিষয়াশয় তৃষ্ণার মূলাধার। সত্যধর্মের আশ্রয় নাও। ধর্মের অজেয়-শক্তি---তৃষ্ণা ও মোহকে করবে নির্মূল। দুঃখ-নিবৃত্তির উপায় করবে এই সদ্ধর্ম।"

সুগতের সারগর্ভবাণী শুনে গৌতমীর জ্ঞান-চক্ষু প্রস্ফুটিত হলো। আর্যসত্যে প্রবুদ্ধা হলেন, তিরোহিত হলো অন্ধ-বিশ্বাস। তিনি 'স্রোতাপন্না' হলেন। মহারাজ শুদ্ধোদন এধর্ম শুনে হলেন 'সকৃদাগামী'।

শাক্যমুনি কপিলপুরে আগমনের তৃতীয় *দিবসে নন্দকুমারকে প্রব্রজ্যা দান করলেন। সপ্তম দিবসে রাহুলকে প্রব্রজ্যা দিয়ে লোকোত্তর ধনের অধিকারী করলেন। নৃপতি শুদ্ধোদন সম্বুদ্ধের মুখে পুরাতত্ত্বের 'মহাধর্মপালের' অপূর্ব কথা শুনে 'অনাগামী' ফল সাক্ষাৎ করলেন।

প্রব্রজ্যা

তথাগত কপিলবাস্তুতে সপ্তাহাধিক কাল অতিবাহিত করার পর মল্লরাজ্যাভিমুখে যাত্রা করলেন। তথায় অনুপ্রিয় নামক আম্রকাননে সশিষ্য তিনি অবস্থান করলেন কিয়দ্দিন। এদিকে কপিলনগরে তখন শাক্যদের অন্তরে মহা আলোড়নের সৃষ্টি হলো। তাঁরা এরূপ বিস্ময়কর বাক্যের আলোচনা করতে লাগলেন--- "গৌতম আশ্চর্য পুরুষ, কেমন তাঁর অলৌকিক-শক্তি, কী চমৎকার ষড়রশ্মি, কী সৌম্য-মূর্তি; যেমন জ্যোতির্ময়-পুরুষ, তেমনি মর্মস্পর্শী তাঁর বাণী; নিশ্চয়ই ইনি সর্বজ্ঞ-সর্বদর্শী! এটাই পরম বিস্ময়ের বিষয় যে---কতো দিগ-দেশের জনগণই এ মহামানবের আশ্রয়ে এসেছেন, তিনিও জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে সাগ্রহে শিষ্যত্বে বরণ করে নিয়েছেন!

* মতান্তরে দ্বিতীয় দিবস।

এখানেই মানব-ইতিহাসের চিরন্তন ছুঁৎমার্গের কঠোর - বন্ধন হয়েছে ছিন্ন, দলিত, মথিত ও নিষ্পেষিত! সম্বুদ্ধের অনুকূল ও অনন্যসাধারণ শিক্ষার প্রভাবেই শিষ্যেরাও হয়েছেন---শান্ত, মুক্ত ও সুসংযত!

অথচ, আমরা কিন্তু, এখনও নিশ্চেষ্ট হয়ে আসক্তির মোহে আবদ্ধ রয়েছি! কী লজ্জার কথা! এতে আমাদের গৌরবোজ্জ্বল কুলে মহা-কলঙ্কের রেখাপাত হচ্ছে না কি? আমরাও সংসার ত্যাগ করবো। শাক্য-সিংহের পদাঙ্কানুসরণ ও তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করাই আমাদের আশু কর্তব্য।''

শাক্যদের মধ্যে প্রবলভাবে চলতে লাগল এসব কথার আলোচনা। সর্বত্র মুখর হয়ে উঠল ত্যাগ-মহিমার গুঞ্জন-ধ্বনি। প্রত্যেকের অন্তরে প্রব্রজ্যা গ্রহণের তীব্র প্রেরণা জাগল। দলে দলে শাক্যগণ ছিন্ন করে কমনীয় কামজাল, ভেদ করে ভোগ-বিলাসের মদিরাময় মোহদুর্গ, ভগ্ন করে আভিজাত্যরূপ লৌহকারার লৌহ-কপাট; বিত্ত, ঐশ্বর্য ও বিষয়াশয় সব কিছুই ত্যাগ করে ছুটে গেলেন মুক্তি-পতাকার বেদী-মূলে। সকলকেই মুক্তি-মন্ত্রে দীক্ষা দিলেন সম্বুদ্ধ। এ শুভযাত্রায় সহস্রাধিক শাক্যকুমার শ্রমণ-ধর্ম গ্রহণ করলেন।

এ সময়ে কপিলপুরের রাজপরিবারের মহাতেজস্বী উজ্জ্বল রত্নোপম ভদ্রিয়, অনুরুদ্ধ, আনন্দ, ভৃগু ও কিম্বিল এই কুমারপঞ্চক বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণের সঙ্কল্প ঘোষণা করলেন। এ সংবাদ পেয়ে দেবদহের রাজপুত্র দেবদত্তও তাঁদের সঙ্গী হবার সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন। একথা শুনে বিচলিত হলেন রাজকুলের কৌরকার উপালি। সদ্ধর্মের সুশীতল ছায়ায় সন্তপ্ত জীবনকে করতে চান তিনি চির-শীতল, চির-শান্তিময়।

এক শুভক্ষণে উক্ত সপ্তজন অনুপ্রিয় গ্রামাভিমুখে পদব্রজে যাত্রা করলেন। সচরাচর কুমারেরা রথারোহনেই যাতায়াত করে থাকেন। তাঁদের পক্ষে এই সুদীর্ঘ-পথ পদব্রজে অতিক্রম করা কষ্ট-সাধ্য হলেও, মহিমময় বুদ্ধ ও প্রব্রজ্যা ধর্মের প্রতি অসীম শ্রদ্ধাবশত তাঁরা যান-বাহনে আরোহণ করেননি। পুণ্য-সংস্কার চিত্তকে এরূপভাবেই গঠন করে তোলে। সংস্কারের প্রবল আকর্ষণেই এই পুণ্যময় সজ্জনগণ দারুণ পথ-কষ্টকে পুষ্প-

মাল্যের মতো সানন্দে বরণ করে নিলেন। বলাবাহুল্য, তাঁদের রাজযোগ্য মহার্ঘ পরিচ্ছদ পথেই বিসর্জন দিয়ে গেলেন।

যথাসময়ে তাঁরা অনুপ্রিয় আম্র কাননে উপস্থিত হয়ে সুগতকে সগৌরবে বন্দনান্তর একান্তে উপবেশন করলেন। কারুণিক বুদ্ধ করুণাঘন অন্তরে তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন--"তোমরা কি কপিলপুর থেকেই আসছো?"

তাঁরা বিনীত বাক্যে উত্তর দিলেন--- "হ্যাঁ ভগবন্।"

"পথে কোনোরূপ বিঘ্ন হয়নি তো?"

"না প্রভু, তেমন কোনও বিঘ্ন হয়নি। কিন্তু, পদব্রজে আসতে একটু কষ্ট হয়েছে।"

"রাজকুলের সন্তান কিনা, কষ্ট হয়েছে বৈ কি। এর চেয়েও বড়ো দুঃখ জন্মান্তর-পথে পরিভ্রমণ করা। অপায়-দুঃখ ততোধিক দারুণতর। তোমাদের এ আগমনের উদ্দেশ্য কি?"

"প্রভু, প্রব্রজ্যা গ্রহণের উদ্দেশ্যেই আমরা এসেছি। দয়া করে আমাদেরকে প্রব্রজ্যা প্রদান করুন। তৎপূর্বে আমাদের নিবেদন এই--- আমরা শাক্য মাত্রই বড়ো আত্মাভিমানী; এ উপালি ক্ষৌরকার আমাদের বহু দিনের পরিচারক; সুতরাং একেই প্রথম প্রব্রজ্যা প্রদান করুন। আমরা প্রথমেই একে অভিবাদন করবো। এতেই ধ্বংস হোক আমাদের আত্মাভিমান, জাত্যাভিমান ও কুলাভিমান।"

একথা শুনে ভগবান শাক্যকুমারদের প্রশংসা করলেন এবং উপালিকেই প্রথম প্রব্রজ্যা দিলেন,। তৎপর বয়ঃক্রমানুসারে কুমারগণকে প্রব্রজ্যা প্রদান করলেন। কালক্রমে তাঁদের প্রব্রজ্যা সার্থক হলো। সে' বর্ষার মধ্যেই ভদ্রিয় হলেন ত্রিবিদ্যা সম্পন্ন অর্হৎ, অনুরুদ্ধ দিব্য-চক্ষুর শ্রেষ্ঠত্বে হলেন উন্নীত। পরে তিনি 'মহাপুরুষ বিতর্ক' সূত্র শুনে অর্হত্বফল সাক্ষাৎ করলেন। আনন্দ পূর্ণ মন্তানি-পুত্রের মুখে ধর্ম শুনে স্রোতাপত্তি ফলে প্রতিষ্ঠিত হলেন। অন্য সময় ভৃগু, কিম্বিল ও উপালি তৃষ্ণা-মুক্ত হয়েছিলেন। দেবদত্ত সাধারণ পৃথগজন-ঋদ্ধিশক্তি লাভ করেই সন্তুষ্ট রইলেন।

প্রধান সেবকত্ব লাভ

পুণ্যময় গৌতম সম্বুদ্ধত্ব লাভের পর থেকে বিংশতি বৎসর যাবৎ তার তেমন কোনো নির্দিষ্ট সেবক নিযুক্ত ছিলেন না। ভিক্ষু নাগসমাল, নাগিত, উপবান, সুনক্ষত্র, উদায়ী, চুন্দ, সাগত, রাধ ও মেঘিয় প্রভৃতি ভিক্ষুগণ অনুক্রমে তথাগতের সেবা করেছিলেন; কিন্তু, তা তাঁর অভিরুচি অনুযায়ী হয়নি।

একদা শ্রাবস্তীর জেতবন বিহারে বুদ্ধ ধর্মদেশনা করছিলেম। প্রসঙ্গ-ক্রমে তিনি ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বললেন--- "ভিক্ষুগণ, আমি বৃদ্ধ হয়েছি। তথাগতের এখন একজন স্থায়ী সেবকের প্রয়োজন। সে হবে তথাগতের নিয়ত সেবক, নিরলস, কর্তব্য-পরায়ণ ও বিচক্ষণ। এযাবৎ যে সব ভিক্ষু তথাগতের সেবা করে আসছে, তাদের মধ্যে কেহ কেহ নিতান্ত অরোগ্য, আর কেউ বা আপন কাজে ব্যস্ত। তাই তথাগতকে বড়ো ক্লেশ ও অসুবিধা ভোগ করতে হয়েছে।"

জগৎপূজ্য বুদ্ধের একথা শুনে ভিক্ষুরা অন্তরে বড়ো আঘাত পেলেন। জেগে উঠল প্রত্যেকের চিত্তে ধর্ম-সংবেগ। তৎক্ষণাৎ অগ্রশ্রাবক শারীপুত্র অভিবাদনান্তে দণ্ডায়মান হয়ে যুক্তকরে প্রার্থনা করলেন--- "ভন্তে ভগবন্, আমার বিদ্যমানে আপনি উপযুক্ত সেবকের অভাবে যে, ক্লেশ ভোগ করছেন, এটা বড়ো মর্মন্তুদ ব্যাপার। এখন থেকে আমিই শাস্তার স্থায়ী সেবক হবো।"

সুগত প্রত্যাখ্যান সূচক বাক্যে বললেন--- "শোনো শারীপুত্র, তুমি ধর্মসেনাপতি, অনুবুদ্ধ। যেদিকে তুমি অবস্থান করো, সেদিক বুদ্ধশূন্য হয় না। তোমার উপস্থিতিতে বুদ্ধের অভাব অনুভব করার মতো তেমন কোনও কারণ অবশিষ্ট থাকে না। তথাগতের উপদেশ সমতুল্য তোমার উপদেশ। আমার সেবকপদে নিযুক্ত রেখে তোমায় আবদ্ধ করতে পারি না। অধিকন্তু, পূর্ণ হয়েছে তোমার পূর্ব প্রার্থনা। এর পরও কি তোমার বলার মতো আর কিছু অবশিষ্ট থাকতে পারে?"

শারীপুত্র বুদ্ধের মনোভাব বুঝে নিরস্ত হলেন। শাস্তা যখন অগ্র-শ্রাবককে অবকাশ দিলেন না, তখন মৌদ্‌গল্যায়ন ওঠে অনুরূপ প্রার্থনা জানালেন। তিনিও অনুমতি পেলেন না। অতঃপর অনুক্রমে মহাকশ্যপ, অনুরুদ্ধ ও উপালি প্রভৃতি অশীতি মহাশ্রাবক একে একে প্রত্যেকেই প্রার্থনা জানালেন। কিন্তু, বুদ্ধ প্রত্যেকের প্রার্থনাই প্রত্যাখ্যান করলেন। এ মহতী সভায় একমাত্র আনন্দই শুধু প্রার্থনা করলেন না। তিনি নীরবেই উপবিষ্ট রইলেন। বুদ্ধের প্রতি অসীম মমতা হেতু তাঁর অন্তরে জেগে উঠেছে দুর্জয় অভিমান। তখন তিনি ভাবছিলেন--- "আমার বিদ্যমানে শাক্যমুনি ক্লেশ পাবেন, এ-যে বড়ো অসহনীয়। অথচ, তিনি তো আমায় একবারও আদেশ করলেন না?" একারণেই দারুণ আঘাত পেলেন তিনি। ক্ষোভে-দুঃখে হলেন ম্রিয়মাণ।

তখন ভিক্ষুগণ তাঁকে বললেন--- "বন্ধু আনন্দ, আপনি নীরব রয়েছেন কেন? আপনিও প্রার্থনা করুন।"

উত্তরে মতিমান আনন্দ বললেন--- "দেখুন বন্ধুগণ, বিনা প্রার্থনায় পাওয়ার স্থলে, প্রার্থনা ক'রে যদি লাভ করতে হয়, সে লাভের মর্যাদাই বা কি? তা'তে কি কোনো চিত্ত-সন্তোষ মিলে? প্রার্থী হবো কেন? তথাগত আমায় তো আদেশ করতে পারেন। কই, তা'তো তিনি করছেন না? হয়তো তিনি মনে করছেন--- আমি তাঁর সেবকের উপযুক্ত নই।"

বুদ্ধ এ কথা শুনে ভিক্ষুগণকে বললেন--- "ভিক্ষুগণ, তোমরা কেন আনন্দকে উৎসাহ দান করছো? সে স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়েই এর প্রয়োজন অনুভব করবে। সে স্বেচ্ছায় আমার সেবা করবে। একমাত্র ওরই এতে সর্বতোভাবে অধিকার রয়েছে।"

তখন ভিক্ষুগণ উচ্ছ্বাস-বাক্যে আনন্দকে বললেন--- "বন্ধু আনন্দ, উঠুন, উঠুন, প্রার্থনা করুন। আমাদের মধ্যে আপনিই একমাত্র সৌভাগ্যবান!"

অষ্ট বর লাভ

আয়ুষ্মান্ আনন্দ দাড়িয়ে যুক্তকরে নিবেদন করলেন--- "প্রভু ভগবন্, আপনার সেবার জন্য যদি প্রাণ বিসর্জনও দিতে হয়, সেরূপ সুতীব্র বাসনা,

দুর্জয় মনোবল ও প্রগাঢ় ভক্তি-শ্রদ্ধা আমার অন্তরে উন্মুখ হয়ে রয়েছে। হৃদয়ে সঞ্চিত রয়েছে অগাধ-মমতা, হৃদ্যতা ও ঐকান্তিকতা। কে যেন আমায় বলে দিচ্ছে--- 'আনন্দ, দশবল বুদ্ধের প্রধান সেবক হবার তোমারই একমাত্র অধিকার রয়েছে।'' কিন্তু প্রভু, ভগবৎ সকাশে আমার আটটি বর প্রার্থনা করবার আছে। তন্মধ্যে চারটি হচ্ছে প্রতিক্ষেপের বিষয়, অপর চারটি হচ্ছে যাচ্ঞার বিষয়।''

বুদ্ধ বললেন--- ''আনন্দ, প্রার্থনার বিষয় সম্যক্‌রূপে অবগত না হয়ে, তথাগত কা'কেও বর প্রদান করেন না।''

''প্রভু, প্রথম চারটি বিষয় সর্বতোভাবে আমার প্রত্যাখ্যান মূলক বলেই মনে করি। যথা---

(১) সুগতের স্বীয় লব্ধ উত্তম চীবর,

(২) সুগত-লব্ধ উত্তম খাদ্য-ভোজ্য,

(৩) সুগতের সঙ্গে গন্ধকুটীরে অবস্থান,

(৪) সুগতের সহিত কেবলমাত্র আমারই নিমন্ত্রণে গমন।

আমার যাচ্ঞার যোগ্য চতুর্বিধ বিষয়, যথা---

(১) আমার গৃহীত যে কোনও নিমন্ত্রণ ভগবান যদি গ্রহণ করেন,

(২) বুদ্ধ-দর্শনে দূরদেশাগত যে কোনও ব্যক্তিকে আমার ইচ্ছানুসারে যে কোনো সময়ে ভগবান যদি দর্শন দান করেন,

(৩) কোন বিষয়ে আমার মনে সন্দেহের সঞ্চার হলে, যে কোনো মুহূর্তেই ভগবৎ সকাশে উপস্থিত হয়ে সে সন্দেহ যদি ভঞ্জন করতে পারি,

(৪) আমার অনুপস্থিতিতে ভগবান যেখানে যা দেশনা করেন, বিহারে এসে পুনরায় আমাকে যদি উক্ত দেশনার বিষয়-বস্তু জানান।

প্রভু, এ আটটি বিষয়ে যদি ভগবান সম্মতি প্রদান করেন, তবে আমি তথাগতের নিত্য-সেবক হতে পারি।''

বুদ্ধ জিজ্ঞাসা করলেন--- "আনন্দ, কেন তুমি প্রথমোক্ত চতুর্বিধ বিষয় প্রত্যাখ্যান করলে?"

"প্রভু, আপনার নিকট থেকে উক্ত চতুর্বিধ বিষয় যদি আমি লাভ করে থাকি, তা হলে ভিক্ষুদের মধ্যে এরূপ কথারও অবতারণা হতে পারে--- 'সুগত -লব্ধ উৎকৃষ্ট চীবর ও খাদ্য-ভোজ্য আনন্দই কেবল পরিভোগ করছে। গন্ধকুটীরে এক সঙ্গেই অবস্থান করছে এবং এক সঙ্গেই নিমন্ত্রণে যাচ্ছে। নিশ্চয়ই সে এরূপ লাভ-সৎকারের প্রত্যাশায় ভগবানের সেবা করছে। প্রভু, আমি এবম্বিধ দোষদর্শী হয়েই প্রথমোক্ত চতুর্বিধ বিষয়ের প্রত্যাখ্যানের প্রার্থনা জানিয়েছি।"

"আনন্দ, শেষোক্ত চতুর্বিধ বিষয় যাচ্ঞার কারণ কি?"

(১) "প্রভু, শ্রদ্ধাবান কুলপুত্রগণ আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের অবকাশ না পেয়ে, হয়ত; আমাকে বলে যেতে পারেন---'ভন্তে আনন্দ, বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে আমি আহারের নিমন্ত্রণ করছি, সুতরাং দয়া করে বুদ্ধের সহিত আপনারা আমার গৃহে আসবেন।' ভগবান যদি সে নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন, তা হলে লোকে এমন বিদ্রূপ বাক্যও প্রয়োগ করতে পারেন--- 'আনন্দ বুদ্ধের কিরূপ সেবক জানি না; দেখছি, তাঁকে তো বুদ্ধ এতটুকুও অনুগ্রহ করেন না!

(২) তথাগতের দর্শন-প্রার্থী জনগণকে আমার ইচ্ছিত ক্ষণে দেখাতে যদি অসমর্থ হই, তা হলে লোকে এরূপও বলতে পারেন---'আনন্দ বুদ্ধের সেবক বটে, কিন্তু বুদ্ধ তাঁর কোনও কথা গ্রাহ্য করেন না। এমন কি, বুদ্ধের একটু দর্শন লাভ করাতেও তিনি অসমর্থ।'

(৩) ভগবানের নিকট যদি আমার সন্দেহ বিনোদনের অবকাশ প্রাপ্ত না হই, এবং (৪) সুগতের দেশিত বিষয় যদি আমার অজ্ঞাত থাকে, তা হলে ভগবানের পরিনির্বাণের পর কেহ যদি জিজ্ঞাসা করেন---'বন্ধু আনন্দ, এ গাথা বা সূত্র অথবা এ জাতকটি কোথায়, কি কারণে বুদ্ধ ভাষণ করেছিলেন?' আমি যদি তখন এর সম্যক্ উত্তর দিতে না পারি, তবে তিনি হয়তো এরূপ বিদ্রূপাত্মক বাক্যও প্রয়োগ করতে পারেন---'বন্ধু, ইহাও যদি

না জানো, তবে কেন তুমি ছায়ার মতো সুগতের সঙ্গে বিচরণ করেছিলে ?' তাই প্রভু, এ সব কারণ চিন্তা করেই শেষোক্ত চতুর্বিধ বিষয় যাচ্ঞা করেছি।''

আনন্দের এবম্বিধ জ্ঞানগর্ভ বাক্য শুনে বুদ্ধ প্রসন্ন হয়ে বললেন--- ''সাধু, সাধু আনন্দ, তোমার বিচক্ষণতা ও চিন্তাশীলতা প্রশংসনীয়। তোমার প্রার্থনা পূর্ণ হোক ; সদিচ্ছা সাফল্য-মণ্ডিত হোক।''

আনন্দ হৃষ্টচিত্তে বুদ্ধ-বাক্যের অভিনন্দন করলেন। তখন থেকেই আনন্দ আনন্দমানা হয়ে সুগত-সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন। সম্বুদ্ধের অন্তিমকাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ পঞ্চবিংশতি বৎসর অহর্নিশ মমতাময় আন্তরিকতার সহিত ভগবানের সেবায় তিনি নিযুক্ত ছিলেন। তখন তিনি অর্হৎ না হলেও, অর্হতের পূর্ণাঙ্গ-শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সপ্তবিধ দুর্লভ সম্পদে বিভূষিত হয়েছিলেন।

যথা---(১) ধর্ম-বিনয় অধিগত, (২) গভীর জ্ঞানার্জন, (৩) প্রতীত্য-সমুৎপাদে গরিষ্ঠ জ্ঞানলাভ, (৪) আধ্যাত্মিক উন্নতির চরমসীমা প্রাপ্তির প্রগাঢ় স্পৃহা, (৫) অনুত্তর বুদ্ধ ও শ্রাবক সংঘের সাহচর্য লাভ, (৬) চিত্তের একাগ্রতা লাভ, ও (৭) বুদ্ধের প্রধান সেবকত্ব লাভ। এই সপ্তবিধ মহান্ সম্পদ ও গৌরবময় অষ্টবরের অধিকারী হয়ে উত্তরকালে তিনি সম্বুদ্ধ-শাসনে সমুজ্জ্বল আলোক-স্তম্ভসম দীপ্যমান হয়েছিলেন।

সেবার প্রাত্যহিক সরণী---নিপুণ সেবক আনন্দ প্রতিদিন বুদ্ধের জন্য উষ্ণ ও শীতল জলের ব্যবস্থা করতেন, সজ্জিত রাখতেন ত্রিবিধ দন্তকাষ্ঠ, চরণ ধৌত করে দিতেন সগৌরবে, ক'রে দিতেন সযত্নে পৃষ্ঠ-পরিকর্ম, সানন্দে সম্মার্জন করতেন গন্ধকুটীর; যে সময়ে যা প্রয়োজন--স্মৃতি সহকারে তা সুবন্দোবস্ত করে রাখতেন; বুদ্ধের আহ্বান মাত্র যেন উপস্থিত হতে পারেন, সে অভিপ্রায়ে দিবসে থাকতেন অনতিদূরে এবং রাত্রে দণ্ড-প্রদীপ হস্তে গন্ধকুটীরের চতুর্দিকে প্রতি অর্ধঘণ্টান্তর এক একবার করে নয়বার প্রদক্ষিণ করতেন। আলস্যে যা'তে আক্রান্ত না হন এও এ প্রদক্ষিণের অন্যতম উদ্দেশ্য। পূজার্হ আনন্দ অক্লান্তভাবে ও দৃঢ়বীর্য সহকারে সুদীর্ঘ পঁচিশ

বৎসর কাল বিনিদ্ররজনী যাপন করে সেবা-ব্রত উদ্‌যাপন করেছিলেন। এ কেমন সহনশীলতা, সেবাপরায়ণতা ও সেবাতৎপরতা!

সুদূর অতীতের সুমন যেই মহতী পরিকল্পনা নিয়ে পূর্ণ করেছিলেন পবিত্র শ্রাবক পারমীধর্ম, তা আজ ফলে-পুষ্পে হয়েছে সুশোভিত। তথাগত বুদ্ধের প্রধান সেবকত্ব প্রাপ্তির ঐকান্তিক কামনা-প্রার্থনা তাঁর সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে।

(মনোরথ পূরণী, থেরগাথা ও পরমার্থ দীপনী)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বিবিধ বিষয়

১। গৌতমীর বস্ত্রদান—

এক

কপিলবাস্তুর রাজপ্রাসাদে মহাপ্রজাপতী গৌতমী তথাগত বুদ্ধকে প্রথম দর্শন করে কতো কথাই না ভাবছিলেন--- "এই তো আমার স্নেহ-প্রতিম পুত্র সিদ্ধার্থ। জন্মের মাত্র সপ্তম দিবসে সদ্য মাতৃহারা যে' শিশুকে আমি বক্ষে তুলে নিয়েছিলাম, সেদিনই আমার মাতৃহৃদয় হয়েছিলো অপূর্ব স্নেহ-মমতার অমিয়-ধারায় সিক্ত, প্লাবিত। সিদ্ধার্থকে কোলে নিয়েই সেদিন আমার তৃষিত-হৃদয়ে প্রথম অনুভব করেছিলাম অভাবনীয় মাতৃ-স্নেহের আকুলকরা মধুর-মোহন স্পর্শ। আমার প্রাণ হতে প্রাণ, বাণী হতে বাণী, আলো হতে আলো, মাতৃ-হৃদয়ের একচ্ছত্র সম্রাট সিদ্ধার্থ যখনি যা চাইতো, তখনি তা দিয়ে হাসি-খুশি-আনন্দে তা'কে মগ্ন রাখতাম। সারাক্ষণ আকুল -দৃষ্টিতে তার মুখপানে চেয়ে, সযত্নে প্রাণের ঘেরায় রেখে, হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ-মমতা উজাড় করে দিয়েও যেন আমার তৃপ্তি হতো না। এমনি করে প্রাণাধিক পুত্র তার জীবনের ঊনত্রিশটি বৎসর আমার স্নেহ-ছায়ায় অতিবাহিত করেছিলো।

সেদিনের মতো আজও আমার পুত্রের হাতে কিছু দেবার ইচ্ছায় অতৃপ্ত এ মাতৃ-হৃদয় উন্মুখ হয়ে উঠ্ছে। কিন্তু, আজ পুত্র তো আমার বিরাগী। সদ্য বৃন্ত-চ্যুত গোলাপের মতো সেদিনের মাতৃহারা ছোট শিশুটি, আজ মহামানব বুদ্ধরূপে আবির্ভূত হয়ে বিশ্বজগতকে তৃপ্ত করছেন আলোক দানে। আমার সেই ক্ষুদ্র-অঞ্চলের নিধি, আজ বিশ্বের অদ্বিতীয় মহান্ রত্নরূপে বিরাজমান!

তাঁকে এখন কি দিয়ে আমার অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে পারি। যা দিয়ে প্রাণে আমার শান্তি পাবো, দেওয়ার প্রগাঢ় স্পৃহা তৃপ্ত হবে। এ বিরাগী পুত্র তো এখন ভোগ-বিলাসের অতীত। দেব-বাঞ্ছিত বস্তুর প্রতিও তো ইনি বীত-স্পৃহ। তাঁকে দেওয়ার মতো একমাত্র যোগ্য বস্তু দেখছি, কাষায় বসন। হ্যাঁ, তাঁকে দু'খানা কাষায় বসনই দেবো। তা আমার প্রাণপ্রতিম পুত্রের সোনার বরণ দেহ জড়িয়ে থাকবে।

নগরে অতি মহার্ঘ উৎকৃষ্টতম ক্ষৌমবস্ত্র আছে বটে, কিন্তু তা'তে তো চিত্ত-প্রসাদ লাভ করতে পারবো না। যদি আমি স্বহস্তেই সূতা কেটে, বস্ত্র বয়ন, সেলাই ও রঞ্জন-কার্য সম্পন্ন করে দু'খানা কাষায় বসন আমার পুত্রের হাতে দিতে পারি, তবেই আমার পূর্ণ হবে অভিলাষ, সঙ্কল্প হবে চরিতার্থ এবং পরিশ্রমও হবে সার্থক।" এ চিন্তার পর রাজমহিষী গৌতমী আপন সঙ্কল্পের পূর্ণতা প্রাপ্তির মানসে কাজে অগ্রসর হলেন পূর্ণোদ্যমে।

দুই

তদনন্তর তথাগত একদা সশিষ্য কপিলবাস্তু এসে নিগ্রোধারামে অবস্থান করছিলেন। এসুযোগে মহাপ্রজাপতী গৌতমী স্বীয় নির্মিত দু'খানা কাষায়-বস্ত্র সগৌরবে শিরে নিয়ে ভগবৎ সকাশে উপস্থিত হলেন। সসম্মানে বন্দনার পর মমতাময় কণ্ঠে বুদ্ধকে বললেন---"ভন্তে ভগবন্, আপনার উদ্দেশ্যে এবস্ত্র দু'খানা প্রস্তুত করেছি। নিজেই কার্পাস সূতা আহরণ করে, নিজ হাতেই পেষণ ও ধূনন কার্য সম্পন্ন করেছি। স্বহস্তেই অতি সূক্ষ্ম সূতা কেটে, সযত্নে দু'খানা চীবর প্রস্তুত করে এনেছি। ভগবন্, আমার প্রতি করুণা করে বস্ত্র দু'খানা গ্রহণ করুন।"

বুদ্ধ বললেন--- "গৌতমি, তোমার বস্ত্র দু'খানা সংঘকে দান করো। সংঘে দান করলে, আমাকেও পূজা করা হলো এবং সংঘকেও; এতে দানের ফল হবে বিপুলতর।"

রাণীর একান্ত ইচ্ছা, এ বস্ত্র বুদ্ধকেই দান করবেন। বুদ্ধের আদেশ হলো কিন্তু অন্যরূপ। এতে রাণীর মনোবাসনা পূর্ণ হচ্ছে না দেখে, তিনি বুদ্ধকে পুনরায় অনুরোধ করলেন। বুদ্ধ কিন্তু, পূর্বোক্ত মতই অব্যাহত রাখলেন। গৌতমীর মন কিন্তু, তা বুঝতে চায় না। সবাই যেন নির্মূল হয়ে যাচ্ছে তাঁর এতোদিনের উদগ্র আকাঙ্ক্ষা ও পরিকল্পনা। তাই তিনি তৃতীয়বার কাতরস্বরে প্রার্থনা করলেন--- "ভগবন্, আপনার উদ্দেশ্যেই এ বস্ত্র প্রস্তুত করেছি। পরম সান্ত্বনা লাভ করবো--- আপনি যদি এ বস্ত্র গ্রহণ করেন।"

বুদ্ধ গম্ভীর স্বরে বললেন--- "গৌতমি, মহান্ সংঘ-ক্ষেত্রে দান করলে, বুদ্ধ আর সংঘ একই সঙ্গে পূজিত হবে এবং উভয় দিক থেকেই তোমার মহাকল্যাণ সূচিত হবে।"

তখন মহামনা আনন্দ বুদ্ধের পরিচর্যায় নিযুক্ত ছিলেন। বুদ্ধ এবং রাজমহিষীর কথোপকথন সবই তিনি শুনলেন এবং দেখলেন যে, সুগত তিন বারই প্রত্যাখ্যান করলেন গৌতমীর অনুরোধ। তখন রাণীর পক্ষ হয়ে তিনি বিনীত বাক্যে বললেন--- "ভন্তে ভগবন্, মহাপ্রজাপতী গৌতমী আপনার বহু উপকারিণী। আপনার মাতৃরূপিণী মাতৃষ্বসা। আপনার জননীর মৃত্যুর পর ইনিই স্বীয় স্তন্যদানে আপনাকে পোষণ করেছেন। ইনিই আপনার শরীর বর্দ্ধনকারিণী। আপন বক্ষে রেখে সস্নেহে আপনাকে পালন করেছেন। সুতরাং আমি প্রার্থনা করছি, আপনি করুণা পরবশ হয়ে গৌতমীর স্বহস্তে নির্মিত এ চীবর যুগল গ্রহণ করুন।"

আনন্দ আরো বললেন--- "ভগবানও মহাপ্রজাপতী গৌতমীর মহা উপকারী। আপনার উপদেশেই ইনি রত্নত্রয়ের শরণাপন্না এবং তৎপ্রতি হয়েছেন অচলা-শ্রদ্ধা সম্পন্না। আর্য-কান্ত শীলগুণেও হয়েছেন বিভূষিতা আপনার উপদেশেই গৌতমী চার আর্য-সত্য জ্ঞাত হয়েছেন সম্যক্‌রূপে। এবম্বিধ বহুকারণে আপনিও গৌতমীর মহা উপকারী।"

তিন

তথাগত শুনলেন সেবক আনন্দের অনুরোধ বাক্য। তদুত্তরে বললেন সুগত--- (১) "আনন্দ, যথার্থই বলেছো। গুরুর উপদেশ শুনে শিষ্য যদি বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণাপন্ন হয়, তা হলে এটা শিষ্যের মহা উপকার করা হয়। এ উপকারের প্রত্যুপকার মানসে শিষ্য যদি উপদেষ্টা গুরুকে সগৌরবে পদপ্রান্তে লুটিয়ে অভিবাদন করে, সযত্নে সেবা করে, মহার্ঘ ক্ষৌম বস্ত্রও দান করে, অত্যুৎকৃষ্ট আহার্যবস্তু, শয়নাসনের যাবতীয় মূল্যবান উপকরণ ও গুরুর রুগ্নাবস্থায় ঔষধ-পথ্যাদিও দান করে, এমন কি উচ্চতায় ৮৪ হাজার যোজন রাশিকৃত যাবতীয় দানীয় সামগ্রী সসাগরা মহাপৃথিবী পরিপূর্ণ করেও যদি দান করে, তবুও তা উপদেষ্টা গুরুর উপকারের যথোচিত প্রত্যুপকার বা প্রতিদান হয় না, অর্থাৎ ঋণ-মুক্ত হয় না।

(২) হে আনন্দ, তদুপরি যে-শিষ্য গুরুর উপদেশে প্রাণী-হত্যা, চুরি, কামমিথ্যাচার, মিথ্যা কথন ও প্রমাদ স্থানীয় সুরাদি মাদক-দ্রব্য সেবনে প্রতিবিরত হয়,

(৩) তদুপরি যে শিষ্য গুরুর উপদেশে বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের প্রতি অচলা শ্রদ্ধা সম্পন্ন হয় ও আর্য-কান্ত শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়,

(৪) তদুপরি যে শিষ্য গুরুর উপদেশে দুঃখ সত্য, দুঃখ-সমুদয় সত্য, দুঃখ-নিরোধ সত্য এবং দুঃখ-নিরোধোপায় আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গে নিঃসন্দেহ হয়, তা হলে আনন্দ, এ শিষ্য উপদেষ্টা গুরুর মহদুপকার স্মরণ করে কৃতজ্ঞান্তরে গুরুকে সগৌরবে অভিবাদন, প্রত্যুত্থান, অঞ্জলিকর্ম ও সেবা-পরিচর্যাদি সর্বকার্য সম্পাদন করে, এবং বস্ত্র, আহার্য বস্তু, শয়নাসন ও ঔষধ-পথ্যাদিও যদি দান করে, তবুও তা গুরুর মহদুপকারের যথোচিত প্রত্যুপকার বা প্রতিদান হয় না, অর্থাৎ শিষ্য ঋণ-মুক্ত হয় না। (প্রত্যেক বিষয়ে উপরোক্ত বিস্তৃতার্থ জ্ঞাতব্য)।

আরো শোনো আনন্দ, পুদ্গলিক (ব্যক্তি বিশেষ) এবং সংঘ-দানের পার্থক্য কোথায়। পুদ্গলিক দান চৌদ্দ প্রকার; যথা---(১) সম্যক্ সম্বুদ্ধ,

(২) পচেচক বুদ্ধ, (৩) অর্হৎ, (৪) অর্হৎ মার্গস্থ, (৫) অনাগামী, (৬) অনাগামী মার্গস্থ, (৭) সকৃদাগামী, (৮) সকৃদাগামী মার্গস্থ, (৯) স্রোতাপন্ন, (১০) স্রোতাপন্ন মার্গস্থ, (১১) বুদ্ধ-শাসনের বহির্মুখী ঋষি-প্রব্রজ্যালাভী, কামে বীত-রাগী, লৌকিক ধ্যান লাভী, পঞ্চ অভিজ্ঞান প্রাপ্ত ও কর্মবাদী, (১২) পৃথগ্‌জন (যারা মার্গস্থ ও ফলস্থ নয়), (১৩) দুঃশীল ব্যক্তি ও (১৪) তীর্যক-প্রাণী (পশু-পক্ষী), দানের পাত্র এই চৌদ্দ প্রকার। এর মধ্যে যাকেই দান করা হোক্ না কেন, সে দান প্রতিপুদ্‌গলিক সংজ্ঞায় অভিহিত হয়।

আনন্দ, ক্ষেত্র বিশেষে ফলেরও যে, তারতম্য হয়, তা শ্রবণ করো---

(১) পশু-পক্ষীকে দান করলে, সে দানের ফল হয় শতগুণ; অর্থাৎ শত জন্মে আয়ু, বর্ণ, সুখ, বল ও জ্ঞান এ পঞ্চ সম্পদে সমৃদ্ধ হয়।

(২) দুঃশীল ব্যক্তিকে দান করলে, সে দানের ফল হয় সহস্রগুণ; অর্থাৎ সহস্র জন্মে উক্ত পঞ্চ সম্পদের অভিবৃদ্ধি হয়।

(৩) শীলবান ব্যক্তিকে দান করলে, দানের ফল হয় লক্ষগুণ; অর্থাৎ লক্ষ জন্মাবধি উক্ত পঞ্চ সম্পদে সৌভাগ্যশালী হয়।

(৪) বুদ্ধ-শাসনের বহিঃস্থ লৌকিক ধ্যান-লাভীকে দান করলে, সে দানের ফল হয় কোটি লক্ষগুণ, অর্থাৎ কোটি লক্ষ জন্মাবধি পুণ্য-দ্যোতক উক্ত পঞ্চ সম্পদের অধিকারী হয়ে সুখী ও ধন্য হয়।

(৫) স্রোতাপত্তি মার্গস্থকে দান করলে, সে দানের ফল হয় অসংখ্য, অপ্রমেয়।

(৬) স্রোতাপন্ন, সকৃদাগামী, অনাগামী ও অর্হৎ মার্গস্থ-ফলস্থ এবং পচেচক বুদ্ধ ও সম্যক্ সম্বুদ্ধকে দান করলে, সে দানের ফল যে কতো মহান্, কতো গরিষ্ঠ, তা' অনির্বচনীয় ও অবর্ণনীয়।

আনন্দ, সংঘদান সপ্তবিধ, যথা---(১) বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘে দান, (২) বুদ্ধ পরিনির্বাণের পর ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘে দান, (৩) ভিক্ষুসংঘে দান, (৪) ভিক্ষুণী-সংঘে দান, (৫) সংঘের অনুমতিক্রমে সংঘোদ্দেশ্যে এক অথবা একাধিক সংখ্যক ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীকে দান,

(৬) সংঘের অনুমতিক্রমে সংঘোদ্দেশ্যে এক অথবা একাধিক সংখ্যক ভিক্ষুকে দান, (৭) সংঘের অনুমতিক্রমে সংঘোদ্দেশ্যে এক অথবা একাধিক সংখ্যক ভিক্ষুণীকে দান।

আনন্দ, সুদূর ভবিষ্যতে ভিক্ষুদের অবস্থা কিরূপ হয়ে দাঁড়াবে জানো? তারা হবে নামে মাত্র ভিক্ষু, কাষায়-কণ্ঠ (শ্বেত-বস্ত্রধারী ও ভিক্ষুর চিহ্ন স্বরূপ কণ্ঠে থাকবে হল্‌দে ফিতা মাত্র), দুঃশীল ও পাপ-ধর্ম পরায়ণ। সেই দুঃশীল গণকে যদি সংঘোদ্দেশ্যে দান দেওয়া হয়, তাদৃশ সংঘ দানের ফলও অসংখ্য-অপ্রমাণ বলে আমি বলছি। অপিচ, কোনো প্রকারেই আনন্দ, সংঘ দান থেকে পুদ্‌গলিক দান অধিকতর ফলদায়ক হতে পারে না।

আনন্দ, দান-বিশুদ্ধি চতুর্বিধ, যথা---(১) কোনো দান দায়ক হতে বিশুদ্ধ হয়, প্রতিগ্রাহক হতে হয় না। (২) আর কোনো দান প্রতিগ্রাহক হতে বিশুদ্ধ হয়, দায়ক হতে হয় না। (৩) কোনো দান দায়ক ও প্রতিগ্রাহক উভয় পক্ষ হতেই অবিশুদ্ধ হয়। (৪) আবার কোনো দান দায়ক ও প্রতিগ্রাহক উভয় পক্ষ হতেই বিশুদ্ধ হয়। শোনো আনন্দ, এর কারণ কি---

(১) শীলবান ব্যক্তি নিঃস্বার্থ দানের বিপুল ফলের প্রতি বিশ্বাস রেখে প্রসন্ন-চিত্তে দুঃশীলকে যদি ন্যায়তঃ ধর্ম-লব্ধ বস্তু দান করে, তবে সে দান দায়ক হতেই বিশুদ্ধ হয় এবং দানের ফলও বিপুল হয়।

(২) নিঃস্বার্থ দানের মহান্ ফলের প্রতি অবিশ্বাসী দুঃশীল ব্যক্তি অধর্ম-লব্ধ বস্তু অপ্রসন্ন মনে শীলবানকে যদি দান করে, তবে সেদান প্রতিগ্রাহক হতেই বিশুদ্ধ হয় এবং দানের ফলও মহৎ হয়।

(৩) নিঃস্বার্থ দানের মহান্ ফলের প্রতি অবিশ্বাসী দুঃশীল ব্যক্তি অধর্ম-লব্ধ বস্তু অপ্রসন্ন-চিত্তে দুঃশীলকে যদি দান করে, তা হলে সেদান উভয় পক্ষ হতেই অবিশুদ্ধ হয়, সেদানের ফল কিন্তু, অধিক হয় না।

(৪) নিঃস্বার্থ দানের বিপুল ফলের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাসী শীলবান ব্যক্তি ন্যায়তঃ ধর্ম-লব্ধ বস্তু প্রসন্ন চিত্তে শীলবানকে যদি দান করে, তা হলে সেদান উভয় পক্ষ হতেই বিশুদ্ধ হয়, দানের ফলও মহত্তর হয়।

(৫) নিঃস্বার্থ দানের বিপুল ফলের প্রতি সম্যক বিশ্বাসী বীত-রাগ ব্যক্তি ন্যায়তঃ ধর্ম-লব্ধ বস্তু প্রসন্ন-চিত্তে বীতরাগ ব্যক্তিকে যদি দান করে তবে সেদান আমিষ (বস্তু) দানের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ফলদায়ক হয়।"

সর্বজ্ঞ বুদ্ধের শ্রীমুখ-নিঃসৃত দানের অপূর্ব দেশনা শুনে গৌতমী অত্যধিক আনন্দিত হলেন। দানের নিগূঢ় তত্ত্ব ও পুণ্যক্ষেত্রের বৈশিষ্ট উপলব্ধি করে তিনি বিশেষ জ্ঞান লাভ করলেন। স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট দান শাস্তার নীতি বিগর্হিত। নিঃস্বার্থ দানই 'লোভ, দ্বেষ ও মোহ' এ ত্রিদোষ নাশক যেই বিশুদ্ধ-দান তৃষ্ণার নিরবশেষ নিবৃত্তির উপায় স্বরূপ হয়, আবার সেদানই স্নেহ-মমতা ও আসক্তি-রঞ্জিত হয়ে পূর্ব বন্ধনকে আরো দৃঢ়তর করে তোলে গৌতমী নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। বুদ্ধ প্রমুখ শ্রাবক সংঘই যে, অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র, তা তিনি সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করলেন।

রাজমহিষী গৌতমী তাঁর স্রোতাপন্ন-চিত্তের স্বভাব-সুলভ অনুপম প্রগাঢ় শ্রদ্ধায় অনুপ্রাণিত হয়ে বুদ্ধ প্রমুখ মহাশ্রাবক সংঘকে সেই নূতন চীবর দু'খানা দান করলেন। অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র সম্প্রাপ্ত হয়ে এদান সুবিশুদ্ধ হলো। আশাতীত পূর্ণতা প্রাপ্ত হলো তাঁর শোভন-সমুজ্জ্বল মনোবাসনা।

(সূত্র সংগ্রহ ও মধ্যম নিকায়)

২। ধর্ম দেশনার পঞ্চ নীতি—

একদা শাস্তা কৌশাম্বীর ঘোষিতারামে অবস্থান করছিলেন। সেখানে এক দিন শ্রদ্ধা-প্রবণ উপাসক-উপাসিকা সম্মিলিত মহাপরিষদে ধর্মদেশনা করছিলেন ভিক্ষু লালুদায়ী (উদায়ী)। তদ্দর্শনে মতিমান্ আনন্দ এরূপ চিন্তা করলেন---"কথা বলতে এ উদায়ীর লালা ঝরে, অস্পষ্ট তার উচ্চারণ, এক কথার সঙ্গে অন্য কথার নেই সামঞ্জস্য; মঙ্গলের কথা বলতে গিয়ে, বলে বসে অমঙ্গলের কথা; বড়ো জড়-বুদ্ধি পরায়ণ, সদ্ধর্মে অনভিজ্ঞ, অহঙ্কারী ও ঈর্ষাপরায়ণ। কী বা মাথা-মুণ্ড দেশনা করবে এ অজ্ঞ। এখানে এতো-গুলি অভিজ্ঞ পারদর্শী ভিক্ষুর বিদ্যমানে এমন মহাপারিষদে উদায়ীর দেশনা করাটা বড়ো লজ্জাজনক ব্যাপার হবে।"

এরূপ চিন্তা করতে করতে তিনি ভগবৎ সকাশে উপনীত হলেন এবং তাঁকে বন্দনান্তে এ বিষয় নিবেদন করলেন। উত্তরে বুদ্ধ বললেন---"আনন্দ, পরকে ধর্ম দেশনা করা ততো সহজ নয়। নিজকে প্রথমে পঞ্চ ধর্মে সুপ্রতিষ্ঠিত করে তারপর অতি সাবধানে ধর্ম দেশনা করতে হয়। সে পঞ্চ-ধর্ম কি কি? যথা---

প্রথম সংকল্প করতে হয়---'আনুপূর্বিক কথাই বলবো।' যেমন--দানকথা, শীলকথা, স্বর্গকথা, কামপরিভোগ জনিত দোষের কথা, দশবিধ হীন ক্লেশ-ধর্মের কথা, নৈষ্ক্রম্যের মহিমা ব্যঞ্জক কথা। এসব মূল-নিদানের প্রতি অচঞ্চল-চিত্তের একাগ্রতা সংরক্ষণ করে হৃদয়গ্রাহী প্রাঞ্জল ভাষায় ধর্ম দেশনা করতে হয়।

দ্বিতীয় সংকল্প---'পর্যায়ানুক্রমদর্শী হয়েই বলবো।' অর্থাৎ দেশনার বিষয়-বস্তু স্তরে স্তরে সজ্জিত করার মতো ক্রমিক পর্যায়ের প্রতি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রেখে পরকে ধর্ম দেশনা করতে হয়।

তৃতীয় সংকল্প---'হিতকামী হয়েই বলবো।' অর্থাৎ শ্রোতাদের ইহ-পরকালের হিত-কামনা অন্তরে পোষণ করেই কল্যাণকর ধর্ম দেশনা করতে হয়।

চতুর্থ সংকল্প---আমিষ অন্তর্গত কোনও কথা বলবো না।' অর্থাৎ লাভ-সৎকার উৎপাদনের কোনও প্রত্যাশা না রেখে এবং তদ্ভাব প্রকাশক কোনও বাক্য না বলে পরকে ধর্ম দেশনা করতে হয়।

পঞ্চম সংকল্প---'নিজকে শ্রেষ্ঠ এবং পরকে হেয় প্রতিপন্ন না করেই বলবো।' অর্থাৎ নিজের গুণ ও পরের দোষ কীর্ত্তন না করে, আক্রমণাত্মক অপ্রিয় ও রূঢ় বাক্য বর্জন করে প্রিয়, মধুর, কর্ণসুখকর ও মৈত্রীময় বাক্যে পরকে ধর্ম দেশনা করতে হয়।'

প্রজ্ঞাবান আনন্দ সুগতের এ অমৃতময়ী বাণী সানন্দে অনুমোদন ও অভিনন্দন করলেন।

(অঙ্গুত্তর নিকায়ে পঞ্চক নিপাত)

৩। বরাহ বৎস—

রাজগৃহের বেণুবন বিহার। এক দিবস. আনন্দকে সঙ্গে নিয়ে সম্বুদ্ধ ভিক্ষায় বের হলেন। কিয়দ্দুর গমনের পর গ্রাম্যপথের অনতিদূরে একটা বরাহ-পুত্রিকা বুদ্ধের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। ওটা আবর্জ্জনাময় স্থানে আহ্লাদে মল-ভক্ষণে রত আছে। তখন সুগতের প্রসন্নোজ্জ্বল মুখারবিন্দে শুচি-স্মিত হাস্য ফুটে উঠলো। তাঁর দন্তরশ্মি বিদ্যুজ্ঝলকের মতো বিচ্ছুরিত হয়ে নভোমণ্ডল দীপ্তিময় করে তুললো। ধীমান আনন্দ আলো দর্শনে বুদ্ধের হাস্যভাব পরিজ্ঞাত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"প্রভু, আপনার এ হাসির কারণ কি ?"

"আনন্দ, ওই বরাহ-পুত্রিকাটি দেখছো কি ?"

"হ্যাঁ প্রভু।"

"ওটা সুদূর অতীতে ককুসন্ধ বুদ্ধের সময়ে এক কুক্কুটী হয়ে জন্মেছিলো। কোনও এক বিহারের পার্শ্ববর্তী স্থানে ওটা রাত্রি যাপন করতো। সেখানে এক যোগাবচর ভিক্ষু সতত বিদর্শন ভাবনার বিষয় আবৃত্তি করতো। সদ্ধর্ম আবৃত্তির কোমল-মধুর স্বরের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে কুক্কুটী উৎকর্ণ হয়ে তা শুনতো। একদা সেই কর্ণ-সুখকর স্বরলহরী প্রসন্ন-মনে শুনবার সময়ে কুক্কুটীর মৃত্যু হলো। মৃত্যুর পূর্বক্ষণে যেকর্ম সম্পাদিত হয়, তা হয় শক্তিশালী কর্ম। তা'ই হয় ভবিষ্যৎ জন্মের নিয়ন্তা। কুক্কুটীর এ শোভন মরণাসন্ন কর্মের এর ভাবী-জন্মকে করল সমুজ্জ্বল। পুণ্য-সম্পদ মাত্রই মহাঋদ্ধিসম্পন্ন। সেই ঋদ্ধিময় পুণ্য কুক্কুটীকে বারাণসী রাজের কন্যা করে দিল। পুণ্যের পুরস্কার কেমন চমৎকার! ওর নামকরণ করা হলো—'উক্কবী'।

দীর্ঘ ষোড়শ বৎসর অতীত হলো। যুবতী কুমারীর যা একান্ত প্রিয় ও কাম্য, সেই বিলাস-ব্যসনের প্রতি রাজনন্দিনী কেমন স্বতঃই উদাসিনী ও অননুরাগিণী। সারাক্ষণ সে দেহতত্ত্ব নিয়েই চিন্তা করতে ভালবাসে। যেন পূর্ব জন্মের শ্রবণ করা বিদর্শন মন্ত্রের ছোঁয়াচ এখনও ওর অন্তরে লেগেই রয়েছে, যাদুমন্ত্রের কাঠি ছোঁয়ার মতো। একদিন রাজকন্যা শৌচাগারে গিয়ে দেখল—মলস্তূপে মল-কীট্ কিল্‌বিল্ করছে; বিষ্ঠার উৎকট দুর্গন্ধ।

এ ঘৃণিত-দৃশ্য ওর ভাব-প্রবণ অন্তরের ইন্ধন যোগাল। ধীরচিত্তে চিন্তা করল---"আমাদের দেহ থেকেই এহেন দুর্গন্ধময় ঘৃণিত অশুচি বের হয়েছে নয় কি? এ দেহ এরূপই পূতিময় জঘণ্য-পদার্থের ভাণ্ড! হায়! এদেহ কতো হেয়, কতো ঘৃণিত, কতো অপবিত্র! কেন তবে মানুষ এর প্রতি এতো লালায়িত, মোহগ্রস্ত? করে কেন এতে শুভচিন্তা? মানুষ এতো ভ্রমান্ধ!" এ ভাবনায় তন্ময় হলো রাজকন্যা। এরূপে 'কায়গত স্মৃতি' ভাবনায় মগ্ন হয়ে অচিরেই সে 'প্রথম ধ্যান' লাভ করল।

রাজকুমারী শেষ-নিশ্বাস পর্য্যন্ত ধ্যান-সুখেই অতিবাহিত করে মৃত্যুর পর প্রথমধ্যান-ভূমি ব্রহ্মলোকে প্রাদুর্ভূত হলো। সেখানে অবস্থান করল যথায়ুকাল। তারপর চ্যুত হলো সেখান থেকে। ভবচক্রের আবর্তনে পূর্ব-তৃষ্ণা নিবন্ধন ও সঞ্চিত কর্মের অপ্রতিহত-শক্তির প্রভাবেই সে এখন শূকরী-জন্ম গ্রহণ করেছে। কর্ম-শক্তি এরূপই বৈচিত্র্যময়ী! তৃষ্ণ যে-কর্ম রচনা করে, যে কর্ম প্রাণীকুলকে দুঃখ-সমুদ্রে নিমজ্জিত করে, সেই দারুণ তৃষ্ণা ও কর্ম থেকে আমি এখন বিনির্মুক্ত। সেই কারণেই আজ আমার প্রশান্ত-অন্তর মুক্তির অফুরন্ত আনন্দে ভর-পূর। সে আনন্দ ফুল্লাধরে ফুটিয়ে তোলে মধুর-হাসির মোহন-রেখা।"

তথাগত প্রবেদিত নিগূঢ়-তত্ত্ব শ্রবণে জ্ঞাননিষ্ঠ আনন্দের অন্তরে প্রগাঢ় ধর্ম-সংবেগ জেগে উঠ্‌ল। পরচিত্তবিদ্ বুদ্ধ আনন্দের চিত্তভাব পরিজ্ঞাত হয়ে বললেন---"আনন্দ, তৃষ্ণা যে কিরূপ ভয়ঙ্করী দোষ-দুষ্টা, এর বিশদ বর্ণনা শ্রবণ করো---

১। কর্তিত বৃক্ষের শিকড় যেমন সমূলে উৎপাটিত না হলে, পুনরায় তা অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত হয়, সেরূপ তৃষ্ণা সমূলে ধ্বংস না হলে, পুনঃ পুনঃ ভব-দুঃখের উৎপত্তি হয়।

২। ছত্রিশ-প্রকার তৃষ্ণা-স্রোত * মনোজ্ঞ বিষয়ের দিকে তীব্র-বেগে

* ষড়েন্দ্রিয় ও ছয় বিষয়কে কাম, ভব ও বিভব তৃষ্ণাবশে গ্রহণ করলে, ছত্রিশ প্রকার তৃষ্ণা হয়। ষড়েন্দ্রিয়—চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্‌বা, কায় ও মন। ছয় বিষয়—রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ ও ধর্ম।

ধাবিত হয়, তৃষ্ণা-তরঙ্গ ভ্রান্ত-জনগণকে বিপদের দিকে পরিচালিত করে।

৩। তৃষ্ণা-স্রোত সর্বদিকেই প্রবাহিত হয়, তৃষ্ণা-লতা সর্বদাই অঙ্কুরিত হয়, যখন দেখবে তৃষ্ণা-লতা অঙ্কুরিত হচ্ছে, তখনই প্রজ্ঞাস্ত্রে এর মূল ছিন্ন করবে।

৪। জীবের পক্ষে সুখ অতি মধুর বলে মনে হয়, জীবকুল সকল কিছুতেই সুখান্বেষণ করে, সুখ-স্রোতে নিমগ্ন সুখান্বেষী জনগণই জন্ম-জরা ভোগ করে থাকে।

৫। তৃষ্ণা-বিজড়িত জীবগণ জালাবদ্ধ শশকের মতো ঘূর্ণায়মান হয়। দশবিধ সংযোজন-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে সুদীর্ঘকাল পুনঃ পুনঃ দুঃখ সম্প্রাপ্ত হয়।

সে কারণেই আনন্দ, মুক্তিকামী ভিক্ষুদের পক্ষে বিরাগ প্রবণ হওয়া একান্ত কর্তব্য। সতত সে আকাঙ্ক্ষাই অন্তরে পোষণ করবে।"

মতিমান আনন্দ তথাগতের অমোঘ-বাণী অনুমোদন ও অভিনন্দন করলেন।

(ধর্মপদার্থকথা-তৃষ্ণাবর্গ)

৪। *শিক্ষণীয় পঞ্চ ধর্ম—*

মগধের অন্ধকবিন্দ নামক মহারণ্য। সেখানে এক সময় সুগত আনন্দকে এরূপ নীতি মূলক উপদেশ দিয়েছিলেন—"আনন্দ, নূতন, অচিরপ্রব্রজিত ভিক্ষুগণ যা'তে পঞ্চধর্মে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, সম্যকরূপে তা গ্রহণ করে এবং এর আশ্রয়েই অবস্থান করে, তৎপ্রতি প্রত্যেক প্রবীণ ভিক্ষুরই যেন লক্ষ্য থাকে। তাদের এরূপই উপদেশ দিতে হবে—

(১) 'বন্ধুগণ, তোমরা সুদুর্লভ মুক্তিপ্রদ সুগত-শাসনের আশ্রয় নিয়েছো, এ সুযোগে তোমরা শীলবান হও, প্রাতিমোক্ষ সংবরণ শীলে বিমণ্ডিত হও, সুসংযত হয়ে ধর্ম-বিনয়ের অনুকূলে বিহরণ করো, আচার-গোচর সম্পন্ন ও অণুমাত্র দোষেও ভয়দর্শী হয়ে শিক্ষাপদ সমূহ শিক্ষা করো, অন্তরে একথা সম্যক্‌রূপে ধারণ করে সাগ্রহে প্রতিপালন করো।

(২) বন্ধুগণ, তোমরা ষড়েন্দ্রিয়ে সংযম অবলম্বন করে বিহরণ করো এবং স্মৃতিমান্ হয়ে মনোনিবেশ সহকারে এ নীতি-ধর্ম রক্ষা করো।

(৩) বন্ধুগণ, তোমরা হবে মিতভাষী।

(৪) বন্ধুগণ, তোমরা হও অরণ্যবাসী। অরণ্যেই শয়ন করবে, অরণ্যেই অতিবাহিত করবে দিবস-যামিনী এবং অরণ্য-বিহারী হয়েই প্রতি-পালন করবে শ্রমণধর্ম।

(৫) বন্ধুগণ, তোমরা সম্যক্ বিশ্বাসী ও সম্যক্ দৃষ্টি সম্পন্ন হও।'

আনন্দ, তোমরা অচির-প্রব্রজিত তরুণ ভিক্ষুগণকে উক্তবিধ শিক্ষাই প্রদান করবে।''

ধীমান্ আনন্দ সম্বুদ্ধের উপদেশ সানন্দে অনুমোদন করলেন।

(অঙ্গুত্তর নিকায়—পঞ্চক নিপাত)

৫। *আনন্দ বোধি—*

মহাকারুণিক বুদ্ধগণ করুণাঘন অন্তরে সম্পাদন করেন জন-কল্যাণ। তাঁদের সন্ধানী-দৃষ্টি কেবল অন্বেষণে রত থাকে—কোথায় কার দুঃখ-প্রমুক্তের শুভমুহূর্ত সমুপস্থিত হয়েছে, কার জ্ঞান-চক্ষু হবে প্রস্ফুটিত, কোন্ শ্রদ্ধাবান বুদ্ধের করুণা লাভে প্রাপ্ত হবেন সুগতি। প্রয়োজন বোধে তথাগতগণ অগৌণেই সেখানে উপস্থিত হয়ে থাকেন।

একদা সুগত বুদ্ধ-কৃত্য সম্পাদন মানসে সশিষ্য বের হয়ে পড়লেন দেশ-বিদেশ পরিক্রমণ উদ্দেশ্যে। তখন শ্রাবস্তীর শ্রদ্ধাপ্রবণ নর-নারী পূজো-পচার হস্তে বিহারে এসে বুদ্ধের দর্শন না পেয়ে দুঃখিত হলেন। জেতবন বিহারে পূজার যোগ্য তেমন আর কিছুই নেই।

ধর্মপ্রাণ অনাথপিণ্ডিক চিন্তা করলেন—'জেতবন বিহারে পূজার যোগ্য এমন কিছু প্রতিষ্ঠা করা যায় কি না।'

শাস্তা কর্তব্য সম্পাদনের পর একদিন জেতবন বিহারে প্রত্যাবর্তন করলেন। অনাথপিণ্ডিক বিহারে এসে বুদ্ধ-দর্শনের পর আনন্দ স্থবিরের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন—''ভন্তে আনন্দ, তথাগত অন্যত্র গমন করলে'

জেতবন বিহার শূন্যবৎ প্রতীয়মান হয়। লোকে তখন পূজার যোগ্য অন্য কিছুই না পেয়ে দুঃখিত হয়। আপনি দয়া করে এ বিষয় ভগবানকে জানাবেন এবং জিজ্ঞাসা করবেন—এখানে তেমন শ্রদ্ধার যোগ্য চৈত্য-স্থানীয় কিছুর ব্যবস্থা করা যায় কি না।"

আনন্দ প্রধান দায়কের সঙ্গত উক্তি সানন্দে অনুমোদন করলেন। যথা-সময়ে তিনি সুগতকে এ বিষয় জানিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"প্রভু, পূজার্হ চৈত্য কয় প্রকার ?"

বুদ্ধ বললেন—"ত্রিবিধ। শারীরিক, পারিভোগিক ও উদ্দেশিক চৈত্য*।"

"প্রভু, আপনার জীবদ্দশায় কোন্ কোন্ চৈত্য পূজার্থে ব্যবহার করা যেতে পারে ?"

"আনন্দ, শারীরিক চৈত্য এখন সম্ভব নয়, তথাগতের পরিনির্বাণান্তে তা সম্ভব। উদ্দেশিক ও পারিভোগিক চৈত্য স্থাপন করা যায় বটে, কিন্তু উদ্দেশিক চৈত্য তত সহজ সাধ্য নয়। তথাগতের উপভোগ্য 'মহা-বোধিতরু' বুদ্ধের জীবদ্দশায়ও চৈত্য এবং পরিনির্বাণের পরও চৈত্য।"+

"প্রভু, আপনি অন্যত্র প্রস্থান করলে জেতবন বিহার নিতান্ত অশরণ হয়ে পড়ে। জনসাধারণ পূজার যোগ্য আর কিছুই পায় না। তাই প্রভু, মহাবোধিতরু হতে বীজ আহরণ করে জেতবনদ্বারে বপন করার ইচ্ছা করেছি।"

আনন্দকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে বুদ্ধ বললেন—"সাধু, সাধু আনন্দ, অতি উত্তম কথা। বেশ, তুমি বোধিতরুবীজ বপন করো। তোমার এ পুণ্যাবদান জেতবনে আমার নিয়ত অবস্থান স্বরূপই হবে।"

সুগতের অনুমতি পেয়ে আনন্দ স্থবির সানন্দে এ শুভ সংবাদ অনাথ-পিণ্ডিক, বিশাখা ও কোশলরাজ প্রসেনজিত প্রমুখ উপাসক ও উপাসিকাগণকে

---

* শারীরিকচৈত্য—শারীরিকধাতু (পূতাস্থি), পারিভোগিকচৈত্য—বোধিতরু, উদ্দেশিক চৈত্য—বুদ্ধের প্রতিমূর্তি।

+আনন্দ যে, বোধিতরু রোপণ করবেন, বুদ্ধ ইহা অভিজ্ঞান প্রভাবে জেনেছেন। তাই তিনি বোধিতরু সম্বন্ধে জোর দিয়েই বললেন, এতে যেন আনন্দের উৎসাহ বর্ধিত হয়।

জানালেন। তিনি জেতবনদ্বারে বৃহৎ এক গর্ত খনন করিয়ে পূজার্হ স্থবির মহামৌদ্‌গল্যায়নকে অনুরোধ করলেন, বোধিতরু থেকে একটা উত্তম ফল এনে দেবার জন্য। তিনি সানন্দে স্বীকৃত হলেন এবং আকাশ-মার্গে গিয়ে বোধি-প্রাঙ্গণে অবতরণ করলেন। ঠিক সে মুহূর্তেই বৃন্ত-চ্যুত হয়ে একটা ফল পতিত হচ্ছিল। স্থবির তা আপন চীবরে ধারণ করলেন। তিনি ফলটি এনে আনন্দ স্থবিরের হস্তে দিলেন। স্থবির হর্ষোৎফুল্ল অন্তরে তখনই কোশলরাজ প্রমুখ সকলের নিকট সংবাদ পাঠালেন---"আজই বোধি-তরুবীজ বপন করা হবে।"

অপরাহ্নে রাজা সর্ববিধ উপকরণ সহ জেতবন বিহারে উপস্থিত হলেন। অনাথপিণ্ডিক, বিশাখা ও অন্যান্য সকলেই হৃষ্টমনে সমাগত হলেন। খনিত গর্তে একটা সুবৃহৎ কটাহ স্থাপন করে তা পূর্ণ করা হলো বিবিধ সারময় পদার্থে। স্থবির আনন্দ নৃপতির হস্তে বোধিতরুফল প্রদান করে উৎফুল্ল কণ্ঠে বললেন---"মহারাজ, এ বোধি-বীজ আপনিই বপন করুন।"

কোশলরাজ চিন্তা করলেন---"এ রাজ্য তো চিরকাল আমার হাতে থাকবে না, এর কি যথাযথ সৎকার করতে পারবো? বরং অনাথপিণ্ডিকই এ বীজ রোপণ করুক।" এ চিন্তার পর রাজা ফলটি মহাশ্রেষ্ঠীর হাতে দিলেন। শ্রেষ্ঠীপ্রবর এ গরিষ্ঠ পবিত্র ফলটি অতি শ্রদ্ধা সহকারে মস্তকে স্পর্শ করলেন। অতঃপর কটাহের গন্ধোদক-সিক্ত মৃত্তিকা আলোড়ন করে তাঁর পুণ্যময় হস্তে উহাতে বপন করলেন সেই মহীয়ান ফল। বপন করা মাত্রই নয়ন-গোচর হলো অপূর্ব বিস্ময়কর ব্যাপার। লাঙ্গল-ঈশ প্রমাণ অঙ্কুর উদ্‌গত হয়ে দেখতে দেখতে মুহূর্তেই তা মহামহীরুহে পরিণত হলো। বিস্ময়ে স্তম্ভিত হলো দর্শকবৃন্দ। এ বোধি-পাদপ উচ্চতায় হলো পঞ্চাশ হস্ত এবং চতুঃপার্শ্বে চারটি, ঊর্ধ্বদিকে একটি মহাশাখা বিস্তার লাভ করল। সেদিনই শ্রেষ্ঠ বনস্পতির আকার ধারণ করল এ মহিমা-মণ্ডিত বোধিতরু। আহা, কী আশ্চর্য, কী চমকপ্রদ অলৌকিক এ চাক্ষুষ ঘটনা।

কোশলরাজ প্রমুখ সমবেত সজ্জনমণ্ডলী মনোরম সৌরভবিশিষ্ট নীল-পদ্ম-শোভিত ও গন্ধোদকপূর্ণ অষ্টশত স্বর্ণ-রৌপ্যময় ঘট বোধিতরুর চতুর্দিকে সজ্জিত করে সশ্রদ্ধ অন্তরে পূজা করলেন। পরে বোধিতরুর চারপাশে সুদৃশ্য বেদিকা, তোরণ ও প্রাচীর-পরিক্ষেপ করা হলো। এরূপে সর্বতো-ভাবে বোধিদ্রুমের মহাসংস্কার করা হয়েছিল।

এ সময়ে স্থবির আনন্দ তথাগতকে অনুরোধ করলেন ---"প্রভু ভগবন্, আপনি বোধিতরুমূলে যে ধ্যানে নিবিষ্ট হয়ে সর্বজ্ঞতা জ্ঞানলাভ করে-ছিলেন, এটির মূলেও তদনুরূপ ধ্যানে অভিনিবিষ্ট হতে আপনাকে প্রার্থনা জানাচ্ছি। প্রভু, এতে সূচিত হবে জগতের মহাকল্যাণ।"

সুগত সবিস্ময়ে বললেন---"আনন্দ, তুমি কি বলছো! অবিচলিত বোধিপালঙ্কে যে ধ্যানে উপগত হয়ে আমার অধিগত হয়েছে সম্বুদ্ধত্ব জ্ঞান, সেরূপ মহাপ্রভাবশালী ধ্যান-ভার ধারণ করার মতো পৃথিবীতে তেমন আর অন্য কোনও প্রদেশ দেখছি না। বোধি পালঙ্কের গুণ অসাধারণ। অতীত ও ভবিষ্যতের অনন্ত বুদ্ধ যে পালঙ্কে ধ্যানস্থ হয়ে অনুত্তর জ্ঞানের পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছেন এবং হবেন, সে-পালঙ্ক, সেস্থান ও সে-বজ্রাসন ব্যতীত সমগ্র জগতে এমন অন্য কোনও স্থান বিদ্যমান নেই, যে স্থান সম্বুদ্ধত্ব জ্ঞান-প্রদায়ক ধ্যান-স্থান হতে পারে।"

আনন্দ বিস্ময়পূর্ণ কণ্ঠে বললেন---"আশ্চর্য, আশ্চর্য ভন্তে, এমনই অসাধারণ গুণ-মণ্ডিত বোধি-পালঙ্ক! তা হলে প্রভু, এ প্রদেশ যেরূপ ধ্যান-ভার ধারণে সমর্থ হয়, সেরূপ সমাপত্তি ধ্যানেই আপনি উপগত হন, এই আমার একান্ত প্রার্থনা।"

আনন্দের অনুরোধে এবং নিজেরও কর্তব্য বোধে এ অভিনব বোধি-তরুমূলে তথাগত একরাত্রি সমাপত্তি ধ্যানে অভিনিবিষ্ট হলেন। এ শুভ সংবাদ স্থবির আনন্দ কোশলরাজ প্রভৃতি সকলকে জ্ঞাত করালেন। রাজা-প্রজা সম্মিলিত হয়ে এস্থানে 'বোধি মেলা' নামে এক মহাউৎসবের অনুষ্ঠান করলেন। স্থবির আনন্দের ঐকান্তিকতায় এবং উৎসাহ ও প্রচেষ্টায় এ

বোধিতরু রোপিত হয়েছিল বলেই এ বোধিদ্রুম 'আনন্দ বোধি' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল।

দুই

আনন্দের প্রভাব দর্শনে ভিক্ষুগণ চমৎকৃত হলেন। তাঁরা বলতে লাগলেন—"আনন্দের গুণ অসামান্য, তিনি বড়ো পুণ্যবান, তাঁর মহিমা বিস্ময়কর! সুগতের বিদ্যমান অবস্থাতেই তিনি বোধিতরু রোপণ করালেন এবং এর পূজা-সৎকারেরও ব্যবস্থা করালেন!"

এ আলোচনা শুনে বুদ্ধ বললেন—"ভিক্ষুগণ, আনন্দ যে পুণ্যবান, তা অতি সত্যকথা। কেবল এখন নয়, সুদূর অতীতেও সে বোধি-পালঙ্ককে রাজোচিত সম্বর্ধনা ও মহাসমারোহে পূজা-সৎকার করেছিল। শোনো ভিক্ষুগণ, তার অতীতের সেই অপূর্ব কাহিনী—

অতি পুরাকালে কলিঙ্গ রাজ্যের রাজধানী দন্তপুরে এক মহাপুণ্যবান চক্রবর্তী রাজা রাজত্ব করতেন। তাঁর নাম ছিল—কলিঙ্গ। কলিঙ্গ-ভারদ্বাজ নামক এক কুলীন ব্রাহ্মণ ছিলেন রাজার কুলগুরু। তিনি ছিলেন শাস্ত্রবিশারদ, জ্ঞানবান, বিচক্ষণ ও রাজার অর্থধর্মানুশাসক। পুণ্য-বিভূতি বিমণ্ডিত রাজচক্রবর্তী কলিঙ্গ ছিলেন সপ্তরত্নের অধীশ্বর। যথা—চক্ররত্ন, হস্তিরত্ন, অশ্বরত্ন, মণিরত্ন, স্ত্রীরত্ন, গৃহপতিরত্ন ও পরিণায়করত্ন। সসাগরা মহাভূভাগের একাধিপত্য লাভ করে রাজচক্রবর্তী কলিঙ্গ যথাধর্ম রাজ্য শাসনে প্রবৃত্ত হলেন।

একদা রাজাধিরাজ কলিঙ্গ অন্যত্র গমনের ইচ্ছায় তাঁর মনোরম উড্ডয়ন ক্ষম ঐরাবত হস্তিরত্নে আরোহণ করে সপারিষদ আকাশ-মার্গে যাচ্ছিলেন। তাঁরা গন্তব্যপথে যখন সম্প্রাপ্ত হলেন পৃথিবীর নাভীস্থান বুদ্ধগণের জয়পালঙ্ক, তখন গজরাজ পালঙ্কের উপর দিয়ে আর অগ্রসর হতে পারল না। রাজা বারবার চেষ্টা করলেন করিবরকে পরিচালিত করতে, কিন্তু তাঁর সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হলো।

রাজার পার্শ্বে ছিলেন রাজগুরু ভারদ্বাজ। তিনি চিন্তা করলেন—

"আকাশে তো কোনও আবরণ নেই, অথচ হস্তী যেতে পাচ্ছে না, এর কারণ কি? এ যে বড়ো বিস্ময়ের বিষয়! নিশ্চয়ই এখানে কোনও কারণ নিহিত আছে। এর রহস্য আমাকেই উদ্‌ঘাটন করতে হবে।" এ চিন্তা করে তিনি ভূতলে অবতরণ করলেন এবং অতি নিপুণতার সহিত সে স্থান পর্যবেক্ষণ করলেন। জ্ঞান পরিচালনা করে তিনি সম্যক্ অবগত হলেন—'এ ভূভাগ পুণ্যতীর্থ বোধিপালঙ্কের স্থান'। এর চিহ্ন স্বরূপ তিনি দেখতে পেলেন—স্থানটা বালুকাকীর্ণ, তৃণহীন এবং চারপাশের তৃণ-লতা দক্ষিণাবর্তে প্রদক্ষিণ করে তদভিমুখী হয়েই রয়েছে। সবিস্ময়ে ভাবলেন তিনি—"এ পূত-স্থান অসাধারণ, পুণ্য-বিজড়িত! পারমী-ধর্মের পূর্ণতা প্রাপ্ত বোধিসত্ত্বগণ এ পবিত্র স্থানেই তৃষ্ণাক্ষয় করে অধিগত হন সম্বুদ্ধত্ব জ্ঞান। এমনই মহত্তম ও গরিষ্ঠ এ স্থান! এর উপর দিয়ে গমনাগমন করা দেবতারও অসাধ্য!" এ চিন্তা করে লুটিয়ে পড়ে তিনি পুনঃ পুনঃ বন্দনা করলেন এ অসামান্য পুণ্য-স্থানকে।

অতঃপর তিনি দ্রুত রাজ-সকাশে উপনীত হয়ে ত্বরিত কণ্ঠে বললেন—"মহারাজ, অবতরণ করুন, হস্তী থেকে অবতরণ করুন; এ ভূভাগেই বোধি-পালঙ্ক বিরাজ করছে। এ পূত-পালঙ্ক অসাধারণ পুণ্য-মহিমা মণ্ডিত। এ পালঙ্কেই সমাসীন হয়ে অন্তিম বোধিসত্ত্বগণ অবিদ্যা-তিমির বিতাড়িত করে লোকোত্তর দিব্যালোকে উদ্ভাসিত হন, অধিগত হন সম্বোধিজ্ঞান! এ স্থানের তুলনায় সসাগরা বিশাল মেদিনীও তুচ্ছাদপি তুচ্ছ! এটিই সর্বোত্তম পূজার্হ পূত-স্থান! এ ভূভাগের উপর দিয়ে গমন করার কারও শক্তি নেই; এমন কি দেবতারও নেই। আপনার করিবর কিছুতেই যেতে পারবে না। যতই একে অঙ্কুশ-বিদ্ধ করুন না কেন, এক পদও অগ্রসর হবার এর শক্তি নেই।"

রাজেন্দ্র দ্বিজবরের এ কথার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারলেন না এবং বিশ্বাসও করলেন না। অপিচ, তিনি সুতীক্ষ্ণ অঙ্কুশে পুনঃ পুনঃ বিদ্ধ করে হস্তিরাজকে জর্জরিত করতে লাগলেন। এ দারুণ যন্ত্রণা করিবরের অসহ্য হলো; শুণ্ড তুলে মর্মভেদী কাতর বৃংহিত-নাদ করতে লাগল। পরি-

শেষে হস্তিরাজ গ্রীবা অবনত করে আকাশেই বসে পড়ল এবং সে মুহূর্তেই প্রাণ ত্যাগ করল। রাজা কিন্তু, জানতে পারলেন না হস্তীর মৃত্যুভাব। মৃত-হস্তীর পৃষ্ঠোপরিই তিনি আরূঢ় হয়ে আছেন এবং বারম্বার অঙ্কুশ বিদ্ধই করছেন।

সুবিজ্ঞ রাজগুরু গজবরের মৃতাবস্থা বুঝতে পেরে দ্রুত কণ্ঠে বললেন---"মহারাজ, হস্তীবরের মৃত্যু হয়েছে, অন্য হস্তীতে আরোহণ করুন।"

একথা শুনেই রাজেন্দ্র সন্ত্রস্ত হলেন। তিনি ভীত-চকিত নেত্রে দেখলেন, সত্যই করিরাজের মৃত্যু হয়েছে। তখনই ত্রাসিত অন্তরে তিনি অন্য হস্তীর প্রত্যাশা করলেন। মহারাজের মহাপুণ্য-প্রভাবে উপোসথ হস্তিকুল থেকে অপর একটি শ্বেতবর্ণ মনোহর ঐরাবত এসে রাজাকে পৃষ্ঠদান করল। এর পৃষ্ঠে আরোহণ করা মাত্রই মৃত হস্তীর কলেবর ভূতলে পতিত হলো। অপূর্ব পুণ্য-ঋদ্ধি সম্পন্ন এই রাজচক্রবর্তী এরূপই অসাধারণ পুণ্যবান ছিলেন।

বিস্ময়ে স্তম্ভিত হলেন রাজাধিরাজ। একি সংঘটিত হলো, অভূতপূর্ব আশ্চর্য ব্যাপার! সবিস্ময়ে তিনি যথা সত্বর সপারিষদ আকাশ থেকে ভূতলে অবতরণ করলেন। বোধি-পালঙ্ক দেখতে লাগলেন তিনি বিস্ময়পূর্ণনেত্রে। তন্নিদর্শনও পর্যবেক্ষণ করলেন বিশেষরূপে। নরেন্দ্র এখন সম্যক্ উপলব্ধি করলেন কুলগুরুর সমস্ত কথার গুরুত্ব ও সত্যতা। দ্বিজবরের বিচার-বুদ্ধি, বিচক্ষণতা ও বিশেষজ্ঞতার সবিশেষ পরিচয় পেয়ে মহারাজ চমৎকৃত হলেন। গুরুর প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধায় তাঁর অন্তর ভরে উঠল। আনন্দাতিশয্যে তিনি বলে উঠলেন---"মহামহিম্ দ্বিজশ্রেষ্ঠ, আজ আমি বুঝতে পেরেছি---আপনিই সম্বুদ্ধ, আপনিই সর্বজ্ঞ-সর্বদর্শী"!

তত্ত্বজ্ঞ কলিঙ্গ-ভারদ্বাজ রাজেন্দ্রের এরূপ অন্যায় প্রশংসার প্রতিবাদকল্পে গুরু-গম্ভীর স্বরে বললেন---"নৃপেন্দ্র, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে, আমায় যেরূপ বিশেষণে বিশেষিত করলেন, আমি সেরূপ বিশেষণের বিন্দুমাত্রও উপযুক্ত নই। আমার নিকট সে গুণের কণামাত্রও বিদ্যমান নেই। নিদর্শন দেখেই আমি ভবিষ্যৎ-বাণী বলে থাকি মাত্র। তাও সীমাবদ্ধ, কেবল যা শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

মহারাজ, সম্যক্ সম্বুদ্ধগণ ত্রিকালজ্ঞ। তাঁরাই সর্বজ্ঞ ও সর্বদর্শী। সমন্তচক্ষু তথাগতদের লক্ষণ বা নিমিত্তের প্রয়োজন হয় না। তাঁরাই সংসার-ত্যাগী, ব্রহ্মচারী, বিদ্যা ও আচরণ সম্পন্ন। সম্যক্ সম্বুদ্ধের তুলনায় অসীম মহাসমুদ্রের কণা পরিমাণ বালুকা হতেও আমি নগণ্য। এ বোধি-পালঙ্কই সর্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভের একমাত্র স্থান। এ পালঙ্ক অদ্বিতীয় অসাধারণ।" এতদূর বলে মহাসত্ত্ব বোধি-পালঙ্ককে বারত্রয় বন্দনা করলেন

বোধি-পালঙ্ক ও সম্বুদ্ধের গুণাবলী শ্রবণে নরেন্দ্র বিস্ময়াবিষ্ট হলেন। প্রগাঢ় শ্রদ্ধার আকর্ষণে রাজার এরূপ বলবতী ইচ্ছার সঞ্চার হলো যে, অসাধারণকে তিনি অসাধারণ ভাবেই পূজা, সৎকার ও শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করবেন।

মহাপুণ্যঋদ্ধি সম্পন্ন চক্রবর্তী রাজা যিনি, তাঁর সাধারণ ইচ্ছা কখনও অপূর্ণ থাকে না। তাঁর ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে সমগ্র জগতের রাজা-প্রজা বোধিপালঙ্কের স্থানে সমবেত হলেন। উৎকৃষ্টতম পূজোপকরণ সংগ্রহ করা হলো। মহাপারিষদ পরিবৃত হয়ে রাজাধিরাজ যথাযোগ্য চমৎকারিণী ঐশ্বর্য-লীলায় সাতদিন ব্যাপী অহর্নিশ বোধি-পালঙ্ককে পূজা করলেন। পূজাড়ম্বর বর্ণনাতীত। ষাটি হাজার শকট নিযুক্ত করা হয়েছিল পূজোপকরণ আহরণ কল্পে। মহাপূজার পরিসমাপ্তির পর রাজেন্দ্র অফুরন্ত আনন্দময় পুণ্য-স্মৃতি নিয়ে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করলেন।

তখন আনন্দ ছিল রাজচক্রবর্তী কলিঙ্গ, আমি ছিলাম কলিঙ্গ-ভারদ্বাজ।"

(কলিঙ্গ বোধি জাতক—৪৭৯)

৬। রাজান্তঃপুরিকার দেশক পদে মনোনীত—

একদা কোশলরাজের অন্তঃপুরিকাগণ আক্ষেপ করে বললেন—"হায়, আমাদের কী দুর্ভাগ্য বুদ্ধদর্শন ও ধর্ম শ্রবণ থেকে আমরা বঞ্চিতা। শুনেছি, মানব-জীবন না কি দুর্লভ; ততোধিক দুর্লভ বুদ্ধোৎপত্তি। বিহারে গিয়ে আর্যদের একটু বন্দনা করারও অবকাশ পাই না, দান-শীলাদি পুণ্যার্জন তো দূরের কথা। অপরাধীর মতো অহোরাত্র কেবল অবরুদ্ধ হয়েই আছি।

অন্ততঃ একজন ভিক্ষুও এসে যদি আমাদের ধর্মবাণী শোনাতেন, তাও সৌভাগ্য মনে করতাম। রাজাকে বলে দেখবো।"

রাজমহিষীরা রাজসদনে তাঁদের প্রার্থনা নিবেদন করলেন। নৃপতি রাণীদের সদিচ্ছার কথা শুনে সন্তুষ্ট হয়ে বললেন—"অতি উত্তম কথা, আমি এর ব্যবস্থা করবো। তোমরা কোন্ ভিক্ষুর ধর্মদেশনা শুনতে ইচ্ছা করো?"

"শাস্ত্র-বিশারদ মহামান্য আনন্দ স্থবিরকেই আমরা পছন্দ করি; তাঁকেই আমরা মনোনয়ন করছি।"

সেদিনই নৃপতি বুদ্ধ সমীপে উপনীত হয়ে বন্দনান্তে বললেন—"ভগবন্, আমার অন্তঃপুরের মহিলাগণ প্রতিদিন ধর্মোপদেশ শুনতে আগ্রহান্বিত হয়েছে। আনন্দ স্থবিরকেই দেশকরূপে তারা পেতে চায়। প্রভু, দয়া করে স্থবিরকে যদি অনুজ্ঞা প্রদান করেন, অন্তঃপুরিকাদের মনোবাসনা পূর্ণ হবে।"

সুগত রাজার প্রার্থনা পূর্ণ করলেন এবং স্থবিরকে তৎসম্বন্ধে আদেশ ও উপদেশ দিলেন। তখন থেকে স্থবির আনন্দ প্রত্যহ রাজান্তঃপুরে গিয়ে পুরমহিলাগণকে ধর্মোপদেশ দিতে লাগলেন। তাঁর মর্ম-স্পর্শী অপূর্ববাণী শুনে রাজাঙ্গনাগণ ত্রিরত্নের প্রতি আকৃষ্ট ও অভিভূত হয়ে পড়লেন। তাঁদের চিত্ত হলো শ্রদ্ধাপ্রবণ, দান ও শীলে হলো নিষ্ঠাবান্। আনন্দের প্রতিও তাঁরা অত্যধিক ভক্তিমতী হলেন।

(মহাসার জাতক—৯২)

৭। *উপায় কুশলতা*—

একদা ঘটনাচক্রে কোশলরাজের মহামূল্য চূড়ামণি অপহৃত হলো। তদ্ধেতু নৃপবর অত্যধিক দুঃখিত হয়ে কর্মচারীকে আদেশ দিলেন—"অন্তঃপুরে যারা আসা-যাওয়া করে, তাদের অবরুদ্ধ করে অনুসন্ধান করা হোক।"

রাজার আদেশ পেয়ে কর্মচারীরা অন্তঃপুরের মহিলাদের পর্যন্ত আটক রেখে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হলেন। এহেতু সকলেই মনঃক্ষুণ্ন হলেন এবং অপমান বোধ করলেন। আনন্দ স্থবির সেদিন রাজভবনে এসে দেখলেন

রাণীদের বিষণ্ণ বদন। অন্যদিন স্থবিরকে দেখে যেরূপ প্রফুল্ল হয়ে ওঠেন, আজ কিন্তু তাঁদের সে অবস্থা নেই। সকলেই **বিমর্ষ**। স্থবির ঔৎসুক্যে জিজ্ঞাসা করলেন—"আজ আপনারা এমন বিষণ্ণ কেন?"

তাঁরা ক্ষোভস্বরে বললেন—"ভন্তে, মহারাজের চূড়ামণি হারাণো গেছে। একারণে কর্মচারীরা মেয়েদের পর্যন্ত আটক রেখে জ্বালাতন করছেন। আমাদের অদৃষ্টে কি আছে জানি না।"

স্থবির আশ্বাস বাক্যে বললেন—"তজ্জন্য আপনারা চিন্তা করবেন না। আমিই এর একটা উপায় করবো।"

আনন্দ রাজসকাশে উপনীত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"মহারাজ, শুনলাম, আপনার চূড়ামণি না কি হারাণো গেছে?"

"হ্যাঁ ভন্তে।" বিমর্ষ মুখে উত্তর দিলেন রাজা।

"তা কি পাওয়া যাবে?"

"এখনও তো পাওয়া গেলো না। চেষ্টারও কোনো ত্রুটি হচ্ছে না।"

"রাজন্, মণি ফেরত পাবার সহজ উপায় আছে।"

"কোন্ উপায় ভন্তে?" ঔৎসুক্যে জিজ্ঞাসা করলেন রাজা।

"মহারাজ, সন্দেহ ভাজন যারা, তাদের প্রত্যেককেই এক একটা করে খড়ের গুলিকা অথবা কাঁচা মাটির পিণ্ড দেবেন। যে কোনও একটা স্থান নির্দিষ্ট করে সকলকে নির্দেশ দেবেন যে, তারা যেন প্রাতে এসে যথা স্থানেই এসব রেখে যায়। প্রথম দিন পাওয়া না গেলেও, দ্বিতীয়-তৃতীয় দিনও দেখবেন। যে চুরি করেছে, নিশ্চয়ই সে এর মধ্যে দিয়ে রেখে যাবে। মণি ফেরত পাবার এটাই প্রকৃষ্ট উপায়।"

স্থবিরের পরামর্শমতো কাজ করা হলো। কিন্তু, সফলকাম হলেন না। আনন্দ স্থবির এসে জিজ্ঞাসা করলে রাজা বললেন—"ভন্তে, মণি এখনও পাওয়া গেল না।"

"মহারাজ, আর একটা উপায় আছে। প্রাঙ্গণের নিভৃত স্থানে একটা বৃহৎ জলপূর্ণ কুম্ভ রেখে দেবেন। এর চতুর্দিকে পর্দা বেষ্টন করে নির্দেশ

দেবেন---এক একজন পর্দাভ্যন্তরে প্রবেশ করে কুম্ভে যেন হস্ত ধৌত করে যায়।''

এ পরামর্শ মতো কাজ আরম্ভ হলো। এবার কিন্তু, মণিচোর মহা-চিন্তাগ্রস্ত ও ভীত হয়ে পড়ল। চিন্তা করল---''বুদ্ধের প্রিয় সেবক বিচক্ষণ আনন্দ যখন এ বিষয়ে হাত দিয়েছেন, আর কি রক্ষা আছে? এর বিহিত বিধান তিনি নিশ্চয়ই করবেন। দিব্যজ্ঞানী বুদ্ধ পর্যন্ত যাঁর অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারেন না, তাঁর পক্ষে অসাধ্য কি আছে? কিন্তু, তিনি মহামনা, তাই চোরের হিতৈষী হয়েই নিপুণতার সহিত এরূপ উপায় উদ্ভাবন করেছেন। হাতেনাতে ধরা না পড়তেই জলকুম্ভে মণি রেখে দেওয়াটাই হবে মঙ্গল দায়ক।'' এ চিন্তা করে পরদিন চোর কুম্ভে মণি প্রক্ষেপ করল।

হারাণো মণি পেয়ে রাজা আনন্দিত হলেন। স্থবিরের এরূপ উপায়-কুশলতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় পেয়ে রাজা ও রাজপরিষদ চমৎকৃত হলেন। সকলেই স্থবিরের ভূয়সী প্রশংসা করতে লাগলেন। উৎফুল্ল হলেন অন্তঃপুরের মহিলাগণ। তাঁরা আহ্লাদবাক্যে বলতে লাগলেন---''মহামান্য আনন্দ স্থবির বিচক্ষণ বুদ্ধিমান্, তাঁর কৃপাতেই আজ আমরা অশান্তি ও অপমান থেকে রক্ষা পেয়েছি।'' সেদিন হতে আনন্দের প্রতি রাজমহিলাদের শ্রদ্ধা অধিকতর বৃদ্ধি পেল।

(মহাসার জাতক—৯২)

৮। বস্ত্র লাভ---

ধীমান্ আনন্দ রাজপুরাঙ্গনাগনকে প্রত্যহ যথারীতি শান্তি-দায়িনী ধর্মবাণী পরিবেষণ করতে লাগলেন। তাঁরা সাগ্রহে শোনেন--- স্থবিরের মুখ-নিঃসৃত সুন্দর-মধুর প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণিত সত্য-ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব। শুনে তাঁরা হন আনন্দিত, উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত।

একদা কোশলাধিপতি সহস্রখানা মহার্ঘ বস্ত্র লাভ করলেন। তা হতে

তিনি অন্তঃপুরের পঞ্চশত মহিলাকে তৎসংখ্যক বসন প্রদান করলেন। নূতন উত্তম-বসন পেয়ে তাঁরা সুখী হলেন। তাঁদের দান-চেতনা উৎপন্ন হলো; ধর্মগুরু আনন্দ স্থবিরকেই তাঁরা দান করবেন। পরদিবস স্থবির উপস্থিত হলে, তাঁরা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সেই নূতন বস্ত্র এনে স্থবিরকে দান করলেন। এ বলে অনুরোধ করলেন--- "প্রভু, দয়া করে এ বস্ত্র গ্রহণ করুন। আপনার ধর্মদান অতুলনীয়; ধর্মদানের পক্ষে এদান অতি অকিঞ্চিৎকর।"

পুণ্যবান আনন্দ জন্মান্তরে উপচিত উদার-দানের মহাপুণ্য-প্রভাবে এক-ক্ষণেই লাভ করলেন শ্রেষ্ঠতম পঞ্চশত নূতন বস্ত্র। বস্ত্র-দানের অপূর্বফল সম্বন্ধে বর্ণনা করলেন তিনি। দেশনা শুনে পুরমহিলাগণ চমৎকৃত ও উৎসাহিত হলেন।

পর দিবস প্রাতরাশের সময় কোশলরাজ অন্তঃপুরে এসে লক্ষ্য করলেন--রাণীদের মধ্যে কেউই নূতন বস্ত্র পরিধান করেননি। রাজা কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন---"তোমাদের প্রত্যেককেই এক একখানা নূতন বস্ত্র দেওয়া হয়েছে, অথচ কেউই তা ব্যবহার করছো না, এর কারণ কি?"

প্রধানা মহিষী প্রসন্ন মুখে উত্তর দিলেন---"মহারাজ, তা সবই আমরা পূজনীয় আনন্দকে দান করেছি।"

রাজা সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলেন---"সবই দান করেছো?"

"হ্যাঁ স্বামিন্।"

"তিনি কি সবই নিয়ে গেছেন?"

"হ্যাঁ মহারাজ।"

তখন নৃপতির চোখে-মুখে ফুটে উঠল অকুণ্ঠবিস্ময়। কুঞ্চিত হলো ভ্রূযুগল। ঈষৎ গ্রীবা ভঙ্গীতে অন্তর্গূঢ় চাপা গর্জনে বললেন---"সমস্তই? কি আশ্চর্য, তিনি এতো বস্ত্র করবেন কি! বুদ্ধ ভিক্ষুদের জন্য ব্যবস্থা করেছেন ত্রিচীবর। তবে কেন তিনি এতোগুলি বস্ত্র নিয়ে গেলেন? ব্যবসা করবেন না কি?" আনন্দের প্রতি রাজার অন্তর বিদ্রোহী হয়ে উঠল। প্রাতরাশে তাঁর আর মন বসলো না। আসন ছেড়ে ওঠে পড়লেন

তিনি। সিদ্ধান্ত করলেন---"বিহারে গিয়ে স্থবিরকে এ বিষয় জিজ্ঞাসা করবেন।"

তখনই নৃপতি জেতবন বিহারে এসে প্রথমে স্থবিরের সঙ্গেই সাক্ষাৎ করলেন। প্রিয়দর্শন আনন্দের শান্ত, প্রসন্ন ও স্বাচ্ছন্দ্যভাব দর্শনে রাজার সংক্ষুব্ধ অন্তরে অনেকটা সৌম্যভাব এসে পড়ল। তিনি স্থবিরকে বন্দনার পর একান্তে উপবেশন করে জিজ্ঞাসা করলেন---"ভন্তে, আমার অন্তঃপুরের মহিলারা আপনার নিকট ধর্ম শ্রবণ করে তো?"

আনন্দ স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন---"হ্যাঁ মহারাজ।"

"কেবল কি তারা ধর্ম শ্রবণ করে, না কি কোনো কোনো সময় দানও করে?"

"হ্যাঁ মহারাজ, তাঁরা পাঁচশ'খানা অতি মূল্যবান বস্ত্র দান করেছেন।"

তখন রাজার মুখে বিষাদ-রেখা ফুটে উঠল। চোখে চকিতে খেলে গেল বিদ্যুদ্বহ্নির চমক্। তখনই আবার নিজকে সংযত করে বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন---"সবই কি আপনি গ্রহণ করেছেন?"

স্থবির শান্ত স্বরে বললেন---"হ্যাঁ মহারাজ, সবই গ্রহণ করেছি।"

"বুদ্ধ ভিক্ষুদের জন্য কেবল ত্রিচীবর ব্যবস্থা করেছেন, নয় কি?"

"হ্যাঁ মহারাজ, কেউ যদি ততোধিক দান করে, তা গ্রহণ না করার তেমন কোনও নিষেধ আজ্ঞা নেই। যেসব ভিক্ষুর চীবর জীর্ণ হয়েছে, তাঁদের জন্যই এসব বস্ত্র গ্রহণ করেছি।"

"যাঁদের এ বস্ত্র দেবেন, তাঁদের পুরাতন জীর্ণ-চীবর কি করবেন?"

"তা দিয়ে পরিধান-বস্ত্র প্রস্তুত করা হবে।"

"তাঁদের পুরাতন পরিধান-বস্ত্র কি করবেন?"

"তা দিয়ে শয্যাস্তরণ তৈয়ার করা হবে।"

"পুরাতন আস্তরণ কি করবেন?"

"তদ্বারা বসবার আসন প্রস্তুত করা হবে।"

"পুরাতন আসন কি করবেন?"

"তদ্বারা পাপোষ প্রস্তুত করা হবে।"

"পুরাতন পাপোষ কি করবেন?"

আনন্দ তখন স্মিত-মধুর হাস্যে বললেন---"নৃপমণি, তাও নষ্ট করা হয় না। দায়কের শ্রদ্ধা-প্রদত্ত বস্তু নষ্ট করা বিধেয় নয়। তা কেটে টুক্‌রা টুক্‌রা করা হয়, সেসব মিশানো হয় মাটির সঙ্গে, তদ্বারা সম্পাদন করা হয় দেওয়াল অথবা ঘরের প্রলেপের কার্য।"

রাজা তখন চমৎকৃত হলেন। মুগ্ধ-বিস্ময়ে বললেন ---"তাই না কি ভন্তে! তা হলে আপনাদের যা কিছু দান করা হয়, তার কিছুই নষ্ট করেন না, এমন কি জীর্ণ পাপোষ পর্যন্তও না।"

"হ্যাঁ মহারাজ, দায়কের শ্রদ্ধা-প্রদত্ত বস্তু কিছুতেই আমরা নষ্ট হতে দিই না।"

জ্ঞানবান আনন্দের সারগর্ভ উত্তরে নৃপতি অত্যধিক সন্তুষ্ট হলেন। তাঁর কঠোরতা ও বিক্ষুব্ধতা অন্তর্হিত হয়ে চিত্তভাব শান্ত, স্নিগ্ধ ও মধুর হয়ে গেল, শিশির-স্নাত পদ্মের মতো। তিনি এতো প্রসন্ন হলেন যে, তাঁর অবশিষ্ট পঞ্চশত বস্ত্রও এনে সানন্দে দান করলেন আনন্দকে। তিনি প্রাণস্পর্শী ভাষায় বস্ত্র দানের ফল সম্বন্ধে বর্ণনা করলেন।

দানের আশ্চর্য ফলের চমৎকারী দেশনা শ্রবণে মৃদু হতেও মৃদুতর হয়ে গেল রাজার অন্তর। প্রগাঢ় শ্রদ্ধায় হলো চিত্ত নমিত, দ্রবীভূত। নরনাথ হাস্যোজ্জ্বল মুখে তাঁর আনন্দভাব স্থবিরকে জানিয়ে তাঁকে বন্দনান্তর প্রসন্নচিত্তে প্রস্থান করলেন।

(গুণ জাতক—১৫৭)

৯। *বস্ত্রদান*---

মহামনা আনন্দ তাঁর প্রথম লব্ধ পঞ্চশত বস্ত্র জীর্ণচীবর ধারী পঞ্চশত ভিক্ষুর মধ্যে বণ্টন করে দিলেন। তারপর প্রদান করলেন রাজপ্রদত্ত পঞ্চশত বস্ত্র অল্প বয়স্ক এক তরুণ ভিক্ষুকে। এ তরুণ ভিক্ষু আনন্দে।

একনিষ্ঠ সেবক। ইনি আন্তরিকতার সহিত আনন্দের সেবা করতেন, সম্পাদন করতেন সযত্নে ব্রতানুব্রতাদি যাবতীয় কার্য।

কৃতজ্ঞ আনন্দ চিন্তা করলেন---"এ ভিক্ষু আমার বিনীত সেবক, বড়ো উপকারী। তাই তা'কে এ পঞ্চশত বস্ত্র সমস্তই প্রদান করা উচিত। উপকারীর প্রত্যুপকার করাই মানব-ধর্ম।" এ চিন্তা করে তিনি সকৃতজ্ঞ অন্তরে সেবক ভিক্ষুকে সমস্ত বস্ত্রই প্রদান করলেন।

গুণবান্ ব্যক্তি সদ্‌গুণের আদর করেন। মণি-কাঞ্চন সংযোগের মতো মহতের সংযোগে সজ্জনের জীবন হয় সমুজ্জ্বল, চিত্ত হয় প্রশস্ত, নিষ্কলুষ। দিনমণির আলোক সম্পাতের মতো জ্ঞানালোক হয় উদ্ভাসিত, মোহ-তিমির হয় অন্তর্হিত।

উদারচেতা আনন্দ ছিলেন যেমন একাধারে বহুগুণের অধিকারী, তাঁর সেবক ভিক্ষুও ছিলেন তেমন উদার, সংযত ও ন্যায়নিষ্ঠ। ইনি অল্পেচ্ছু, অল্পতেই থাকেন সন্তুষ্ট। এই উন্নতমনা তরুণ ভিক্ষু তাঁর সতীর্থ ভিক্ষুগণকে বিভাগ করে দিলেন আচার্য প্রদত্ত সমস্ত বসন। প্রত্যেক ভিক্ষু নিজ লব্ধ নূতন বস্ত্রে চীবর প্রস্তুত করলেন। সকলেই নূতন চীবর পরিধান করে প্রসন্ন মনে শাস্তা সমীপে উপনীত হলেন। তাঁকে বন্দনার পর একপ্রান্তে উপবেশন করে বিনীত বাক্যে জিজ্ঞাসা করলেন---"ভন্তে ভগবন্, যিনি স্রোতাপন্ন আর্যশ্রাবক, তিনি কি মুখ চেয়ে দান করতে পারেন? আর দানের তারতম্য করাও কি তাঁর পক্ষে সম্ভব?"

প্রত্যুত্তরে বুদ্ধ বললেন---"অসম্ভব ভিক্ষুগণ, স্রোতাপন্ন আর্যশ্রাবক দান সম্বন্ধে কখনও পক্ষপাতিত্ব করতে পারে না।"

"ভন্তে, ধর্ম-ভাণ্ডারাধ্যক্ষ্য স্থবির মহোদয় এক তরুণ ভিক্ষুকে পঞ্চশত নূতন বস্ত্র দান করেছেন। সে ভিক্ষু কিন্তু, আমাদের হাতে সমুদয় বস্ত্র বিভাগ করে দিয়েছেন।"

"ভিক্ষুগণ, তোমরা একথা মনে করো না যে, আনন্দ এই তরুণ ভিক্ষুর মুখ চেয়েই দান দিয়েছে। এ ভিক্ষু আনন্দের সেবক। সে উপকারীর প্রত্যুপকার করেছে মাত্র, মুখ চেয়ে নয়। এ দান কৃতজ্ঞতা

প্রকাশের সদিচ্ছা মাত্র। জগতে কৃতজ্ঞ ব্যক্তি বড়োই দুর্লভ। আনন্দ জ্ঞানী, পণ্ডিত, কৃতজ্ঞ, মনস্বী ও কল্যাণমিত্র। আনন্দের প্রতি তোমরা বিরূপ মনোভাব পোষণ করো না।"

তথাগতের যুক্তিপূর্ণ উপদেশ শুনে ভিক্ষুদের সন্দেহ বিদূরিত হলো এবং আনন্দের প্রতি শ্রদ্ধা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলো। তাঁরা বুদ্ধ-বাক্য সানন্দে অনুমোদন করলেন।

(গুণ জাতক—১৫৭)

১০। ধর্ম পূজা---

শ্রাবস্তীর জনৈক বিভবশালী ব্যক্তি ছিলেন বুদ্ধের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠাবান উপাসক। তিনি নিয়ত বুদ্ধ ও ভিক্ষুসংঘের পূজাসৎকার করে থাকেন। একদা তাঁর এরূপ ভাবোদয় হলো---"আমি সতত বুদ্ধরত্ন ও সংঘরত্নের পূজা-সৎকার করে থাকি এবং উৎকৃষ্টতম খাদ্য-ভোজ্য ও ক্ষৌম-কার্পাসাদি সূক্ষ্ম বস্ত্রও দান দিয়ে থাকি; কিন্তু, ধর্মরত্নের পূজা তো করা হয় না। কিরূপে করতে হয়, তোও তো জানি না। সম্বুদ্ধের নিকট তা জেনে নেবো।"

পরদিবস তিনি জেতবন বিহারে উপস্থিত হয়ে বন্দনান্তে সুগতকে জিজ্ঞাসা করলেন---"প্রভু ভগবন্, ধর্মরত্নকে পূজা করতে আমার একান্ত ইচ্ছা, তা কিরূপ ভাবে করতে হয়, দয়া করে বলুন।"

"উপাসক, ধর্মরত্নের পূজা-সৎকার করার ইচ্ছা করলে, আনন্দের পূজা-সৎকার করো। আনন্দ ধর্মরত্ন-ভাণ্ডারের অধ্যক্ষ।"

উপাসক বুদ্ধবাক্য সানন্দে অনুমোদন করে পরদিনের জন্য আনন্দকে নিমন্ত্রণ করলেন। পরদিবস ধর্মপূজা উপলক্ষে বহুলোক ধ্বজা-পতাকা ও পুষ্প-মাল্য হস্তে ধর্মের জয়-গীতিকায় আকাশ-বাতাস মুখরিত করে বিহারে উপস্থিত হলেন। এরূপে পরম সমাদর ও সগৌরবে আয়ুষ্মান্ আনন্দকে উপাসকের গৃহে নিয়ে গেলেন। তাঁকে বসালেন সুসজ্জিত পুষ্পাসনে।

বিবিধ গন্ধ সম্ভারে প্রকোষ্ঠ করলেন সৌরভময়। তাঁকে দান করলেন উৎকৃষ্টতম খাদ্য-ভোজ্য এবং ত্রিচীবর-যোগ্য মহার্ঘ ক্ষৌম বস্ত্রে করলেন পূজা।

মতিমান্ আনন্দ চিন্তা করলেন---"ধর্মরত্নের জন্যই এ পূজা-সৎকার। আমি কি এর উপযুক্ত? অগ্রশ্রাবক ধর্মসেনাপতিই এর যোগ্যপাত্র।" এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে, উপাসক-প্রদত্ত খাদ্য-ভোজ্য ও বস্ত্রাদি বিহারে এনে তা শারীপুত্রকেই দান করলেন।

প্রাজ্ঞশ্রেষ্ঠ শারীপুত্র প্রজ্ঞাচিত্তে চিন্তা করে দেখলেন---"ধর্মরত্নের জন্যই এপূজা; সুতরাং যিনি ধর্মস্বামী তথাগত, তিনিই একমাত্র এপূজা পাবার যোগ্যপাত্র।" এ চিন্তা করে তিনি পুণ্য-পুরুষ সম্বুদ্ধকেই সমস্ত দানীয় বস্তু দান করলেন। অনন্যসাধারণ ধর্মরাজ সম্যক্ সম্বুদ্ধের চেয়ে যোগ্যতর পাত্র এ জগতে আর কেউই বিদ্যমান নেই, অতএব তিনিই গ্রহণ করলেন এ পূজা। আহার করলেন আহার্য বস্তু এবং বস্ত্রখানাও করলেন গ্রহণ। উপাসকের ধর্মপূজা, ধর্মার্চনা, ধর্মারাধনা ও ধর্মোপাসনা হলো সাফল্য মণ্ডিত।

(ভিক্ষা পারম্পর্য জাতক—৪৯৬)

১১। ভিক্ষুণী প্রথার প্রার্থনা---

শাক্যসিংহ সম্বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির পর পঞ্চম বর্ষা বৈশালীর মহাবনে অবস্থান করছিলেন। তখন তিনি সংবাদ পেলেন ---"শাক্যরাজ শুদ্ধোদন কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হয়েছেন।" এ সংবাদ পেয়ে শাক্যমুণি আকাশমার্গে কপিলবাস্তুর রাজপ্রাসাদে উপনীত হলেন। শুদ্ধোদনের প্রতি অসম্পূর্ণ বুদ্ধ-কৃত্যের নিরবশেষ পূর্ণতা প্রাপ্তির মানসে তথাগত মহারাজের শয়ন-প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করলেন।

রাজার মুমূর্ষু অবস্থা। শীর্ণ-পাণ্ডুর মুখে পড়েছে মৃত্যুর করাল ছায়া। পার্শ্বে উপবিষ্টা রয়েছেন বিস্রস্ত-কুন্তলা, শ্লথ-বসনা মহারাণী গৌতমী।

তাঁর বিমর্ষ মুখমণ্ডল অশ্রু প্লাবিত। চোখের উদ্বিগ্ন-দৃষ্টি স্বামীর মুখে সন্নিবদ্ধ। ভিষক ব্যস্ত ও চিন্তাগ্রস্ত। পরিচারকগণ আপন কাজে তৎপর। অমাত্য-গণ চিন্তান্বিত। প্রাসাদ-কক্ষ নীরব-নিস্তব্ধ।

হঠাৎ বুদ্ধের আগমনে সকলেই চঞ্চল হয়ে উঠলেন। সুগতের নীরব ইঙ্গিতে আবার সকলেই নীরবে স্থির হয়ে বসলেন। বুদ্ধ রাজার সন্নিকটেই উপবিষ্ট হয়ে তাঁকে সম্বোধন করে আরম্ভ করলেন ঋদ্ধিময় ধর্ম দেশনা। জগতের অন্তর্নিহিত সত্য সম্বন্ধে দেশনা করতে গিয়ে তিনি ব্যাখ্যা করলেন--"অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্মার নিগূঢ় তত্ত্ব।" দিব্যদর্শী বুদ্ধের শ্রীমুখ নিঃসৃত পীযূষ-বর্ষিণী বাণী শুনতে শুনতেই শাক্যকুল-তিলক শুদ্ধোদনের তৃষ্ণাক্ষয় হলো। আত্যন্তিক দুঃখের নিবৃত্তিতে তিনি সম্যক্ উপলব্ধি করলেন পরা-শান্তি। পিতাকে অনুত্তর-অচ্যুতপদ অর্হত্বে প্রতিষ্ঠাপিত করে স্বীয় প্রধান কর্তব্যের পরিসমাপ্তি করলেন তথাগত।

অনির্বচনীয় নৈর্বাণিক আনন্দে মগ্ন হলেন শুদ্ধোদন। তাঁর বহু জন্মের সাধনা হয়েছে পরিপূর্ণ। জীবন-দীপ নির্বাপণের পূর্বক্ষণে তাঁর জ্ঞান-দীপ উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল---সমুজ্জ্বল, অতি সমুজ্জ্বল! পাণ্ডুর-বর্ণ মুখচ্ছবি জ্যোতির্ময় আলোকে হলো উদ্ভাসিত। নির্বাণোন্মুখ শুদ্ধোদন দুর্বল-মুখে মৃদু-মধুর সুস্মিত-হাসি টেনে এনে তথাগতের উদ্দেশ্যে করলেন অঞ্জলিবদ্ধ। বিদায় নিলেন বুদ্ধের নিকট---শেষ বিদায়। প্রসন্নোজ্জ্বল চক্ষু হলো মুদ্রিত---চিরমুদ্রিত। রয়ে গেলো যেন তাঁর মুখে শান্ত-মধুর হাসির জ্যোতিঃ। পরিনির্বাপিত হলেন শুদ্ধোদন *। চিরতরে নিরুদ্ধ হলো তাঁর জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহ। শান্তি, পরা-শান্তি।

বুদ্ধের নির্দেশ মতো নিষ্পন্ন করা হলো শুদ্ধোদনের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া। অতঃপরও কিয়দ্দিন সুগত কপিলবাস্তুর নিগ্রোধারামে অবস্থান করেছিলেন। আর্তজনের দুঃখহারী অমিতাভের নিকট একদিন বৈধব্য-বেশে শোকাকুলা মহাপ্রজাপতী গৌতমী উপস্থিত হলেন। বন্দনান্তর তাঁকে সবিনয়ে বললেন--"ভন্তে ভগবন্, রাজপুরী আমার নিকট মৃগ-তৃষ্ণিকার মতো অসার-শূন্যবৎ

* তাঁর বয়স তখন ৯৭ বৎসর।

বলেই প্রতীয়মান হচ্ছে। কুমার নন্দ ও প্রাণ-প্রতিম রাহুল প্রব্রজ্যা নিয়েছে, মহারাজও নির্বাণগত। এখন আর আমি কার মুখ চেয়ে রাজপুরীতে অবস্থান করবো? কিছুই তো আমায় সান্ত্বনা দিতে পারছে না। ভন্তে, আমি ইচ্ছা করেছি, গৃহবাস ত্যাগ করে প্রব্রজ্যার আশ্রয় নেবো; চিত্ত-সংযমের অনুশীলন করবো এবং নির্জনে করবো বিরাগের সাধনা। ভগবন্, করুণা করে আমাকে প্রব্রজ্যা প্রদান করুন।''

বুদ্ধ গম্ভীর স্বরে বললেন---''গৌতমি, এ পবিত্র বুদ্ধশাসনে নারী-জাতির প্রব্রজ্যা লাভ তথাগতের অভিলাষ সম্মত নয়।''

সুগতের কথা শুনে গৌতমী বিষণ্ণা হলেন। সকাতরে দ্বিতীয়বার অনুরোধ করলেন তিনি---''ভগবন্, মাতৃজাতি তথাগত প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয়ের আশ্রয়ে প্রব্রজ্যা লাভ করলে, কল্যাণ জনকই হবে। দয়া ক'রে আমায় প্রব্রজ্যা প্রদান করুন।''

''নিষ্প্রয়োজন গৌতমি, তোমার এরূপ মনোবাসনা ত্যাগ করো।''

গৌতমী তৃতীয়বার অনুরোধ করলেন। কিন্তু, বুদ্ধ স্থিরকণ্ঠে প্রত্যাখ্যান করলেন তৃতীয় বারও। তথাগতের অনুমতি লাভে বঞ্চিতা হয়ে গৌতমী অন্তরে বড়ো আঘাত পেলেন; হলেন অত্যধিক দুঃখিতা ও মর্মাহতা; দু'গণ্ড বেয়ে অবিরল ধারায় ঝরতে লাগলো অশ্রুবারি। আশাহতা, বেদনা-বিধুরা ও রোরুদ্যমানা গৌতমী বিমর্ষ বদনে সুগতকে বন্দনা করে প্রস্থান করলেন মন্থর গতিতে।

শাক্যমুনি অচিরে সশিষ্য ত্যাগ করলেন শাক্যরাজ্য। অধর্ম উৎসাদন কল্পে ধর্মরাজ ধর্ম-পতাকা উড্ডীন করে অভিযান করলেন বৈশালী অভিমুখে। মার-বিজয়ী বুদ্ধ পথে নানা স্থানে তাঁর মুক্তিপ্রদ অমোঘ-অস্ত্র বর্ষণ ক'রে মুক্তিদান করলেন জনগণকে দুরন্ত মারের দুরপনেয় কবল থেকে। পরিশেষে তিনি বৈশালীর মহাবনে কূটাগার শালায় উপনীত হয়ে কিয়দ্দিন সেখানে সশিষ্য অবস্থান করেছিলেন।

দুই

এদিকে কি করলেন মহাপ্রজাপতী গৌতমী? তিনি কিন্তু, নিরস্ত হলেন না, আপন সংকল্প থেকে। রোধ হবার তো নয়, তাঁর জন্মান্তরের পুঞ্জীভূত শোভন-সংস্কারের সুতীব্র গতি-বেগ। তিনি যে, সুদূর অতীতে পদুমোত্তর বুদ্ধ সমীপে তৃষ্ণা-ক্ষয়ের প্রার্থনা করে বুদ্ধের আশীর্বাদ লাভ করেছিলেন, তা'তো ব্যর্থ হবার নয়। সেই অজেয় আকর্ষণেই অনুপ্রাণিত হয়ে, ছেদন করলেন তাঁর সুদৃশ্য ভ্রমর-কৃষ্ণ কেশ-কলাপ, মুণ্ডিত করলেন মস্তক, ত্যাগ করলেন মহার্ঘ রাজ-বসন, ধারণ করলেন কাষায়-বস্ত্র।

রাজপরিবারের যিনি প্রধানা, তাঁর এমন অভিনব বেশ দর্শনে শাক্য-কুলের সকলেই হলেন বিস্ময়ে স্তম্ভিত। শাক্য মহিলাগণও হলেন চমৎ-কৃতা। শাক্যসিংহের আগমনে আমূল পরিবর্তন হয়ে গেছে শাক্যদের ভাবধারা। মুক্তির মোহন-স্পর্শে তাঁদের চিত্ত হয়েছে বিরাগ-প্রবণ। চির-মুক্তির পূর্ণ-স্বাদ আস্বাদনের ঐকান্তিক আগ্রহে প্রিয়তমা পত্নী, স্নেহ-প্রতিম পুত্র-কন্যা, ভোগ-বিলাসের মদিরতাময় আকর্ষণ, সব কিছুই বিসর্জন দিয়ে সহস্রাধিক শাক্য অমিতাভের শরণ নিয়েছেন; পবিত্র শাস্তা-শাসনে নিয়েছেন দীক্ষা। আজ তাঁদের দয়িতাগণ দয়িতের অভাবে হয়ে গেছেন ম্লান, বিষণ্ণ, বিমনাঃ ও অসহায়া। বিরহ-বিধুরা অনন্যোপায়া শাক্য-মহিলাগণ আজ অভিনব বেশে গৌতমীকে দেখে অকূলে যেন কূল পেলেন। অশরণের শরণ, অগতির গতি, অসহায়ের সহায় স্বরূপ বরণ করে নিলেন তাঁরা সানন্দে ও সাগ্রহে এ মহিমময়ী প্রথা। তাঁদের প্রধান নায়িকা গৌতমীকে করলেন অনুসরণ। 'ত্যাগ করবেন গৃহবাস, প্রব্রজ্যায় করবেন আত্মোৎসর্গ' এরূপ স্থির সঙ্কল্পে বদ্ধপরিকর হলেন পঞ্চশতাধিক শাক্যকুল-বধূ।

এক শুভক্ষণে মহাপ্রজাপতী গৌতমী শাক্যমহিলাগণ সমভিব্যাহারে সুদূর বৈশালী অভিমুখে করলেন শুভযাত্রা। সকলেই মস্তক মুণ্ডিতা, কাষায়-বস্ত্র পরিহিতা, অধোদৃষ্টি নিবদ্ধা। সর্বাগ্রে গৌতমী, তদনুগামিনী

রমণীগণ পর পর পর্যায়ক্রমে সুন্দর শৃংখলাবদ্ধ হয়ে লীলায়িত গতিছন্দে সমপদবিক্ষেপে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছেন।

এ সব অসূর্যম্পশ্যা শাক্যকুল-বধূ জীবনে এই প্রথম পদব্রজে বের হয়ে পড়লেন রাজপথে। যে ত্যাগের মহান্ আদর্শ একদা রাজকুমার সিদ্ধার্থ তাঁদের সম্মুখে স্থাপন করে গেছেন, সে আদর্শেই অনুপ্রাণিত হয়ে আজ তাঁরা দুঃসহ-দুঃখ বরণ করে নিয়েছেন অকাতরে। কেন? এর মাধ্যমে তাঁরা পেতে চান---চির সুখ, চির শান্তি ও চির মুক্তি।

তাঁদের এ অভিনব বেশ সত্যই বৈচিত্র্যময় ও চিত্তাকর্ষক। সৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী-স্বরূপিণী রমণীদের এ অপূর্ব বেশ দর্শনে কৌতূহলী হলো দর্শকবৃন্দ। বিস্ময়াবিষ্ট জনগণ কেবল ঔৎসুক্যে জানতে চায়---"এঁরা কে? এ বেশ কেন? কোথা যাচ্ছেন এঁরা?"

অভিযাত্রীনীদের কোনো দিকেই দৃক্‌পাত নেই। যে দুর্লভ-রত্ন লাভের প্রত্যাশায় তাঁদের এ অভিযান, তদ্‌ভাব ভাবনায় তাঁরা নিমগ্ন। সেই বাঞ্ছিতের সন্ধানে উধাও হয়ে গেছে তাঁদের মন-প্রাণ। তাঁদের অতিক্রম করতে হবে সুদীর্ঘ একান্ন যোজন পথ। চল্‌তে চল্‌তে পায়ে স্ফোটক হলো, স্ফোটক গলিত হয়ে ক্ষত-বিক্ষত হলো পদতল, পথ হলো রক্তে রঞ্জিত, ধূলি-ধূসরিত হলো সর্বাঙ্গ, তবুও তাঁরা চলছেন একমনে। চুম্বকের আকর্ষণের মতো শোভন-সংস্কারের অজেয় আকর্ষণের উন্মাদনা প্রত্যেকের অন্তরে সৃষ্টি করলো বেগবতী প্রীতির তড়িৎ-প্রবাহ। তাই তাঁদের শ্রান্তি নেই, ক্লান্তি নেই এচলার পথে। অভীষ্ট সিদ্ধির উদগ্র পরিকল্পনায় তন্ময় হয়ে ক্রমশঃ তাঁরা অতিক্রম করতে লাগলেন ক্রোশের পর ক্রোশ, দূর হতে দূরান্তর।

দীর্ঘ দিনের পর তাঁরা গন্তব্য স্থান বৈশালীতে হলেন উপনীত। যেই বৈশালী প্রকৃতির লীলা-নিকেতন, বিলাসীর বিলাস মন্দির, মনোরমা নলিনী সমাকীর্ণা সরসী-শোভনা, মনোহর পুষ্পোদ্যান পরিশোভিতা, সুচারু হর্ম্যরাজী সমলংকৃতা, তাবত্রিংশ দেবোপম নয়ন-মোহন নর-নারী সমাকীর্ণা, অনুপমা রাজশ্রী-মণ্ডিতা ও সমৃদ্ধা; এরূপ গরীয়সী বৈশালীর মনোমোহিনী দৃশ্যা-

বলী কিন্তু, শাক্যকুলৈশ্বর্যত্যাগিনী বিরাগিনীদের বিরাগচিত্তে অনুরাগের রেখাপাত করতে পারলো না। ত্যাগের উজ্জ্বলাদর্শে অনুপ্রাণিতা সন্ন্যাসিনী-গণ অচঞ্চল অধোদৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে অনুক্রমে মহাবনে উপনীত হলেন।

তিন

অরণ্যানীর প্রাকৃতিক পরিবেশে বিরাগ অন্তরের বৈরাগ্যভাব গাঢ়তররূপে ফুটে ওঠা একান্তই স্বাভাবিক। মহাবনের রমণীয় দৃশ্যাবলী এ গৃহ-ত্যাগিনী নারীদের অন্তরেও রেখাপাত করল। নিবিড় অরণ্যের স্তব্ধ-নীরবতা তাঁদের বিরাগ-প্রবণ অন্তরে জাগিয়ে তুললো পুলক-শিহরণ।

তখন চিন্তা করলেন গৌতমী—"এ বনেই আছেন আমার হৃদয়-রতন গৌতম। তাঁকে দেখে চোখ জুড়াবো, প্রাণে শান্তি পাবো।" এ চিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর অন্তরে স্ফুরিত হলো উচ্ছ্বাসময় আনন্দের তড়িৎ ঝলক্। কিন্তু, পরক্ষণেই আবার প্রবল সন্দেহ-দোলায় দুলে উঠল তাঁর অন্তর---"সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে এসেছি, পূর্ণ হবে কি আমার মনোবাসনা?" তখন মনোমন্দিরে দেখা দিল কেমন এক হতাশার রুদ্র-মূর্তি। স্পন্দিত হলো বক্ষস্থল, কম্পিত হলো দেহ, অনুভব করলেন অবশতা, দুর্বলতা।

তাও ক্ষণেকের জন্য। পরক্ষণেই এসে পড়ল সাহস, সঞ্চয় হলো শক্তি। দৃঢ়-পণের ভিত্তিমূলে চিত্তকে করলেন স্থির-অচঞ্চল--"হয়, সাধনা সিদ্ধ হবে; না হয়, ধর্মের নামে এ বনে এ নশ্বর দেহ তিলে তিলে করবো আহুতি দান। তবুও, বুক ভরা এ মর্মদাহী হতাশা নিয়ে ঘরে আর ফিরে যাবো না।"

গৌতমী সন্দিগ্ধ ও শঙ্কিত চিত্তে সঙ্গিনীদের সহিত ক্রমশঃ অগ্রসর হয়ে কূটাগার শালার বহির্দ্বারে উপনীত হলেন। তথায় তাঁরা ব্যগ্রচিত্তে দাঁড়িয়ে রইলেন আনন্দের প্রতীক্ষায়। স্বজন সন্নিধানে আসাতে স্নেহময়ী

গৌতমীর স্নেহময় অন্তরের পুঞ্জীভূত বেদনারাশি অশ্রুবিন্দুরূপে অবিরল ধারায় ঝরে পড়তে লাগ্‌ল।

রাজকুলের রমণীদের আগমনে ও তাঁদের অবস্থা দর্শনে ভিক্ষুগণ বিস্ময়ান্বিত হলেন। কেহ কেহ দ্রুত গিয়ে আনন্দ স্থবিরকে এ সংবাদ জানালেন। তিনি যথাসত্বর এসে গৌতমীর সম্মুখে দাঁড়ালেন। পুত্রোপম আনন্দকে দেখেই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল তাঁর শোকাবেগ। চক্ষের জলে বক্ষ ভেসে গেল। অপর মহিলারাও হলেন অশ্রুমুখ।

আনন্দ সবিস্ময়ে দেখলেন—মস্তক মুণ্ডিতা, কাষায় বসন পরিহিতা রাজকুলের মহিলাগণ! ধূলায় ধূসরিত তাঁদের সর্বাঙ্গ, রৌদ্র-দগ্ধ মলিন বদন, অশ্রুসিক্ত গণ্ডদ্বয়, পদযুগল স্ফোটকাহত ও ক্ষত-বিক্ষত, রক্তে রঞ্জিত হচ্ছে মৃত্তিকা!

এ করুণ-দৃশ্য করুণাময়ী আনন্দের প্রাণে বড়ো আঘাত প্রদান করল। করুণায় বিগলিত হলো তাঁর করুণাময় অন্তর, চক্ষু হলো অশ্রু-সিক্ত। তিনি ব্যথিত কণ্ঠে বললেন—"মাতঃ, আপনাদেরকে এ বেশে, এ অবস্থায় দেখতে হবে, তা আমার চিন্তার অতীত। আপনারা বড়োই দুষ্কর কার্য করেছেন। পদব্রজে যাতায়াতে আপনারা অনভ্যস্ত। তবুও কেন এ সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে এখানে এসেছেন, শরীরকে এরূপভাবে নির্যাতন দিয়ে? মাতঃ, আপনাদের উদ্দেশ্য কি?"

গৌতমী বাষ্পরুদ্ধ স্বরে বললেন—"ভন্তে আনন্দ, গৃহত্যাগিনী মাতৃ-জাতিকে বুদ্ধ-শাসনে প্রব্রজ্যা প্রদানে তথাগত অনিচ্ছুক। নিগ্রোধারামে তাঁর অনুমতি না পেয়ে, আজ দুঃসাহস নিয়ে আমাদের এভাবে এখানে আসতে হয়েছে। ভন্তে আনন্দ, অন্তরে আমার কী যে বেদনা, কিসের তাড়নায় যে, আজ আমি এখানে আসতে বাধ্য হয়েছি, আমার প্রাণ কেন এমন আকুল হয়ে উঠেছে, তা ব্যক্ত করা আমার সাধ্যাতীত। তবুও ভন্তে, সুগত সমীপে যেতে আমার বড়ো ভয় হয়। তিনি যদি সেবারের মতো আমার অনুরোধ উপেক্ষা করেন। একথা ভাবতেও যেন আমার হৃদয় বিদীর্ণ হতে চায়।" এতদূর বলে গৌতমী নীরবে অশ্রু বর্ষণ করতে

লাগলেন।

মতিমান আনন্দ বিশেষভাবে উপলব্ধি করলেন মহাপ্রজাপতীর অন্তরের বেদনা। প্রব্রজ্যা লাভের প্রতি তাঁর কেমন ঐকান্তিক আগ্রহ, কিরূপ প্রবলা শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা, কতো প্রগাঢ় প্রাণের টান, ইহাও তিনি হৃদয়ঙ্গম করলেন। তখন তিনি করুণার্দ্র-চিত্তে বললেন---"মাতঃ, আপনি অপেক্ষা করুন, আমি সুগত-সমীপে প্রার্থনা করে দেখবো, নারী-জাতিকে প্রব্রজ্যা দানে তিনি সম্মত আছেন কি না। আমি ফিরে না আসা অবধি আপনারা এখানেই বিশ্রাম করুন।"

তখনই আনন্দ সুগত সকাশে উপনীত হয়ে বন্দনান্তে বললেন---"ভন্তে ভগবন্, পঞ্চশতাধিক শাক্য-রমণী পরিবৃতা হয়ে মহাপ্রজাপতী গৌতমী এখানে এসেছেন। তাঁরা সকলেই অশ্রু-প্লাবিত বিমর্ষ-বদনে বহির্দ্বারেই দাঁড়িয়ে আছেন। সকলেই মস্তক ুণ্ডিতা, কাষায় বসন পরিহিতা, ধলি-ধসরিতা, চরণ তাঁদের স্ফোটকাহত ও ক্ষত-বিক্ষত, রক্তে রঞ্জিত হচ্ছে ধরাতল। ভগবন্, এদৃশ্য বড়োই করুণ, বড়োই মর্মন্তুদ। মাতৃজাতিকে তথাগত-প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয়ে প্রব্রজ্যা দানে আপনি নাকি অনিচ্ছুক। নিগ্রোধারামে আপনার অনুমতি না পেয়ে পুরাঙ্গনা পরিবৃতা হয়ে আজ মহাপ্রজাপতী গৌতমীকে এ সুদূর বন-প্রদেশেই আসতে হয়েছে। আহা, কী যে তাঁরা ক্লেশ স্বীকার করেছেন, দেখলে চোখ সজল হয়ে ওঠে। ভগবন্, দয়া করে আপনি অনুমতি প্রদান করুন, মাতৃজাতি যেন সুগত-শাসনে প্রব্রজ্যা লাভ করতে পারেন, ভগবৎ সকাশে এই আমার একান্ত অনুরোধ।"

বুদ্ধ গম্ভীর স্বরে বললেন---"আনন্দ, নিষ্প্রয়োজন; শাস্তা-শাসনে নারীদের প্রব্রজ্যা দানের অভিলাষ উৎপন্ন করো না।"

আনন্দ তবুও আশা ত্যাগ না করে দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার কাতর অনুরোধ জানালেন। কিন্তু, প্রত্যেক বারেই বুদ্ধ তাঁর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলেন।

প্রত্যুৎপন্ন মতিমান্ আনন্দ তিনবার প্রত্যাখ্যাত হলে, তাঁর চিত্তে উদয় হলো এক অভিনব পরিকল্পনা। জিজ্ঞাসা করলেন তিনি বিনীত বাক্যে---

'প্রভু, মাতৃজাতি সুগত-শাসনে প্রব্রজ্যা লাভ করলে, তাঁরা স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী, অনাগামী ও অর্হত্ব মার্গ-ফল সাক্ষাৎ করতে পারবেন কি?''

''হ্যাঁ, পারবে।''

''প্রভু, যদি তা সম্ভব হয়, তবে গৌতমী তো আপনার বহু উপকারিণী, কতো যত্নে আপনাকে পালন করেছেন। তাঁর প্রাণের ঘেরায় রেখে আপনাকে করেছেন সংরক্ষণ ও সংবর্ধন। স্তন্যদানে করেছেন আপনার অমূল্য-জীবন দান। ভগবন্, মহাপ্রজাপতীর সেই মহদুপকার স্মরণ করে উপকারিণীর উপকারার্থে করুণা পরবশ হয়ে মাতৃজাতিকে প্রব্রজ্যা প্রদানের অনুমতি দান করুন।''

অষ্ট গুরুধর্ম

তখন সম্বুদ্ধ গম্ভীর স্বরে বল্লেন---''আনন্দ, গৌতমী যদি 'অষ্ট গুরু-ধর্ম' পালনে স্বীকৃত হয়, তা হলে, এতেই হবে ওর উপসম্পদা। অষ্ট গুরু-ধর্ম কি কি? যথা---

(১) ভিক্ষুণীর উপসম্পদা-বয়স শত বর্ষও যদি অতিক্রান্ত হয়, তবুও অধুনা উপসম্পন্ন ভিক্ষুকে বন্দনা, প্রত্যুত্থান, অঞ্জলিকর্ম,সমীচীন কর্ম ও মান্য করতে হবে।

(২) ভিক্ষুহীন আবাসে ভিক্ষুণী বর্ষাবাস অধিষ্ঠান করতে পারবে না।

(৩) ভিক্ষুণীকে প্রতি অর্ধমাসান্তর ভিক্ষুসংঘের নিকট জিজ্ঞাসা করতে হবে উপোসথের কথা এবং প্রার্থনা করতে হবে উপদেশ; এ দ্বিবিধ-ধর্ম ভিক্ষুদের নিকট একান্তই প্রত্যাশা করতে হবে।

(৪) বর্ষা-ব্রতোত্থিতা ভিক্ষুণীকে 'দৃষ্ট, শ্রুত ও চিন্তিত' এ বিষয় ত্রয়ের দ্বারা 'ভিক্ষু-ভিক্ষুণী' উভয় সংঘের নিকট প্রবারণা উপোসথ করতে হবে।

(৫) গুরুধর্ম লংঘনকারিী ভিক্ষুণীকে উভয় সংঘে এক পক্ষকাল 'মানত্ত' ধর্ম প্রতিপালন করতে হবে।

(৬) ্'বৎসর ছয় প্রকার ধর্ম বা নীতি শিক্ষার পর, শিক্ষার প্রতি শ্রদ্ধা সম্পন্না শিক্ষিতা নারীকে উভয় সংঘে উপসম্পদা প্রার্থনা করতে হবে।

(৭) ভিক্ষুণী যে-কোনও কারণে ভিক্ষুর প্রতি কুব্যবহার, আক্রোশ ও পরুষবাক্য প্রয়োগ করতে পারবে না।

(৮) আজ থেকে ভিক্ষুদের প্রতি ভিক্ষুণীদের অন্যায়-বাক্য প্রয়োগ এবং উপদেশ দানের পথ রুদ্ধ হলো; অপিচ, ভিক্ষুণীগণকে উপদেশ দানের পথ ভিক্ষুদের জন্য উন্মুক্ত রইলো।

ভিক্ষুণীরা যাবজ্জীবন লংঘন করতে পারবে না এ অষ্ট গুরুধর্ম। অধিকন্তু, তৎপ্রতি সশ্রদ্ধ অন্তরে একান্তভাবেই করতে হবে পূজা, সম্মান।

আনন্দ, মহাপ্রজাপতী গৌতমী যদি এ অষ্টবিধ গুরুধর্ম প্রতিপালন করবে বলে স্বীকৃত হয়, তা হলে এ স্বীকারোক্তিতেই সে উপসম্পন্না বলে গণ্য হবে। এ বিধানেই হোক গৌতমীর উপসম্পদা।'' *

---

* অতীতের অসংখ্য বুদ্ধের প্রত্যেকেরই যে, ভিক্ষুণী শ্রাবিকাসংঘ বিদ্যমান ছিল, তা ত্রিকালদর্শী গৌতমবুদ্ধ সবিশেষ অবগত ছিলেন। তাঁর উদাত্ত কন্ঠে ভাষিত 'বুদ্ধবংশ' নামক গ্রন্থে ২৪ জন অতীত বুদ্ধের অগ্রশ্রাবিকাদের নাম তিনি উল্লেখ করেছেন। দীপঙ্কর বুদ্ধও যে, শাক্যমুনির অগ্রশ্রাবিকা ক্ষেমা ও উৎপলবর্ণার নাম উল্লেখ করেছিলেন, তাও তিনি জ্ঞাত আছেন। বুদ্ধবংশে দীপঙ্কর বুদ্ধ বর্ণনায় তা বর্ণিত হয়েছে। তবুও তাঁর শাসনে মাতৃজাতির প্রব্রজ্যা লাভের তিনি প্রথম অনিচ্ছা প্রকাশ করলেন কেন? এর কারণ, তিনি এটা সম্যক্ অবগত আছেন যে, ভিবিন্ন প্রকৃতির নারীগণ সংঘে স্থান লাভ করে পবিত্র শাসনে অপবিত্রতা আনয়ন করবে, নির্মলকে করবে কলুষিত। তাই নারীজাতির প্রব্রজ্যা লাভ বুদ্ধ প্রথম ইচ্ছা করেন নি। অপিচ, কালানুযায়ী বিষয়টার প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করাই ছিলো তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য। বিষয়টা যাতে সুষ্ঠু ও সুদৃঢ় হয়, তাই তাঁর ঐকান্তিক ইচ্ছা। ্র্লভকে সুদুর্লভরূপে উপলব্ধির জন্য এবং দৃঢ়কে সুদৃঢ়রূপে প্রতিপাদন মানসে প্রথমে তিনি ভিক্ষুণী প্রথার অনুমতি দেন নি।

চার

স্মৃতিমান আনন্দ তথাগতের সারগর্ভবাণী সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করে প্রসন্নমনে গৌতমী সন্নিধানে উপস্থিত হলেন। আনন্দকে আসতে দেখে দুরু দুরু করে কেঁপে উঠল মহাপ্রজাপতীর শঙ্কিত অন্তর। তিনি ব্যগ্র চিত্তে চিন্তা করলেন---"জানি না, কি সংবাদ বহন করে আনছেন আনন্দ। না জানি, কি শুন্‌তে হয় তাঁর মুখে।"

আনন্দের প্রসন্ন-আনন দর্শনে গৌতমী কিঞ্চিৎ স্বস্তি বোধ করলেন বটে, কিন্তু চিত্ত হলো না সম্পূর্ণ আশঙ্কামুক্ত। আনন্দ এসে স্মিতমুখে গৌতমীর নিকট আদ্যোপান্ত সব কথাই ব্যক্ত করলেন। পরিশেষে গাঢ় স্বরে বললেন---"মাতঃ, আপনার মনীষিত সুদুর্লভ প্রব্রজ্যা লাভ, তথাগত অনুজ্ঞাত অষ্ট গুরুধর্ম পালনের স্বীকৃতির উপরই নির্ভর করছে। তা সম্যক্‌রূপে প্রতিপালন করবেন বলে যদি স্বীকৃত হন, তা যদি আজীবন লংঘন না করেন; প্রাগাঢ় শ্রদ্ধা সহকারে তৎপ্রতি প্রদর্শন করেন যদি পূজা, শ্লাঘা, সম্মান ও সৎকার; আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তির একমাত্র উপায় মনে করে এ ধর্ম যদি সগৌরবে ও নতশিরে বরণ করে নেন; তবে এ স্বীকৃতিতেই ধর্মতঃ নিষ্পন্ন হবে আপনার উপসম্পদা; এতেই আপনি নিজকে মনে করবেন উপসম্পন্না।"

গৌতমীর কর্ণে সুধা-বর্ষণ সম মনে হলো আনন্দের প্রত্যেকটি কথা। তাঁর সন্তপ্ত হৃদয় হলো শান্ত, সুশীতল। অফুরন্ত প্রীতি-রসে সিক্ত, দীপ্ত ও কম্পিত হলো তাঁর সর্বশরীর। আনন্দাশ্রুতে প্লাবিত হলো তাঁর নয়ন যুগল। হাস্যোজ্জ্বল মুখে তিনি বললেন—"সাধু, সাধু আনন্দ; ভন্তে আনন্দ, অতি উত্তম, অতি উত্তম, লব্ধ হয়েছে আমার বাঞ্ছিত-রত্ন! ফল-পুষ্পে সুশোভিত হয়েছে আমার কল্পলোকের আশাতরু। অন্তরে আমার মুহুর্মুহুঃ খেলছে আনন্দের তড়িৎ ঝলক্। ভন্তে আনন্দ, আপনিই আমায় দান করলেন এ অতুল আনন্দ। আপনি আমার বড়ো উপকারী, বড়ো হিতকারী। সর্বতোভাবেই আপনি মহাকল্যাণ বিধান করলেন।

ভন্তে আনন্দ, বিলাসী যুবক-যুবতী যেমন বিলাস-স্নানের পর অভিলষিত উৎপল-মাল্য হোক বা সৌরভ-মণ্ডিত পুষ্প-মাল্যই হোক অথবা মণি-মুক্তা খচিত মোহন-মাল্যই হোক, সাগ্রহে উভয় হস্তে গ্রহণ করে' সানন্দে কণ্ঠে ধারণ করে, সেরূপ ভন্তে, আমিও আজীবন অলংঘনীয় এ'অষ্ট গুরুধর্ম' সাদরে, সগৌরবে ও নতশিরে মেনে নিলাম। রাজচক্রবর্তীর জগৎ-দুর্লভ রত্ন-মুকুটের মতো এ অষ্টরত্ন আমার শিরে ধারণ করে রাখবো জীবনের অন্তিম নিশ্বাস পর্যন্ত, প্রাণপণ যত্নে করবো সুরক্ষা।''

গৌতমীর উচ্ছ্বাসপূর্ণ বাক্য শুনে অত্যধিক সন্তুষ্ট হলেন আনন্দ। তিনি এ সংবাদ সানন্দে নিয়ে চললেন ভগবৎ সকাশে। সুগতকে বললেন-''ভগব্, মহাপ্রজাপতী ভবদীয় অনুজ্ঞা সানন্দে নতশিরে মেনে নিয়েছেন। প্রভু, তার দৃঢ়তা ও হর্ষোৎফুল্লভাব দেখে আমি আশ্চর্যান্বিত হয়েছি। ভন্তে, আমি এ'মনে করে আনন্দিত হয়েছি যে, অগণিত নারী মুক্ত হবেন, চিরমুক্ত।''

সম্বুদ্ধ গম্ভীর কণ্ঠে বললেন---''আনন্দ, মাতৃজাতি প্রব্রজ্যা লাভের অনুমতি প্রাপ্ত না হলে, জগতে সুদীর্ঘকাল শাস্তা-শাসন স্থায়ী হতো। সহস্র বৎসর সদ্ধর্ম সুনির্মল ও সুবিশুদ্ধ থাকতো। কিন্তু আনন্দ, নারীদের জন্য এপথ যখন অর্গলমুক্ত হয়েছে, তখন আর দীর্ঘ দিন বুদ্ধ-শাসন বিশুদ্ধ থাকতে পারবে না। পঞ্চশত বৎসর মাত্র সদ্ধর্মের বিশুদ্ধতা রক্ষা পাবে।

(১) যেমন আনন্দ, যে পরিবারে অল্প সংখ্যক পুরুষ এবং বহু সংখ্যক নারী বসতি করে, বিবিধ অসঙ্গত কারণ উৎপন্ন হয়ে অচিরেই সে পরিবার ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, সেরূপই আনন্দ, যে ধর্ম-বিনয়ে মাতৃজাতি প্রব্রজ্যা লাভ করে, সে ধর্ম-বিনয়ও সুদীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না।

(২) যেমন আনন্দ, ফলবান শালীক্ষেত্রে যদি শ্বেতস্থিকা নামক রোগ জন্মে, সে শালীক্ষেত্র অচিরেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তথারূপই আনন্দ, যে ধর্ম-বিনয়ে নারীজাতি প্রব্রজ্যা লাভ করে, সে ধর্ম-বিনয়ও সুদীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না।

(৩) যেমন আনন্দ, ফলবান ইক্ষুক্ষেত্রে মঞ্জেষ্ঠিকা নামক রোগ উৎপন্ন হলে, সে ইক্ষুক্ষেত্র দীর্ঘকাল স্থায়ী হতে পারে না, সেরূপই আনন্দ,

যে ধর্ম-বিনয়ে নারীজাতি প্রব্রজ্যা লাভ করে, সে ধর্ম-বিনয়ও সুদীর্ঘকাল স্থায়ী হতে পারে না।

(৪) যেমন আনন্দ, সরোবরের জল বহির্গমন না করে মতো মানুষেরা প্রথমেই এর তীর বন্ধন করে, সেরূপই আনন্দ, প্রথমেই আমি অষ্টপাশে বন্ধনের মতো ভিক্ষুণীদের যাবজ্জীবন অলংঘনীয় 'অষ্ট গুরুধর্ম' প্রজ্ঞাপ্ত করলাম।

(বিনয় চুল্লবর্গ ও অঙ্গুত্তর নিকায়)

১২। আজীবক ভক্তের সন্দেহ অপনোদন—

একদা কৌশাম্বীর ঘোষিতারামে তত্ত্বজ্ঞ আনন্দ অবস্থান করছিলেন। তখন আজীবক সন্ন্যাসীর অন্যতম দায়ক গৃহপতি কয়েকটা প্রশ্নের সমাধান কল্পে আনন্দ সন্নিধানে উপস্থিত হলেন। প্রশ্নগুলি বহুদিন যাবৎ তাঁর অন্তরে নিহিত আছে। বহু আজীবক সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করেছেন বটে, কিন্তু উত্তর তাঁর মনঃপূত হয়নি। আনন্দের পাণ্ডিত্য ও শাস্ত্র-নিপুণতার কথা শুনে তাঁর অন্তর্নিহিত প্রশ্নের সমাধান কল্পে তিনি সমুৎসুক হলেন।

গৃহপতি মহামান্য স্থবিরকে সগৌরবে বন্দনা করে একান্তে উপবেশন করলেন। প্রথমে প্রীতিবাক্য বিনিময়ের পর তিনি অনুরোধ জানালেন---"মহীয়ান্ আনন্দ, আমার সন্দেহ বিনোদন মানসে আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার ইচ্ছা করেছি। আপনার আদেশ পেলে প্রশ্নগুলি বিবৃত করতে পারি।"

মধুর-ভাষী আনন্দ সুস্মিত মধুর কণ্ঠে বললেন---"হে সুভগ, আপনি যদৃচ্ছাক্রমে নিঃসঙ্কোচে প্রশ্ন করুন।"

সৌম্যদর্শন আনন্দের শ্রুতিমধুর শিষ্টতাপূর্ণ প্রথম আলাপেই গৃহপতি আকৃষ্ট হলেন। তিনি প্রফুল্ল মুখে বললেন---"মহামহিম আনন্দ, দেখা যায়, জগতে বহু ধর্মপ্রচারক বিদ্যমান আছেন। তাঁদের মধ্যে কোন্ ধর্মগুরুর প্রচারিত ধর্ম সু-আখ্যাত? স্বয়ং-দৃষ্ট স্বীয় অধিগত-ধর্মের সুন্দর, সুষ্ঠু,

সরল ও সাবলীল-ব্যাখ্যা কে করেছেন? জগতে সুগত কে? আর কেই বা সুপ্রতিপন্ন? ''

আনন্দ স্নিগ্ধ স্বরে বললেন—''ধীমান্, আপনার প্রশ্নের আমি প্রতিপ্রশ্ন করবো; উত্তর দেবেন আপনার উপলব্ধি অনুরূপ। আমার প্রশ্নে মন সংযোগ করুন—

(১) যাঁরা আসক্তি প্রহীণার্থে ধর্মদেশনা করেন এবং বিদ্বেষ ও মোহধ্বংস কল্পে পরিবেষণ করেন ধর্মোপদেশ, তাঁদের ধর্ম সু-আখ্যাত কি না? কিরূপ মনে করেন আপনি?''

গৃহপতি মুগ্ধ হয়ে বল্লেন—''হ্যাঁ ভন্তে, এরূপ হলে তাঁদের ধর্ম নিশ্চয়ই সু-আখ্যাত।''

(২) ''গৃহপতি, যাঁরা অনুরাগ, বিদ্বেষ ও মোহের পরিক্ষীণতাসাধক-মার্গ প্রতিপন্ন, জগতে তাঁরা সুপ্রতিপন্ন কি না?''

''হ্যাঁ ভন্তে, এরূপ হলে নিশ্চয়ই তাঁরা সুপ্রতিপন্ন।''

(৩) ''গৃহপতি, যাঁদের ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে লোভ, দ্বেষ ও মোহ; উচ্ছিন্ন হয়েছে ভবিষ্যৎ উৎপত্তির মূল কারণ, সুন্দর অনুত্তর-অচ্যুতে যাঁদের গতি হবে, যাঁরা সম্প্রাপ্ত হবেন চিরশান্তিময় নির্বাণ, জগতে তাঁরা সুগত কি না? কিরূপ মনে করেন আপনি?''

''ভন্তে, এরূপ হলে তাঁরা নিশ্চয়ই সুগত।''

কুশাগ্রবুদ্ধি আনন্দ তখন প্রসন্ন কণ্ঠে বললেন—''গৃহপতি, আপনাকে ধন্যবাদ। আপনার প্রশ্নের সদুত্তর আপনার মুখেই বিকাশ প্রাপ্ত হয়েছে।''

গৃহপতি মুগ্ধ-বিস্ময়ে বল্লেন—''আশ্চর্য; আশ্চর্য ভন্তে! আপ্নি যেরূপ বিচক্ষণতার সহিত আমার অভীষ্ট বিষয়ের সুষ্ঠু সমাধান করলেন, আমার নিজ মুখেই যেরূপ ভাবে প্রকাশ করালেন আমার প্রশ্নের সরস-শোভন উত্তর, নিজ ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন না করে, না করে পরধর্মকেও হেয় প্রতিপন্ন, সীমাবদ্ধ থেকে মূল-বিষয়ে, আত্মপ্রশংসাও না করে, কী সুন্দর, শান্ত ও সুসংযত বাক্য-বিন্যাসের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করলেন জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের চমৎকার মর্মার্থ! ভন্তে, এখন উৎসাদিত হয়েছে আমার সন্দেহ,

অনন্যমুখী ও অসন্দিগ্ধ হয়েছে আমার দোদুল্যমান চিত্ত।

মহামান্য আনন্দ, যথার্থই আপনারা আসক্তির প্রহীণার্থেই দেশনা করেন সত্যধর্ম, বিদ্বেষ ও মোহের ধ্বংস সাধন মানসেই পরিবেষণ করেন ধর্মোপদেশ! পজার্হ আনন্দ, আপনাদের ধর্মই সু-আখ্যাত; আপনারাই আসক্তি, বিদ্বেষ ও মোহ-ধ্বংসের মার্গ প্রতিপন্ন; আপনাদেরই প্রহীণ হয়েছে রাগ, দ্বেষ ও মোহ; এহেন দারুণ সন্তাপ-জনক ত্রিদোষ সমূলে উচ্ছিন্ন হয়েছে চিরতরে, একান্তই আপনারা সুগত, আপনারাই সুপ্রতিপন্ন!

মহীয়ান আনন্দ, আপনার অমৃতময়ী বাণী অতি উত্তম, অতি উত্তম! অধোমুখীকে যেমন ঊর্ধ্ব মুখী করা হয়, প্রতিচ্ছন্নকে বিবৃত, পথভ্রান্তকে নির্দেশ করা হয় যেমন সত্যপথ, ঘনান্ধকারে ধৃত হয় যেমন দীপ্তোজ্জ্বল আলোকমালা, চক্ষুষ্মান্‌কে দেখানো হয় যেমন মনোমোহনরূপ, তেমনি হে প্রভু, বিবিধ উপায়ে পাণ্ডিত্য-বিলাসে প্রকাশমান করে দেখালেন আমাকে মুক্তিপ্রদ অতিসত্য ভাস্বর-ধর্ম! প্রভু আনন্দ, আজ থেকে আমি জীবনের অন্তিম সীমা পর্যন্ত রত্ন ত্রয়ের শরণাপন্ন হচ্ছি। দয়া করে আমায় উপাসক-রূপে গ্রহণ করুণ। আমাকে আপনাদের অকৃত্রিম উপাসক বলেই মনে করবেন।"

(অঙ্গুত্তর নিকায়—তিক নিপাত)

১৩। আশ্চর্য-গুণ—

শ্রাবস্তীর জেতবন বিহার। মহামনস্বী বুদ্ধ ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে স্নিগ্ধস্বরে বল্‌লেন—"ভিক্ষুগণ, আনন্দের নিকট চতুর্বিধ আশ্চর্য-গুণ বিদ্যমান আছে। এ চমৎকার গুণ চতুষ্টয়ে সে শোভমান ও দীপ্যমান। তা কেমন আশ্চর্য-গুণ শ্রবণ করো---

(১) ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, উপাসক ও উপাসিকা যে কোনও পারিষদ আনন্দের সাক্ষাৎ ইচ্ছায় যদি সমাগত হয়, তা হলে তার দর্শন লাভে তারা অত্যধিক আনন্দিত ও হৃষ্ট-চিত্ত হয়। এটা আনন্দের প্রথম আশ্চর্য-গুণ।

(২) পারিষদ আনন্দকে যতই দর্শন করুক না কেন, কিছুতেই তাদের

তৃপ্তি মিটে না। পরিশেষে অতৃপ্ত বাসনা নিয়েই তাদের প্রত্যাবর্তন করতে হয়। কিছুতেই কারো ইচ্ছা হয় না, তা'কে ত্যাগ করে যেতে। এটা তার দ্বিতীয় আশ্চর্য-গুণ।

(৩) আনন্দ যদি পারিষদকে ধর্মোপদেশ পরিবেষণ করে, তাহলে, ভাষণ শুনে শ্রোতৃবৃন্দ চমৎকৃত, আনন্দিত ও বিস্ময়োৎফুল্ল হয়। এটা তার তৃতীয় আশ্চর্য-গুণ।

(৪) শ্রোতৃগণ আনন্দের ধর্মদেশনা যতই শ্রবণ করুক না কেন, কিছুতেই তাদের তৃপ্তি মিটে না। ধর্মদেশনায় আনন্দ এতোই সুনিপুণ ও মধুর-ভাষী যে, সে দেশনা সমাপ্ত করলেও, শ্রোতাদের আরো শুন্‌বার আগ্রহ থেকে যায়। এটা তার চতুর্থ আশ্চর্য-গুণ।"

গুণগ্রাহী ভিক্ষুগণ আনন্দের আশ্চর্য-গুণের কথা শুনে অত্যধিক প্রসন্ন ও চমৎকৃত হলেন।

(অঙ্গুত্তর নিকায়—চতুক্ক নিপাত)

১৪। আনন্দ ও চণ্ডালকন্যা—

এক

দিবা দ্বিপ্রহর। নিদাঘের প্রচণ্ড রৌদ্র। ভীষণ সন্তপ্ত হয়েছে ধরাতল। পথিকেরা ঘর্মাক্ত কলেবরে পথ অতিক্রম করে যাচ্ছে। কাতর-স্বরে আর্তনাদ করছে তৃষিত চাতক।

তর্ তর্ বাহিনী এক স্রোতস্বিনী। এর তীরপথে সুসংযত পদ-বিক্ষেপে চলে যাচ্ছেন মহামান্য স্থবির আনন্দ। তিনি বড়ো পিপাসিত। এমন সময় তিনি দেখতে পেলেন, সম্মুখে অনতিদূরে পল্লবিতা লতার মতো এক সুবেশা তন্বী যুবতী। তার কাঁখে কলসী। নদী থেকে জল নিয়ে যাচ্ছে আপন গৃহে। অধোদিকে নিবদ্ধ তার আনত নয়ন। যুবতী-সুলভ মদিরোল্লাসময় তার মন। বসন্ত-রাগের যে গানটা ওর ঈষদুন্মুক্ত ফুল্লাধর

থেকে নিঃসৃত হচ্ছে, তা কেবল তাকেই ঘিরে করছে গুঞ্জন, ফুলের চার পাশে ভ্রমরের মতো।

তরুণী নিকটস্থ হলে, আনন্দ মধুর কণ্ঠে বললেন ---"ভগ্নি, আমায় একটু জল দেবে? বড়ো পিপাসা পেয়েছে।"

যুবতী হঠাৎ অপ্রতিভ হয়ে এক পা পিছু হট্‌লো। এ তার কল্পনার অতীত। তার উৎসুক দৃষ্টি আনন্দের প্রতি বিন্যাস করল। আনন্দের দৃষ্টি বিনত, কমনীয় কান্তি, পুণ্য-লক্ষণ লাঞ্ছিত সুদর্শন চেহারা, প্রসন্নোজ্জ্বল বদন-মণ্ডল।

তরুণীর নয়নে বিস্ময়ভাব ফুটে উঠল। ধীরে-নীরবে আনত করল তার বিস্ময়-মুগ্ধ দৃষ্টি। পরক্ষণেই আবার সতৃষ্ণাকুল অন্তরে যুবতী-সুলভ সলজ্জ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করল আনন্দের অনিন্দ্য-কান্তি। সবিস্ময়ে ভাবতে লাগল ---"কি আশ্চর্য! এ মুখখানা এতো প্রিয় বলে মনে হচ্ছে কেন? এ সুধামাখা কণ্ঠস্বর যেন আমার সুপরিচিত, কোথাও যেন একে দেখেছি বলে মনে হচ্ছে!" এচিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই কুমারীর অন্তরে তীব্র অনুরাগের তড়িৎ প্রবাহ সঞ্জাত হলো।

আনন্দেরও মনে হচ্ছে---"এ মুখখানা যেন চেনা, বহুবার যেন দেখা হয়েছে।" তাঁর উদার অন্তরে ওর প্রতি জেগে উঠল---প্রগাঢ় প্রীতি, মৈত্রী ও ভগ্নীভাব।

স্থবির জলের পিপাসায় অতিষ্ঠ হলেন। বললেন আবার তৃষাতুর কণ্ঠে---"বোন্, দেবে কি একটু জল? বড়ো যে পিপাসা। উঃ, কী যে সন্তাপ!"

লজ্জাবনতা যুবতী বেদনা-ভরা অন্তরে বল্‌ল---"আপনি আমার প্রদত্ত জল কি পান করবেন?"

আনন্দ সবিস্ময়ে বললেন---"কেন? কেন পান করবো না?"

তরুণী সসঙ্কোচে বল্‌ল---"আমরা যে চণ্ডাল?"

আনন্দ বিস্ময় কণ্ঠে বললেন---"চণ্ডাল! কই তোমাতে চণ্ডালের তো কোনো লক্ষণ দেখছি না? কেমন তোমার কমনীয়-কান্তি, করুণা-লাঞ্ছিত

শোভন নয়ন, করুণ দৃষ্টি, কোমল কণ্ঠস্বর, সবই তো করুণাময়! চণ্ডালের তো এমন কান্তি, এমন নয়ন, এমন দৃষ্টি, এমন কণ্ঠস্বর হতে পারে না! চণ্ডাল হয় রুদ্র-মূর্তি, ক্রুদ্ধ-লোচন, হিংস্র-দৃষ্টি, নিষ্ঠুর-অন্তর, কর্কশ কণ্ঠস্বর। কই, তোমাতে তেমন কোনোও লক্ষণ তো দেখ্‌ছি না? তুমি তো যেন অমৃতময়ী করুণা-নির্ঝরিণী! তোমার মর্মস্থলে নিহিত সত্য-সুন্দরের প্রতিচ্ছবি যেন তোমার মুখ-মণ্ডলে প্রতিফলিত হচ্ছে!"

তরুণী মুগ্ধ-বিস্ময়ে বল্‌ল—"আপনার কথা, কণ্ঠস্বর ও দৃষ্টি-ভঙ্গী বড়ো মধুর, বড়ো চমৎকার! বসন্তের কোকিলের মতো আপনি কোথা থেকে এলেন? কোথা লুকিয়ে ছিলেন এতোদিন? আপনি কি দেবতা, না মানুষ?"

আনন্দ স্নিগ্ধ স্বরে বললেন—"দেবতা নই বোন্, আমি মানুষ।"

তখন তরুণী কুণ্ঠিত হয়ে বল্‌ল—"কিন্তু, আমরা যে অস্পৃশ্য।"

আনন্দ গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—"এসব অজ্ঞানীর কথা। অজ্ঞজন চণ্ডালের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে না।

জন্ম হেতু কেহ কভু চণ্ডাল না হয়,
জন্মের কারণে কেহ ব্রাহ্মণ তো নয়;
চণ্ডাল-ব্রাহ্মণ আখ্যা কর্মে প্রাপ্ত হয়।
সম্বুদ্ধের বাণী ইহা জানিবে নিশ্চয়।

যুবতী প্রফুল্ল-মুখে জিজ্ঞাসা করল—"মহাত্মন্, আপনি কে? কি নামে পরিচিত হন?"

"আমি বুদ্ধ-শিষ্য শ্রমণ, আমার নাম আনন্দ।"

কুমারী মুগ্ধ-বিস্ময়ে মনে মনে বলে উঠল—"আনন্দ! কতো সুন্দর নাম! আনন্দ বল্‌তেই যে, প্রাণ আনন্দে ভরে ওঠে, সত্যই তো ইনি আনন্দময় আনন্দ; তাঁর চোখ, মুখ, কথা ও অঙ্গভঙ্গী সব কিছুতেই রয়েছে ওই নামের সঙ্গে সামঞ্জস্য!" এ ভাবোচ্ছ্বাসের সঙ্গে সঙ্গেই তরুণীর সরাগ-অন্তর মথিত করে তার অজ্ঞাতে একটা দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে পড়ল। সে আবার জিজ্ঞাসা করল—"কোথা আপনার আবাস স্থান?"

প্রত্যুত্তর হলো—"এ শ্রাবস্তীর জেতবন বিহারে।"

তখন যুবতী মনোরম গ্রীবাভঙ্গী সহকারে শঙ্কিত লজ্জা-জড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল—"আপনার পত্নী আপনাকে খুব ভালো বাসে, নয় কি?"

উত্তর হলো—"আমি অপত্নীক।"

আকাংক্ষিত উত্তর পেয়েই কুমারী উৎফুল্লান্তরে বলে উঠল—"তা'ই না কি?" একথা বল্‌তে যেন কণ্ঠস্বর কেঁপে উঠল। চোখে কিন্তু, আনন্দের বিজলী খেলে গেল। সরাগ অন্তরে চিন্তা করল—"আমার আশা যদি হয় ফলবতী।"

তখন সে প্রসন্নোজ্জ্বল মুখে বল্‌ল—"আপনি তা হলে পান করবেন আমার জল!"

উত্তর হলো—"হ্যাঁ।"

"তা হলে নিন্।" বল্‌ল কুমারী নিঃসঙ্কোচে।

আনন্দ পাত্র ধারণ করলেন। তরুণী কম্পিত হস্তে কলসী থেকে স্বচ্ছ সলিল ঢেলে দিলো। তখন যেন ওর মনে হলো—'জলের সঙ্গে ঢেলে দিচ্ছে তার অফুরন্ত ভালোবাসার নির্ঝরোপম হৃদয়-মন।' স্থবির জল পানের পর বিহারের দিকে চলে গেলেন।

এই অনুরক্তা মেয়েটি নিশ্চল হয়ে অপলক সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে রইলো—আনন্দের শোভন গমন, মনোরম পদ-বিক্ষেপ। তিনি যখন ওর দৃষ্টি পথের অন্তরালে ধীরে অন্তর্হিত হয়ে গেলেন, তখন প্রিয়-বিরহে তরুণীর অন্তর বেদনাতুর হয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে মর্ম-বিদারী এক উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে পড়ল।

দুই

চণ্ডাল দুহিতা যুবতী-সুলভ মন্থর গতিতে গৃহাভিমুখে অগ্রসর হলো। ওর হৃদ-সমুদ্রে অনুরাগ-রঞ্জিত কতো যে, ভাব-তরঙ্গের সৃষ্টি হতে লাগল, তার অন্ত নেই। সে তন্ময় হয়ে ভাবছে কেবল আনন্দের কথা—কতো সুন্দর মুখচ্ছবি, কেমন প্রাণ-জুড়ানো কথা, হাসি কতো মধুর, চোখের

দৃষ্টিতে কেমন আকর্ষণী শক্তি, কী চমৎকার কোমল-মোহন প্রিয় সম্ভাষণ! তিনি নিশ্চয়ই আমায় ভালোবেসেছেন। তাঁর মনোরম মনোদ্যানে সরাগ-রঞ্জিত কুসুম নিচয় নিশ্চয়ই ফুটে উঠেছে। না হয়, অস্পৃশ্যার জল কেন পান করবেন? আমার কতো-না করলেন বর্ণনা!"

* * * *

কন্যা ঘরে এসে শঙ্কিত-সঙ্কোচে মাকে বল্‌ল---"মা, আজ দেখা হলো আনন্দের সঙ্গে। তিনি আমা হতে জল চেয়ে নিলেন; সেজল তিনি পান করেছেন।"

চণ্ডালিনী সভ্রূভঙ্গে জিজ্ঞাসা করল---"আনন্দ কে?"

"তিনি বুদ্ধ-শিষ্য, শ্রমণ আনন্দ, থাকেন জেতবনে।"

সবিস্ময়ে মা জিজ্ঞাসা করল---"সে পান করেছে তোর দেওয়া জল!"

"হ্যাঁ, করেছেন তো, কেন পান করবেন না? তিনি যে আমায় ভালো-বেসেছেন। আমার কতো প্রশংসা করলেন। বড়ো ভালো লোক উনি। অতি সুন্দর পুরুষ, কথা কতো মধুর, বড়ো ভদ্র, এমন চমৎকার পুরুষ আমার চোখে আর পড়েনি!" কন্যা বল্‌ল স্বচ্ছন্দ কণ্ঠে।

মাতা আশ্চর্য হয়ে বল্‌ল---"সে চণ্ডালের জল পান করলো!"

কন্যা প্রসন্ন মুখে বল্‌ল---"হ্যাঁ মা, তিনি আরো বলেন কি---'জন্ম হেতু কি চণ্ডাল হয়? চণ্ডাল হয় কর্মে। যার প্রাণে নেই দয়া-মায়া, যে নিষ্ঠুর, সে'ই তো চণ্ডাল।' মা, আমার মন-প্রাণ তাঁকে সঁপে দিয়েছি। আমি তাঁকেই চাই।"

বিদ্রূপ হাস্যে মা বল্‌ল---"বোকা মেয়ে, রূপ দেখে মজে পড়েছিস্। সে কি তোকে গ্রহণ করবে? সে যে সংসার-ত্যাগী সন্ন্যাসী!"

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে কন্যা বল্‌ল---"কেন মা? কেন করবেন না? তাঁর তো কোনো স্ত্রী নেই, উনি তো আমায় ভালোবেসেছেন! তুমি একবার গিয়ে দেখো মা।"

চণ্ডালিনী অনেক চিন্তার পর পরদিবসেই আনন্দের সন্ধানে বের হলো। খবর নিয়ে আনন্দের স্বরূপ অবগত হয়ে অপ্রসন্ন মনে সে ফিরে এলো।

বিরক্তির সহিত মেয়েকে বল্‌ল—"যা শ্রান্ত হলাম অনর্থক। বল্‌লাম শ্রমণ বিয়ে করে না, তবুও মেয়ে গোঁ ধরে রয়েছে। সে হলো রাজকুলের সন্তান, রাজ-সংসার ত্যাগ করে শ্রমণ হয়েছে। সব জেনে এসেছি, স্ত্রী গ্রহণ করা ওদের রীতি নয়; সে তোকে গ্রহণ করবে না।"

মায়ের কথা শুনে মেয়ে মর্মাহতা হলো। ওর বিরহানল জ্বলে উঠল তীব্রতর। শোকে হলো অভিভূত। ঝরতে লাগল অশ্রুবারি। প্রিয়-তমের বিচ্ছেদাশঙ্কায় সে বড়ো শঙ্কিত হয়ে পড়ল। অবলা-তরুণীর অন্তরে আর সহ্য হলো না। সে শয্যার আশ্রয় নিলো, ত্যাগ করল আহার-নিদ্রা। মেয়ের অবস্থা দেখে মাতা প্রমাদ গণল

মেয়ে কেঁদে কেঁদে মাকে বল্‌ল—"মা, আমার বক্ষ যেন বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে, আর সহ্য হচ্ছে না। ওঁকে না পেলে কিছুতেই বেঁচে থাকতে পারবো না। মা, তুমি তো যাদু-মন্ত্রে নিপুণা, সে মন্ত্র কেন প্রয়োগ করছো না?"

মেয়ের কথা জননীর মনঃপূত হলো। সে পর দিবস আনন্দকে নিমন্ত্রণ করতে গেল। স্থবির নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন; যথা সময়ে উপস্থিত হবেন। শুনে, চণ্ডালকন্যা হলো উৎফুল্ল। তখনই শয্যা ত্যাগ করে নিজকে নিয়োজিত করল গৃহকর্মে। স্থবিরের বসবার স্থান পরিষ্কার ও সজ্জিত করে মাতা-কন্যা অতি যত্নে সুখাদ্য প্রস্তুত করল। অতঃপর কুমারী স্নান করে প্রফুল্ল মনে আপন সজ্জায় ব্যাপৃতা হলো। পরিধান করল বিচিত্র বসন, কেশ-বিন্যাস করল সুদৃশ্য, সুন্দর অলঙ্কারে বিভূষিত করল সর্বাঙ্গ, অলক্তকে রঞ্জিত করল চরণ, সুগন্ধচূর্ণে বিমণ্ডিত করল মুখ-মণ্ডল। সে মনোমত করে নিজকে সাজাল।

যথা সময়ে চণ্ডাল-গৃহে আনন্দ উপস্থিত হয়ে সজ্জিত আসনে উপবিষ্ট হলেন। চণ্ডাল-দুহিতা হৃষ্ট মনে খাদ্য-ভোজ্য পরিবেষণ করল। আহার কৃত্যের অবসানে মাতঙ্গী * এসে প্রসন্নমুখে আনন্দকে বল্‌ল—"শ্রমণ, আমার মেয়ে তোমার পত্নী হতে চায়; তুমি ওকে পত্নীত্বে বরণ করে নাও।"

* চণ্ডালিনী

প্রত্যুত্তরে আনন্দ শান্ত কণ্ঠে বললেন---"উপাসিকে, বুদ্ধ-শিষ্য শ্রমণদের বিয়ে করার বিধান নেই।"

মাতঙ্গী অনুনয় বাক্যে বল্‌ল---"মেয়ে কিন্তু, তোমাকে চায়, সে তোমার জন্যই উন্মাদিনী হয়েছে; তোমায় না পেলে, সে আত্মঘাতিনী হবে।"

আনন্দ স্থিরকণ্ঠে বল্‌লেন---"অসম্ভব, উপায় নেই।"

তখন সে মেয়েকে অপ্রসন্ন মুখে বল্‌ল---"শোন্‌লে কন্যা, এ কি বল্‌ছে? তুই তো কেবল 'আনন্দ, আনন্দ' করেই মরতে বসেছিস্। তোর আনন্দকে এনে দিয়েছি, তোর কথা এখন তুইই বল্।" এ বলে বিরক্ত মনে সেখান থেকে চলে গেল।

তখন কেঁপে উঠল কুমারীর বক্ষস্থল। সুবেশা তরুণী মন্থর গতিতে কম্পিত-দেহে এসে আনন্দের পদপ্রান্তে প্রণতা হয়ে বল্‌লো---"প্রিয়তম, দয়া করুন; আমায় রক্ষা করুন, আমায় বাঁচতে দিন, আপনার পদে আশ্রয় দিয়ে আমার জীবন দান করুন। বলুন স্বামিন্, আমায় পত্নীরূপে গ্রহণ করলেন কি না?"

ষড়েন্দ্রিয় সংযমের একনিষ্ঠ সাধক, পূর্ণ ব্রহ্মচারী, সৎকায় (আত্ম) দৃষ্টির মূলোচ্ছেদকারী তত্ত্বদর্শী আনন্দ তখন স্থির-অচঞ্চল! অনুরাগ-মোহ তাঁকে স্পর্শ করতে পারল না। কন্দর্পের পুষ্পশর ব্যর্থ হলো। সংযম-ঘেরা মনোমন্দিরের লৌহ-কপাট ভঙ্গ করতে অসমর্থ হয়ে মদনদেব বিমর্ষ হলেন।

আনন্দ স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন---"ভগ্নি, শান্ত হও, ধৈর্য হারা হয়ো না। বুদ্ধ-শিষ্য শ্রমণগণ সংসার ত্যাগী। স্ত্রীলোক স্পর্শ করা তাঁদের বিধি-বিগর্হিত। বিরাগীর অন্তর কাম-পঙ্কে লিপ্ত হয় না। কল্যাণি, ধীর-চিত্তে শান্তির বাণী শোনো---

(১) এ দেহ একান্তই অনিত্য, ক্ষয়শীল ও ধ্বংসশীল। তা দুঃসহ দুঃখের আগার। এর নয়টি দ্বারে নিত্য রাশি রাশি ঘৃণিত-অপবিত্র পদার্থ ক্ষরিত হয়ে থাকে, অগণিত কৃমিকুলে এদেহ সমাচ্ছন্ন। চক্‌চকে পূতি-

চর্ম দেহের সমস্ত ঘৃণিত ও দুর্গন্ধময় পদার্থকে ঢেকে রেখেছে মাত্র। বিবিধ ভয়ঙ্কর দোষে দুষ্ট এদেহ তুমি সজ্ঞানে নিরীক্ষণ করো।

(২) কামান্ধা নারীর সুগন্ধ চূর্ণ-মণ্ডিত সুন্দর আনন, সুচারু কেশ-কলাপ, অঞ্জন-লাঞ্ছিত শোভন-নেত্র, অলক্তক-রঞ্জিত চরণ, বিচিত্র বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত দেহ মোহান্ধ অনুরাগীকেই মুগ্ধ করে মাত্র, কিন্তু কামরাগে দোষ-দর্শীকে নয়।''

তিন

আনন্দের বিরাগ-ব্যঞ্জক তথ্যপূর্ণ বাণী প্রমত্তা তরুণীর প্রগাঢ় অনুরাগ-রঞ্জিত অন্তরে ঘা দিতে পারল না। অপিচ, তাঁর সুমধুর কণ্ঠস্বর, মনো-মোহন কান্তি ও সুগঠিত অঙ্গ-সৌষ্ঠব সন্দর্শনে যুবতীর অন্তরে তীব্রতর হয়ে জ্বলে উঠল দাবাগ্নিসম অনুরাগাগ্নি। কামিনী-সুলভ অশ্রু বিসর্জন, অনুনয়--বিনয়, কাতরতা সবই ব্যর্থ হলো। আনন্দ অটল-অচল। তাঁর চিত্ত-কোকনদের একটা পাপ্‌ড়ীও কেঁপে উঠল না।

বঞ্চিতা, আশাহতা ও উপেক্ষিতা হয়ে অনন্যোপায়া কুমারী চক্ষে অন্ধকার দেখল। মর্মভেদী দুঃখে হলো বুদ্ধিভ্রষ্টা। হতাশার বহ্নিজ্বালা নিয়ে কম্পমান দেহে ধীরে নীরবে উঠে গেল নারী, স্থবিরের সম্মুখ থেকে। বল্‌ল মাকে বাষ্পরুদ্ধ স্বরে---''মা, আমাকে বাঁচাতে চাও যদি, তোমার মন্ত্রের আশ্রয় নাও। যে কোনো উপায়েই হোক্, এঁকে বশীভূত করো।''

চণ্ডালিনীর আদরের দুলালী একমাত্র মেয়ের এ দুঃখ দেখে মায়ের অন্তর বেদনায় ভারাক্রান্ত হলো। সে অতি চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ল। চক্ষু হলো অশ্রুসিক্ত। আবার তখনি আত্মসংবরণ করে সস্নেহে আপন আঁচলে মেয়ের চোখের জল মুছে নিলো। বল্‌ল গাঢ় স্বরে—''মা, তুই কাঁদিস্ না। তোকে ধনীর সন্তানকে বিয়ে দেবো, সে হবে এর চেয়েও সুন্দর। শ্রমণের কোনো প্রয়োজন নেই।''

মেয়ে কেঁদে উঠে বল্‌লো---''মা, অমন কথা বলো না। আমি আর

কাউকে চাই না, একমাত্র চাই ওঁকেই। না হয়, আমাকে মরতেই হবে।"

চণ্ডালিনী বিমর্ষ হয়ে বল্‌ল---"ওকে তো বশীভূত করা সম্ভব হবে না। বুদ্ধ আর বুদ্ধ-শিষ্য শ্রমণকে বশীভূত করতে পারে, তেমন শক্তি এ মন্ত্রের নেই।"

মেয়ে বল্‌লো অশ্রুরুদ্ধ স্বরে---"একবার চেষ্টা করে দেখো মা, ওঁকে যেতে দিও না, দ্বার বন্ধ করো, রাত্রে ইনি নিশ্চয়ই বশীভূত হবেন।"

মাতঙ্গী দ্বার রুদ্ধ করল। আনন্দকে আবদ্ধ করল মন্ত্র-শক্তির আবেষ্টনীতে। রাত ঘনিয়ে এল। চণ্ডালকন্যা প্রফুল্ল মনে শয্যা রচনা করলো অতি যত্নে। স্থবিরকে করল অনুরোধ-উপরোধ। পদপ্রান্তে লুটিয়ে পড়ে করল কাতর-ক্রন্দন। কিন্তু, আনন্দ শয্যায় গেলেন না। স্থির, শান্ত ও সুসংযত ভাবে নীরবেই তিনি বসে আছেন আপন আসনে। তিনি কেবল নিবিষ্ট মনে স্মরণ করতে লাগলেন দশবল বুদ্ধকে। তথাগতই তাঁর জীবনের একমাত্র অবলম্বন।

চণ্ডালিনী আনন্দের প্রতি ভীষণ রুষ্টা হলো। তখনিই সে মন্ত্রবলে অগ্নি প্রজ্বালিত করল অঙ্গনে। কী রোমাঞ্চকর অনল! দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল লেলিহান অগ্নিশিখা। মাতঙ্গী স্থবিরের পরিহিত বস্ত্র ধরে সজোরে টেনে নিয়ে গেল অগ্নি-সমীপে। রোষ-কষায়িত নেত্র বিস্ফারিত করে রুক্ষস্বরে বল্‌লো---"বলো এখন, আমার মেয়েকে গ্রহণ করবে কি না? অন্যথায়, এখনি তোমায় এ আগুনে নিক্ষেপ করবো; বলো শীগ্‌গির।"

আনন্দ মন্ত্রের প্রভাব অতিক্রম করতে না পারলেও, কিন্তু, অভিভূত ও মোহপ্রাপ্ত হন নি। এ বিপদ্‌কালে অন্তিম-শরণ মনে করে আর একবার তদ্‌গত চিত্তে স্মরণ করলেন সম্বুদ্ধকে।

প্রধান সেবক আনন্দের প্রথম ডাকই শুনেছেন সর্বজ্ঞ-সর্বদর্শী তাঁর দিব্যকর্ণে। দেখলেন তিনি দিব্য-দৃষ্টিতে আদি-অন্ত সমস্ত অবস্থা। কিন্তু, যথাসময়ের অপেক্ষায় ছিলেন তিনি এতক্ষণ। এখন উপযুক্ত সময় মনে করে অনন্যসাধারণ দশবল এমন এক মহাশক্তি প্রয়োগ করলেন, যার

প্রভাবে যাদু-মন্ত্রের শক্তি হলো সর্বতোভাবে বিনষ্ট ও নিস্তেজঃ। অগ্নি হলো নির্বাপিত, দিব্যশক্তিতে শক্তিমান্ হলো আনন্দ, মাতঙ্গী হলো ক্ষমতা-হীনা, ভুলে গেলো মন্ত্র-তন্ত্র, অন্তর হলো আতঙ্কগ্রস্ত, ওর দুর্বল-হস্ত থেকে খসে পড়ল আনন্দের ধৃত-বস্ত্র।

মুক্ত হলেন আনন্দ। তাঁর জীবনে এ এক মহা অগ্নিপরীক্ষা। এ পরীক্ষায় সগৌরবে উত্তীর্ণ হলেন তিনি। দুর্জয় সংগ্রামে হলেন জয়ী। মহাবীর-কন্দর্পকে করলেন পরাজয়। বিজয়ী-বীর বিজয়-মুকুট পরিধান করে রণক্ষেত্র ত্যাগ করলেন। সাফল্য-মণ্ডিত আনন্দ ভগবৎ সকাশে উপনীত হয়ে সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করলেন। নীরবে প্রসন্ন মনে শুনলেন তথাগত একনিষ্ঠ সেবকের বিবৃতি।

এদিকে মাতঙ্গকন্যার অবস্থা কি হলো? আনন্দ যখন প্রাঙ্গণ থেকে চলে যাচ্ছিলেন, তা'দেখে সে উচৈচঃস্বরে কেঁদে উঠল। এ বিরহ-বেদনা তাঁর অসহ্য হলো। তীব্র মর্মদাহ সহ্যের সীমা করল অতিক্রম। সে সংজ্ঞাহারা হয়ে ভূতলে লুটিয়ে পড়ল, বাণ-বিদ্ধা হরিণীর মতো।

আনন্দের প্রস্থানের পর চণ্ডালিনী প্রকৃতিস্থা হলো। সে ক্ষোভ স্বরে বলে উঠল----"পারলাম না রাখতে, চলে গেলো! কী যে হয়ে গিয়েছিলাম আমি, শক্তি-সামর্থ্য হারিয়ে, মন্ত্র-তন্ত্র ভুলে, এমন কেন হয়ে গেলাম? এ শ্রমণ তো যেমন-তেমন গুণবান নয়! যাক্, আপদ গেছে।" তখন চীৎকার করে মেয়েকে বল্ল---"কি জন্য কাঁদ্‌ছিস্ অভাগীর মেয়ে? আমি না তোকে বলেছিলাম---বুদ্ধ-শিষ্যকে অভিভূত করার মতো তেমন শক্তি নেই আমার মন্ত্রে?"

কিছুক্ষণ পরে কুমারী সম্বিৎ ফিরে পেয়ে আবার কেঁদে উঠল। সারা-রাত মেয়েটা কেবল গুম্‌রে গুম্‌রে, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে কাটালো। কখনো কখনো সে আর্তকণ্ঠে বলে উঠল---"আমার প্রাণ-পাখী শিকল কেটে উধাও হয়ে গেছে।"

বিরহ-বিধুরা যুবতী কেঁদে কেঁদে শ্রান্ত হয়ে শেষে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে, সেও জানে না। যখন নিদ্রা ভেঙ্গে গেল, তখন চোখ মেলে

দেখল—বৃক্ষের পত্র-কিশলয়ে লেগেছে সোনালী সূর্য-কিরণ। মাকড়সার জালে চিক্‌চিক্ করছে শিশির-বিন্দু। ভূমিশয্যা ত্যাগ ক'রে সে ক্লান্ত ভাবে ওঠে বসল। ওর অঙ্গ ও বেশ-বাস ধূলি-মলিন, কুন্তল বিস্রস্ত, চোখের কোণে ও গণ্ডে শুকিয়ে আছে অশ্রুচিহ্ন। অবসাদে ভেঙ্গে পড়ছে দেহ, তবুও সে দাঁড়িয়ে উঠল। দীর্ঘ একটা নিশ্বাস মোচন করে চলতে আরম্ভ করল শ্লথ-চরণে।

অশান্ত মনে, আলুলায়িত বেশে বের হয়ে পড়ল সে প্রিয়তমের সন্ধানে, উন্মাদিনীর মতো। ওর সন্ধানী চোখের আকুল-দৃষ্টি বিন্যস্ত করতে লাগল দিকে দিকে। ওর মুখ বিমর্ষ, চোখ সজল, গতিবেগ কোনো সময় দ্রুত, আর কোনো সময় মন্থর, কোনো সময় দাঁড়িয়ে দেখে চারিভিতে। সতৃষ্ণ নয়নে অন্বেষণ করতে লাগল তার বাঞ্ছিতকে, মণিহারা ফণিনীর মতো।

বহুক্ষণ চল্‌তে চল্‌তে হঠাৎ দেখা পেল তার হারাণো নিধির। থম্‌কে দাঁড়াল তরুণী। অন্তরে স্ফুরিত হলো বিদ্যুৎ-ঝলক্, প্রাণে জাগল পুলক-শিহরণ। সতৃষ্ণ-দৃষ্টি নিবদ্ধ করল প্রিয়তমের প্রিয়মুখে। তখন আনন্দ অন্ন-ভিক্ষা সংগ্রহে রত ছিলেন। তিনি যে দিকে যান, কুমারীও যায় সেদিকে। তিনি দাঁড়ালে, সেও দাঁড়িয়ে চেয়ে থাকে এক দৃষ্টিতে। স্থবিরের আপাদমস্তকে ঘুরতে থাকে ওর মুগ্ধ-দৃষ্টি। ভিক্ষার্থী আনন্দ কারও বাড়ীতে প্রবেশ করলে, দূরে দাঁড়িয়ে সেও করে প্রতীক্ষা।

পূর্ণ যৌবনা যুবতী-নারীর এরূপ অশোভন ও অসঙ্গতভাবে পশ্চাদনুসরণে আনন্দ বড়ো লজ্জিত ও সঙ্কোচিত হয়ে পড়লেন। কিছুতেই একে এড়াতে না পেরে, অগত্যা তিনি ভিক্ষা করা বন্ধ করে বিহারাভিমুখেই ফিরে চললেন। তরুণীও তাঁকে অনুসরণ করল। আনন্দ এসে দাঁড়ালেন জেতবন বহিঃদ্বারে। সেও এসে দাঁড়াল তাঁর সম্মুখে। গণ্ড বেয়ে ঝরছে অশ্রুবারি, চক্ষে আকুল-দৃষ্টি, মুখে ব্যথা-বন্যার গাঢ় ছায়া। ওর অবস্থা দেখে করুণার উদ্রেক হলো আনন্দের অন্তরে। তিনি করুণার্দ্র কণ্ঠে বললেন—"ভগ্নি, আমায় অগ্রজ ভ্রাতা বলে তোমার অন্তরে স্থান দেবে। তোমার অসঙ্গত চিত্ত-ভাব পরিত্যাগ করো। মনশ্চক্ষে দর্শন

করো তোমার-আমার এ পূতিদেহ অসার ও অনিত্যময়। বুদ্ধ-শিষ্যেরা কেমন বিরাগী, তা'তো তুমি জানো না। এখানে দাঁড়িয়ে থাকা অনর্থক, ঘরে ফিরে যাও।" এতদূর বলে আনন্দ সেখান থেকে চলে গেলেন। তিনি সুগত সমীপে উপনীত হয়ে বন্দনান্তে বললেন—"ভগবন্, আজ ভিক্ষার সময় সে মেয়েটি সারাপথ আমার অনুসরণ করে জেতবনের বহিঃদ্বার পর্যন্ত এসেছে।"

বুদ্ধ তখন আদেশ করলেন—"ওকে ডেকে নিয়ে এসো।"

চার

এদিকে চণ্ডাল দুহিতা দুর্বার মনোদুঃখে বুদ্ধিভ্রষ্টা হয়ে বহিঃদ্বারে দাঁড়িয়ে থাকলো কিয়ৎকাল। সে যেন কোনো মায়াবীর মন্ত্রকুহকে চলৎশক্তিহীনা হয়ে গেছে। চোখ দু'টি হয়েছে অরুণাভ। দুর্বিসহ দুঃখসন্তাপে শুকিয়ে গেছে চোখের জল। নিষ্পিষ্ট হচ্ছে ওর মর্মস্থল। কেউ বুঝ্‌ল না ওর অন্তরের বেদনা, বুঝ্‌তেও চায় না কেউ। কি করবে, কোথা যাবে, চিন্তার যেন পারাপার নেই।

তখন ওর স্মরণ হলো আনন্দের আদেশ। "তিনি তো আদেশ করেছেন চলে যেতে। তিনি যে আমার অন্তর্দেবতা। তাঁর আদেশ অমান্য করবো না; আমি চলে যাবো, চিরতরে চলে যাবো। তাঁকে যদি না পাই, তবে আর কেন? এ জীবনের আর প্রয়োজন কি? এ দারুণ বিরহ-যন্ত্রণা আমি সহ্য করতে পারবো না। নিশ্চয়ই এর যবনিকা টেনে দেবো," চিন্তা করল বিধুরা-বালা। তখন সে স্বপ্নাবিষ্টার মতো শ্লথ-চরণে ধীরে, অতি ধীরে ফিরে চল্‌ল। কিন্তু, রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে তার মন্থর গতি। অগ্রসর হতে অনিচ্ছুক যেন তার চরণ যুগল। কয়েক পদ মাত্র অগ্রসর হয়েছে, এমন সময় সুধা-বর্ষণ সম শ্রুতি গোচর হলো তার প্রিয়তম আনন্দের আহ্বান সচক মধুর কণ্ঠস্বর—"উপাসিকে।"

ভাবাবিষ্টা তরুণী হঠাৎ ভাবতন্দ্রা থেকে জেগে উঠল। চকিতে ফিরালো তার বেদনা-ক্লিষ্ট শীর্ণ-মুখ। আনন্দকে দেখে সে উৎফুল্লান্তরে ছুটে এলো। স্থবিরের প্রতি নিবদ্ধ করল তার উৎসুক দৃষ্টি। মুখে টেনে আন্‌ল হাসির রেখা। কিন্তু, বড়ো ম্লান-হাসি, সে হাস্যে যেন প্রাণ নেই, সজীবতা-শ্যামলতা হীন বিশুষ্ক বনানীর মতো।

আনন্দ বললেন—"বোন্, তথাগত বুদ্ধ তোমায় ডাকছেন।"

এ কথা শুনেই যেন ওর হৃদয়-তন্ত্রীতে সপ্ত সুরের মধুর মূর্ছনা ঝঙ্কার দিয়ে উঠল। অন্তরে জাগল প্রীতি-তরঙ্গের উচ্ছ্বাস। তখনই সে হৃষ্টমনে উপনীত হলো সুগত সমীপে। বন্দনা-বিনতা হলো সম্বুদ্ধের চরণকমলে।

বুদ্ধ স্নিগ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন—"উপাসিকে, তুমি আনন্দকে অনুসরণ করছো কেন?"

আনন্দের নাম শুনেই তরুণীর চক্ষু সজল হয়ে উঠল। সে আনত-মুখে, কাতর স্বরে বল্‌ল—"প্রভু ,শুনেছি উনি অবিবাহিত; আমিও অবিবাহিতা। তাঁকে প্রাণাধিক ভালোবেসেছি; আমি তাঁর পত্নী হতে চাই।"

করুণাঘন অন্তরে বুদ্ধ বল্‌লেন—"শোনো উপাসিকে, আনন্দ হলো সংসার ত্যাগী ভিক্ষু। ওর মস্তক কেশহীন্, মুণ্ডিত। কিন্তু, তোমার মস্তকে এখনও বিদ্যমান রয়েছে সুদীর্ঘ কেশরাশি। তুমি যদি মস্তক মুণ্ডিতা হয়ে আসতে পারো, তা হলে নিশ্চয়ই আমি আনন্দের সঙ্গে তোমার মিলন করে দেবো।"

যুবতী তখন হর্ষোৎফুল্ল হয়ে বল্‌লো—"আমার প্রাণারাম আনন্দের পক্ষে এ কেশ কি ছার্! এর চেয়েও যদি গুরুতর কিছু বলেন প্রভু, তাও ত্যাগ করতে প্রস্তুত আছি। আমি এ মুহূর্তেই এ তুচ্ছ কেশ পরিত্যাগ করবো।"

বুদ্ধ বল্‌লেন—"বেশ কথা, তুমি গৃহে যাও, তোমার মাকে একথা বলো। মস্তক মুণ্ডন করে আবার আমার নিকট এসো।"

চণ্ডাল-দুহিতা হর্ষোৎফুল্ল হয়ে সুগতকে বন্দনান্তর দ্রুত গৃহাভিমুখে চলে গেল। ঘরে এসে আহ্লাদের সহিত মাকে বল্‌লো—"মা, শীগ্‌গির

আমার মস্তক মুণ্ডন করে দাও। শ্রীবুদ্ধ বলেছেন---'যদি মস্তক মুণ্ডন করে যাই, তবে তিনি আনন্দের সাথে আমার মিলন করে দেবেন।''

মাতা অপ্রসন্ন মুখে বল্‌ল---''কি বল্‌ছিস্ তুই অভাগী-মেয়ে! শোন্ আমার কথা, কেন ছেদন করবি এমন সুন্দর কেশ? কি বিশ্রী দেখাবে। শ্রমণকে বিয়ে করার প্রয়োজন নেই। দেশে কতো সুদর্শন ছেলে আছে, তাদের কারো সাথে তোর বিয়ে দেবো। এতো উতলা হচ্ছিস্ কেন? একটু অপেক্ষা কর্ না! জেনে রাখিস্, আমা হতে তোর জন্ম। মা চায় মেয়ের কল্যাণ।''

মেয়ে বিমর্ষ হয়ে বল্‌ল---''মা, অমন কথা আর মুখে এনো না। এরূপ কথা আমার অন্তরে বড়ো ব্যথা দেয়। এক জনকে ভালোবেসে হৃদয় দান করেছি, তা আবার কি করে অপরকে দেবো? মা, তুমি কি আমায় দ্বিচারিণী হতে বলো? অসম্ভব, তা কখনো হতে পারবো না। তোমার পায়ে পড়ি মা, ত্বরা করে আমার মাথা মুড়িয়ে দাও।''

মাতা সাশ্রু মুখে বল্‌ল---''তুই অভাগি, আমাদের জাতির লজ্জা।'' এ বলে চণ্ডালিনী ক্ষুর নিয়ে অশ্রু বর্ষণ করতে করতে নিজ হস্তে মেয়ের মস্তক মুণ্ডন করে দিল।

পাঁচ

তরুণীর অনুরাগ-রঞ্জিত অন্তরে আজ অসীম আনন্দ। তা'কে বিহ্বলা করে তুলেছে কতো সুখ-দায়িনী চিন্তা---''আজ লাভ করবো তাঁকে, যিনি আমার বাঞ্ছিত রত্ন, সাধনার ধন, সারা জীবনের সাথী। প্রিয়তমের সঙ্গে হবে মিলন, মধুর মিলন, চির মিলন।'' উতলা তরুণী ভাবাবিষ্ট হয়ে জেতবন অভিমুখে অগ্রসর হলো চঞ্চল গতিতে, প্রগাঢ় তৃষ্ণার চির-নিবৃত্তি মানসে, তৃষিতা চাতকিনীর মতো।

আজ তার এ আকুলতা, উন্মাদনা ও উচ্ছাসের কী যে হবে পরিণতি, তা' তো সে জানে না। তার এ যাত্রা কি শুভ, না অশুভ, তাও তো

বুঝবার উপায় নেই। তৃষ্ণা-শৃংখলের দৃঢ়-বন্ধন আরো কি দৃঢ়তর হবে, না-কি ছিন্ন হবে চিরতরে, তাও তো দুর্জ্ঞেয়। আজ কেন তার মনোমন্দিরে এমন অমিয়-মধুর মোহন-সুর বেজে উঠেছে? ধ্বনিত হচ্ছে কেন শান্তির বাণী? হৃদয়-মরুতে কেন প্রবাহিত হচ্ছে প্রীতি-নির্ঝরিণী?

* * * *

তথাগত সমীপে ধীরে বিনম্র দেহে উপনীত হলো চণ্ডাল-দুহিতা। প্রণতা হয়ে সে কোমল স্বরে বল্‌লো---"প্রভু, আমি মস্তক মুণ্ডন ক'রে এসেছি।"

বুদ্ধ জিজ্ঞাসা করলেন---"তুমি কি আনন্দকে ভালোবাসো?"

উত্তর হলো---"হ্যাঁ প্রভু।"

"ওর দেহের কোন্ অংশকে তুমি বেশী ভালোবাসো?"

"তাঁর চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, মুখমণ্ডল, কণ্ঠস্বর, তাঁর অঙ্গভঙ্গী, তাঁর পদবিক্ষেপ, তাঁর সবই আমি ভালোবাসি।"

বুদ্ধ তখন ঋদ্ধিময় দেশনা-বিলাসে করুণার্দ্র কণ্ঠে বল্‌লেন---"উপাসিকে, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ও মুখে সর্বত্রই রয়েছে ঘৃণিত অশুচি পদার্থ। এ দেহে আরো রয়েছে অপবিত্র দুর্গন্ধময় বিষ্ঠা-মূত্র। এ দেহ ব্যাধির আকর এবং নিত্য নব নব তৃষ্ণায় হয় জর্জরিত। ভোগে হয় না তৃষ্ণার নিবৃত্তি, লবণ-সমুদ্রের জল পানের মতো। এ দেহ বড়ো জঘন্য। রূপ, লালিত্য ও যৌবন অসার ও অধ্রুব। স্ত্রী-পুরুষের সম্মিলনে ঘৃণ্য-অশুচি পদার্থ থেকে সন্তানের জন্ম হয়। জন্ম হলে মৃত্যু অনিবার্য। মৃত্যুতে প্রিয়-বিচ্ছেদ জনিত দুঃখ অপরিহার্য। এমন দোষের আকর এ দেহকে ভালোবেসে কি লাভ?"

বিনায়ক বুদ্ধ কুমারীর চিত্তানুযায়ী পরিবেষণ করলেন কায়গতা-স্মৃতি ভাবনার মর্মস্পর্শী উপদেশ। তিনি এমন এক ঋদ্ধিশক্তি প্রয়োগ করলেন, যার প্রভাবে চণ্ডাল-দুহিতা দিব্যদৃষ্টিসম মনশ্চক্ষে সম্যক্ প্রত্যক্ষ করল দেহস্থ দ্বাত্রিংশ অশুচির যথার্থ স্বরূপ। সম্বুদ্ধ প্রদত্ত উপদেশ বাণীর প্রত্যেক

বিষয়ই ছায়াচিত্রের সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবির ন্যায় ওর জ্ঞান-দর্পণে আশ্চর্যরূপে প্রতিভাত হলো। তদ্‌গত-চিত্তে সে তদ্‌ভাব ভাবনায় হলো অভিনিবিষ্ট।

সর্বশক্তিমান্ তথাগতের মহাশক্তি-প্রভাবে চণ্ডাল-দুহিতা সম্যক্ উপলব্ধি করল দেহের প্রকৃত স্বরূপ, অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্মের আধ্যাত্মিক তত্ত্ব। ঘৃণিত, নশ্বর ও দুঃখময় দেহের প্রতি উৎপন্ন হলো তীব্র বিরাগ। সম্প্রাপ্ত হলো যখন বিরাগের চরমসীমা, সেই শুভক্ষণেই ওর চিত্ত হলো তৃষ্ণামুক্ত। নিরবশেষ ধ্বংস প্রাপ্ত হলো অবিদ্যা। আত্যন্তিক দুঃখের হলো নিবৃত্তি। রুদ্ধ হলো জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহ। অর্হত্ব লাভ করলেন চণ্ডাল-তনয়া।

সর্বজ্ঞ বুদ্ধ তাঁর চিত্তভাব জ্ঞাত হয়ে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন---"উপাসিকে, এখন তুমি আনন্দের নিকট যেতে পারো।"

লজ্জায় নতশির হলেন তৃষ্ণাহীনা মাতঙ্গসুতা। সুগতের চরণপ্রান্তে লুটিয়ে পড়ে মার্জনা ভিক্ষা চাইলেন তাঁর অজ্ঞানকৃত অপরাধের। তিনি প্রকাশ করলেন তৃষ্ণাক্ষয়ের কথা---"প্রভু, আমার সেই অনুরাগের মূল কারণ সমূলে উৎপাটিত হয়েছে। দারুণ দুঃখময় আসক্তি-সমুদ্রে নিমগ্ন ছিলাম; কিন্তু প্রভু, উদ্ধার করলেন আপনি। ভগবন্, আমি এখন ভিক্ষুণী-ধর্মে দীক্ষা নিতে চাই।"

* * * *

চণ্ডাল-কন্যার আর্হত্ব লাভের কথা শুনে আনন্দ সবিস্ময়ে চিন্তা করলেন--"কি আশ্চর্য, যে নারী এতোই আসক্তি পরায়ণা, দুর্দমনীয় কামরাগানুরক্তা, সে নারীর আর্হত্ব লাভ, আশ্চর্য বটে! সম্বুদ্ধের কী অসাধারণ গুণমহিমা, পরশ-মণির সংস্পর্শে এলে লোহাও যে সোনা হয়ে যায়!"

মাতঙ্গ-তনয়ার তৃষ্ণা-মুক্তিতে আনন্দ অত্যধিক সন্তুষ্ট হলেন। কারণ, এ রমণী তাঁকে বড়ো লজ্জিত, চিন্তিত ও শঙ্কিত করে তুলেছিল। এ শুভ সংবাদ ভিক্ষুদের নিকট বিজ্ঞাপিত করলেন তিনি। সকলেই কৌতূহলী হয়ে জানতে চাইলেন এর নিগূঢ়-তত্ত্ব। তখন আনন্দ প্রমুখ ভিক্ষুগণ সুগত সমীপে উপনীত হলেন এবং বন্দনান্তে উপবেশন করলে, তাঁদের

নিকট বুদ্ধ প্রকাশ করলেন চণ্ডাল-দুহিতার আর্হত্ব লাভের বিবৃতি।

তখন আনন্দ জিজ্ঞাসা করলেন---"প্রভু, যে নারী ছিলেন এমন আসক্তি পরায়ণা, তিনি কিরূপে তৃষ্ণাক্ষয় করলেন?"

সম্বুদ্ধ বললেন---"আনন্দ, সৌরভ-মণ্ডিত পদ্ম পঙ্কেই জাত হয়। কর্মের বিধান বিস্ময়কর ও অচিন্তনীয়। কর্মশক্তি প্রাণীকুলকে বিবিধ অবস্থায় করে রূপায়িত। শোনো ভিক্ষুগণ, এ চণ্ডাল-দুহিতা অতীত পঞ্চশত জন্মে আনন্দের সহধর্মিণী ছিল। পঞ্চশত জন্মাবধি এ দম্পতীর মধুর-মিলন ও প্রেম-ভালোবাসার মোহন-রেখা উভয়ের চিত্ত-পটে অঙ্কিত হয়ে রয়েছে গাঢ়তর রূপে। তাই এদের মর্মস্থলে তীব্র আকর্ষণের তড়িৎ-শক্তি উন্মুখ হয়ে রয়েছে। কোকনদে যেমন প্রাকৃতিক বিধানে মধু-সৌরভ সঞ্চার হয়, সেরূপই ভিক্ষুগণ, এজন্যে প্রথম দর্শনেই উভয়ের অন্তরে সঞ্জাত হয়েছে প্রীতি, মৈত্রী ও ভালোবাসা। জ্ঞানের তারতম্যে তাদের প্রকৃতি হয়েছে বিভিন্ন প্রকার। পরিশেষে এখন আবার উভয়ে সদ্ধর্মের বেদীমূলে ভ্রাতা-ভগ্নীরূপে মিলিত হয়েছে। অতীতের কুশল কর্মের প্রভাবে এ মহীয়সী নারী এখন ছিন্ন করেছে আসক্তির সুদৃঢ় বন্ধন। উত্তীর্ণ হয়েছে দুঃখ-পারাবার। সত্য-ধর্মের এমনি অজেয় প্রভাব।" এ বলে তথাগত নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করলেন---

"পুব্বেব সন্নিবাসেন পচচুপপন্নহিতেন বা,
এবং তং জাযতে পেমং উপ্পলংব যথোদকে'তি।"

অতীত জনমে যদি ঘটে থাকে প্রীতি প্রেম ভালোবাসা,
তৃষ্ণার বন্ধন মধুর মিলন প্রগাঢ় মোহের নেশা।
ভবান্তরে তবে দেখা হলে কভু একে অন্যের সহিত,
জেগে ওঠে হৃদে স্নেহ ভালোবাসা দেখে হয় বিমোহিত।
পদ্মে যথা মধু সৌরভ মাধুর্য স্বতঃই সঞ্জাত হয়,
চিত্ত-কোকনদে জাত হয় তথা আসক্তি চেতানাময়।
সংস্কার বশে আপনা হতেই তীব্রতর আকর্ষণ,
এসে পড়ে চিতে মমতা লালসা অতর্কিতে গ্রাসে মন।

দুঃখের জননী তৃষ্ণা মায়াবিনী জন্মে জন্মে অনুসারী,
তৃষ্ণা-উৎপাটন করে মুক্ত হন্ যিনি পূর্ণ-ব্রহ্মচারী।

(শার্দূল কর্ণাবদানের ছায়াবলম্বনে)

১৫। পরিব্রাজক ছন্ন ও আনন্দ---

তখন জ্ঞাননিষ্ঠ আনন্দ শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন। তৎসন্নিধানে এক দিবস সমাগত হলেন ছন্ন নামক পরিব্রাজক। উভয়ের সন্তোষ-জনক আলাপের পর ছন্ন প্রিয়-বাক্যে জিজ্ঞাসা করলেন---"বন্ধু আনন্দ, রাগ (আসক্তি), দ্বেষ ও মোহের প্রহীণ সম্বন্ধে আমরা যেরূপ কারণ দেখিয়ে থাকি, আপনারাও কি সেরূপ কারণ দেখিয়ে থাকেন? এ ত্রিবিধ বিষয়ের কিরূপ দোষই বা আপনারা বর্ণনা করেন এবং এর প্রহীণ সম্বন্ধেই বা কিরূপ উপদেশ দিয়ে থাকেন?"

আনন্দ স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন---"বন্ধু, অনুরাগ যদি চিত্ত অধিকার করে, তা হলে চিত্ত সে বিষয়েই অনুরক্ত হয়ে পড়ে এবং তদ্দ্বারাই অভিভূত হয়। এতেই হয় নিজেরও অহিত সাধন, পরেরও অহিত সাধন। তাতেই দুঃখ ও মনস্তাপের সৃষ্টি হয়। রাগ, দ্বেষ ও মোহ যখন প্রহীণ হয়, তখন আর আপন-পর কারও হয় না অহিত সাধন এবং সৃজনও হয় না দুঃখ-দুর্দশার।

যে ব্যক্তি রাগানুরক্ত, দ্বেষদুষ্ট ও মোহমূঢ়, তার চিত্ত এ ত্রিবিধ দোষে পরিগৃহীত ও অভিভূত হয়ে পড়ে। সে ব্যক্তিই কায়িক, বাচনিক ও মানসিক দুষ্কর্ম আচরণ করে। যখন রাগ, দ্বেষ ও মোহ প্রহীণ হয়, তখন আর সম্পাদন করে না---কায়িক, বাচনিক ও মানসিক দুষ্কর্ম। যার চিত্ত দোষত্রয়ে অনুরক্ত, অভিভূত ও পরিগৃহীত হয়েছে, সে ব্যক্তির আপন-পর কারও সম্বন্ধে কল্যাণ জ্ঞান থাকে না। যখন ত্রিদোষ প্রহীণ হয়, তখন আপন-পর সকলের প্রতিই বিদ্যমান থাকে যথাযথ কল্যাণ-জ্ঞান। রাগ, দ্বেষ ও মোহানুরাগী ব্যক্তির জ্ঞান-চক্ষু হয় অন্ধীভূত, আচ্ছন্ন হয় সত্য-দর্শন, হৃত হয় জ্ঞান-বিজ্ঞান, ধ্বংস হয় প্রজ্ঞা, বিমুক্তি হয় কণ্টকাচ্ছন্ন।

বন্ধু, আমরা রাগ, দ্বেষ ও মোহের এসব দোষই দেখিয়ে থাকি। তারপর দেখিয়ে থাকি অলোভ, অদ্বেষ ও অমোহের উপকারিতা। রাগ, দ্বেষ ও মোহ প্রহীণের যথোচিত উপায় ও প্রতিপাল্য বিষয় বিদ্যমান আছে। সে উপায় হলো—আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ; যথা—সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সঙ্কল্প, সম্যক্ বাক্য, সম্যক্ কর্মান্ত, সম্যক্ আজীব, সম্যক্ চেষ্টা, সম্যক্ স্মৃতি ও সম্যক্ সমাধি। এগুলিই প্রশস্ত উপায় ও প্রতিপাল্য বিষয়।"

তখন পরিব্রাজক ছন্ন প্রসন্ন হয়ে বললেন—"বন্ধু আনন্দ, রাগ, দ্বেষ ও মোহের প্রহীণ কল্পে এটাই 'ভদ্র-মার্গ' ও ভদ্রা-প্রতিপদা'। এরূপ মার্গ-প্রতিপদার বিদ্যমান হেতু আপনাদের 'অপ্রমাদ' শব্দের প্রয়োগ একান্তই যুক্তিযুক্ত হয়েছে। বন্ধু, অপ্রমাদের সহিত সম্পাদন করুন আপন কর্তব্য। এবার বিদায় হই বন্ধু।"

(অঙ্গুত্তর নিকায়—তিক নিপাত)

১৬। প্রকৃত অনুকম্পা—

বৈশালীর মহাবনস্থ কূটাগার শালা। কল্যাণ-নিদান সম্বুদ্ধ জগতের কল্যাণ বিধান মানসে আনন্দকে এরূপ উপদেশ দিয়েছিলেন—"আনন্দ, যে কোনো মিত্র-সুহৃদ হোক অথবা রক্তের সম্বন্ধযুক্ত জ্ঞাতি হোক, তারা যদি সদ্ধর্ম শুনতে চায়, তা হলে তাদের প্রতি এরূপ অনুকম্পাই করবে—তাদের ত্রিবিধ বিষয়েই প্রতিষ্ঠাপিত করবে, তা সম্যক্‌রূপে গ্রহণ করাবে এবং তৎপ্রতি চিত্ত নমিত করাবে। সে তিনটা বিষয় হলো-- বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ।

১। সেই তথাগত---'অর্হৎ, সম্যক্ সম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণ সম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ্, অনুত্তর পুরুষ-দম্য সারথি, দেব-নরের শাস্তা, বুদ্ধ ও ভগবান' ইত্যাদি অভিধা-ভূষিত অমিতাভের প্রতি তাদের অচলা-শ্রদ্ধায় প্রতিষ্ঠাপিত করবে, সম্যক্‌রূপে শরণ গ্রহণ করাবে এবং তৎপ্রতি চিত্ত নমিত করাবে।

২। ভগবৎ ধর্ম---'সু-আখ্যাত, সংদৃষ্টিক, অকালিক, এস-পশ্যিক, ঔপনায়নিক এবং বিজ্ঞদের স্বয়ং জ্ঞাতব্য' ইত্যাদি অভিধা-মণ্ডিত সদ্ধর্মের

প্রতি তাদের অচলা-শ্রদ্ধায় প্রতিষ্ঠাপিত করবে, সম্যক্‌রূপে শরণ গ্রহণ ও তৎপ্রতি চিত্ত নমিত করাবে।

৩। তথাগতের শ্রাবকসংঘ---'সুপ্রতিপন্ন, ঋজুপ্রতিপন্ন, ন্যায়-প্রতিপন্ন, সমীচীন প্রতিপন্ন, চতুর্বিধ পুরুষ যুগলই অষ্ট পুরুষ পুদ্‌গল *, সম্বুদ্ধের শ্রাবকসংঘ আহ্বানীয়, দান পাবার ও দান দেবার যোগ্য, অঞ্জলি করণীয় এবং ত্রিলোকের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র' এবম্বিধ অভিধা ভূষিত সংঘের প্রতি তাদের অচলা-শ্রদ্ধায় প্রতিষ্ঠাপিত করবে, সম্যক্‌রূপে শরণ গ্রহণ ও তৎপ্রতি চিত্ত নমিত করাবে।

আনন্দ, ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও বায়ুধাতু এ মহাভূত চতুষ্টয়ের পরস্পর সম্মিলনে যেরূপ স্বভাব-ধর্ম প্রাপ্ত হওয়া উচিত, কোনো কোনো স্থলে হয়তঃ এর ব্যতিক্রমও ঘট্‌তে পারে; কিন্তু আনন্দ, বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা সম্পন্ন আর্যশ্রাবকের কখনও অন্যথাভাব প্রাপ্তি ঘটে না। অন্যথা ভাব হলো---নরক, তির্যক ও প্রেতকূল। ত্রিরত্নে অচলা-শ্রদ্ধা সম্পন্ন আর্যশ্রাবকগণ অপায়ে যে উৎপন্ন হবে, তার কারণ এখানে বিদ্যমান নেই। তাই বলছি আনন্দ, যে কোনো মিত্র-সুহৃদ অথবা রক্তের সম্বন্ধ-যুক্ত জ্ঞাতি হোক, তাদের প্রতি যদি অনুকম্পা করতে চাও, তবে উক্তরূপ অনুকম্পাই করবে, এটাই প্রকৃত অনুকম্পা, শ্রেষ্ঠতম অনুকম্পা।"

জ্ঞানপিপাসু আনন্দ সম্বুদ্ধের অতুলনীয় বাণী সানন্দে অনুমোদন ও অভিনন্দন করলেন।

(অঙ্গুত্তর নিকায়)

১৭। গুণগন্ধ—

শ্রাবস্তীর জেতবন বিহার। অনুসন্ধিৎসু আনন্দ এক দিবস তথাগতকে জিজ্ঞাসা করলেন---"ভন্তে ভগবন্, জগতে তিন জাতীয় গন্ধ বিদ্যমান আছে; যথা---মূলগন্ধ, সারগন্ধ ও পুষ্পগন্ধ। তা কেবল বায়ুর অনুকূলেই

* স্রোতাপন্ন, সকৃদাগামী, অনাগামী ও অর্হৎ মার্গস্থ-ফলস্থ।

প্রবাহিত হয়, প্রতিকূলে নয়। প্রভু, জগতে এমন কোনো প্রকার গন্ধ আছে কি, যা বায়ুর অনুকূল-প্রতিকূল উভয় কূলেই প্রবাহিত হয়?"

বুদ্ধ বললেন---হ্যাঁ আনন্দ, এরূপ গন্ধ নিশ্চয়ই আছে।"

"ভন্তে, তা কোন্ জাতীয় গন্ধ?"

"আনন্দ, এ জগতে যে সব নর-নারী ত্রিরত্নের শরণাপন্ন হয়, প্রাণিহত্যা, চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যা ভাষণ ও মাদক-দ্রব্য সেবন থেকে বিরত হয়; কল্যাণ ধর্ম পরায়ণ হয়; কৃপণতা বর্জন করে দানে মুক্ত-হস্ত হয় এবং সমদর্শী হয়ে সমভাবে খাদ্য-ভোজ্য বণ্টন করে, তাদের সুখ্যাতি করে চতুর্দিকস্থ জন-সাধারণ। দেবতা পর্যন্ত তাদের গুণ-কীর্তন করে---'অমুক দেশের নর-নারী এরূপ কল্যাণধর্ম পরায়ণ।"

আনন্দ, এ'ই তো সুখ্যাতিরূপ সুগন্ধ। এ গুণ-গন্ধই বায়ুর অনুকূল-প্রতিকূল উভয় দিকেই প্রবাহিত হয়। জগতে পুষ্প-গন্ধাদি যত প্রকার গন্ধ বিদ্যমান আছে, তা বায়ুর অনুকূলেই প্রবাহিত হয় মাত্র, কিন্তু সৎপুরুষের সদ্‌গুণ-গন্ধ সকল সময় অনুকূল-প্রতিকূল সকল দিকেই প্রবাহিত হয়।

ধর্মনিষ্ঠ আনন্দ সুগতের সারবাণী সানন্দে অভিনন্দন ও অনুমোদন করলেন।

(অঙ্গুত্তর নিকায় ও ধর্মপদার্থকথা)

১৮। বুদ্ধনির্ঘোষ—

শ্রাবস্তীর জেতবন বিহার। তত্ত্বানুসন্ধানী আনন্দ একদা বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করলেন---"ভগবন্, আপনি এক সময় বলেছিলেন---'শিখি বুদ্ধের অভিভূ নামক অগ্রশ্রাবক ব্রহ্মলোকে স্থিত হয়ে ভাষণ করলে, সে নির্ঘোষে সহস্র চক্রবাল মুখর হয়ে ওঠে।' প্রভু, আমার জানবার জন্য একান্ত আগ্রহ হয়েছে, আপনার নির্ঘোষ কতদূর স্থান পরিব্যাপ্ত হয়ে থাকে?"

তখন দশবল বুদ্ধ বললেন---"আনন্দ, শ্রাবক অভিভূর তুলনায় তথাগত বুদ্ধ অপ্রমাণ।"

সম্বুদ্ধের এ সংক্ষিপ্ত উক্তি সম্যক্ উপলব্ধি করতে না পেরে, বিষয়টা বিশদভাবে বুঝিয়ে দেবার জন্য বুদ্ধকে তিনি অনুরোধ করলেন। আনন্দের জ্ঞানলিপ্সা পরিজ্ঞাত হয়ে সর্বজ্ঞ ধীর কণ্ঠে বললেন---"আনন্দ, সহস্র 'চূলনিক লোকধাতু' (ভূমণ্ডল) সম্বন্ধে তোমার অভিজ্ঞতা আছে কি?"

আনন্দ অনুরোধ করলেন---"প্রভু, এটাই উপযুক্ত সময়। সে সম্বন্ধে ভগবান যা ভাষণ করবেন, ভিক্ষুসংঘ তা-ই ধারণ করবেন।"

লোকবিদ্ বুদ্ধ বল্লেন---"তা হলে আনন্দ, নিবিষ্ট-চিত্তে শ্রবণ করো---এ ব্রহ্মাণ্ডের ন্যায় সহস্র ব্রহ্মাণ্ডে বা চক্রবালে সহস্র সংখ্যক চন্দ্র, সূর্য, সিনেরু, জম্বুদ্বীপ, অপরগোয়ান, উত্তরকুরু, পূর্ববিদেহ, চতুর্মহারাজিক, তাবতিংস, যাম, তুষিত, নির্মাণরতি, পরনির্মিত বসবর্তী, চার হাজার মহা-সমুদ্র, চার হাজার লোকপাল দেবরাজ এবং বিশ হাজার ব্রহ্মলোক বিদ্যমান আছে। এরূপ সর্ব অবয়ব পরিপূর্ণ সহস্র চক্রবাল এক 'চূলনিক (ক্ষুদ্র) লোকধাতু' নামে অভিহিত হয়। এরূপ দশলক্ষ চক্রবালকে এক 'মধ্যম লোকধাতু' বলা হয়। এ তত্ত্ব শ্রাবকদের অবিষয় বা জ্ঞান-শক্তির অতীত।

এই মধ্যম লোকধাতুই বুদ্ধগণের জাতি-ক্ষেত্র। অর্থাৎ বোধিসত্ত্বের মাতৃগর্ভে অন্তিম-জন্ম পরিগ্রহ, ভূমিষ্ঠ, মহাভিনিষ্ক্রমণ, সম্বুদ্ধত্ব জ্ঞান লাভ, ধর্মচক্র প্রবর্তন, পরিনির্বাণ লাভের দিনাবধারণ ও মহাপরিনির্বাণ লাভ দিবসে এই জাতিক্ষেত্র প্রকম্পিত ও আলোকিত হয়।

কোটি লক্ষ চক্রবাল 'এক মহালোকধাতু' নামে অভিহিত হয়। সম্যক্ সম্বুদ্ধ ইচ্ছা করলে, এতদূর স্থানের ঘনান্ধকার বিদূরিত করে অপূর্ব আলোকে আলোকোজ্জ্বল করতে পারেন এবং ব্যাপকভাবে সমপর্যায়ে গম্ভীর নির্ঘোষে মুখরিত করতে পারেন। ইচ্ছা করলে ততোধিক স্থানও পারেন। অর্থাৎ সমগ্র 'বিষয়-ক্ষেত্র'ই পারেন। সম্যক্ সম্বুদ্ধের বিষয়ক্ষেত্র অনন্ত চক্রবাল। এর প্রমাণ-পরিচ্ছেদ নেই। বুদ্ধের নিকটস্থ-জন যেরূপ শব্দ শুনবে, কোটি লক্ষ চক্রবালের অন্তিম সীমায়ও সেরূপ একই প্রমাণ শব্দ শ্রুত হবে। আশ্চর্য পুরুষ তথাগত বুদ্ধের অচিন্তনীয় অভিজ্ঞার অসাধারণ-শক্তি অচিন্তনীয়। এই কোটিশত সহস্র চক্রবালকেই বলা

হয় বুদ্ধগণের 'আণাক্ষেত্র' বা আজ্ঞাক্ষেত্র। এই সমগ্র আজ্ঞাক্ষেত্রে 'আটানাটিয়া, ঋষিগিলি, ধ্বজগ্র, বোধ্যঙ্গ, খন্দ, ময়ূর, মৈত্রী ও রত্ন' সূত্রাদির আদেশ ও অনুশাসন একান্তভাবে প্রতিপালিত হয়। আনন্দ, দশবল বুদ্ধের নির্ঘোষ যদৃচ্ছাক্রমে কোটিশত সহস্র চক্রবাল সমশব্দে মুখর হয়ে ওঠে।"

নরসিংহের এরূপ সিংহনাদ শুনে জ্ঞাননিষ্ঠ আনন্দ চমৎকৃত হলেন। তাঁর অচলা-শ্রদ্ধাপ্রবণ অন্তরে অনুপম প্রীতির সঞ্চার হলো। প্রীতি-আতিশয্যের বেগ অন্তরে ধারণ করতে অসমর্থ হয়ে প্রীতি-গদ্‌গদ কণ্ঠে এরূপ উদান-বাণী ভাষণ করলেন তিনি---"আহা, আমি একান্তই লাভবান হয়েছি, এরূপ মহাঋদ্ধি ও মহানুভাব সম্পন্ন বুদ্ধের যে আমি সেবক হবার সৌভাগ্য লাভ করেছি, তা আমার মহাপুণ্যেরই অবিস্মরণীয় পুরস্কার। এই তো আমার পক্ষে পরম লাভ। 'প্রশ্নের সুমীমাংসা, সন্দেহের নিরসন, নিগূঢ়-তত্ত্বের মর্মোদ্ধার, অমৃত-মধুর ধর্মশ্রবণাদি' সর্বতোভাবেই আমার মহালাভ; অপিচ, এসব গরিষ্ঠ আত্মশ্লাঘার বিষয়ও বটে!"

আনন্দের এবম্বিধ উচ্ছ্বাসময়ী প্রীতিবাণী শ্রবণে ভিক্ষু লালুদায়ীর ঈর্ষানল তীব্রভাবে জ্বলে উঠল। তাঁর এ ঈর্ষার একমাত্র কারণ হলো---ইতিপূর্বে ইনিও একবার বুদ্ধের সেবক হয়েছিলেন। কিন্তু, যোগ্যতার অভাবে অচিরেই পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। বর্তমানে আনন্দের প্রশংসনীয় সেবাপরায়ণতা, ব্রতানুষ্ঠানের অপূর্ব নীতিজ্ঞান এবং তদুপরি বহুমুখী জ্ঞানের গুণ-কীর্তনই উদায়ীর অসহ্য হলো।

করুণার অভাবে মাৎসর্যের এবং মুদিতার অভাবে হয় ঈর্ষার উদয়। এ দ্বিবিধ অকুশল-চৈতসিক মানবের ভয়ঙ্কর শত্রু। অপরের সৌভাগ্য দর্শনে যে চিত্ত-ক্ষোভ জন্মে, তা'কেই বলা হয় ঈর্ষা। ঈর্ষার অপর নাম পরশ্রীকাতরতা। পেচক যেমন দিবালোক সহ্য করতে পারে না, ঈর্ষাপরায়ণও সেরূপ সহ্য করতে পারে না---অপরের সম্মান, গুণ-গরিমা ও সুখ-সমৃদ্ধি। পরের নিন্দা, দোষারোপ, ছিদ্রান্বেষণ ও বিপদ কামনা করাই ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তির স্বভাব।

বিক্ষুব্ধ অন্তরে এতদিন সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন ঈর্ষাহত লালুদায়ী। আজ তিনি উপেক্ষা করলেন না এমন উত্তম সুযোগ। মহামনা আনন্দের অনাবিল অন্তরে আঘাত দেবার ইচ্ছায়, উৎসাহ-প্রীতি ভঙ্গ করার মানসে এবং তাঁর প্রসন্নোজ্জ্বল-মুখ বিমর্ষ করার অভিলাষে উদায়ী সভ্রূভঙ্গ বিকৃত-মুখে কটুক্তি সহকারে বলে উঠলেন---"আয়ুষ্মান্ আনন্দ, তোমার দেখছি আহ্লাদে বুক ভরে গেছে। এতো উচ্ছ্বাস কেন হে? ভগবান মহাঋদ্ধি-মহানুভাব সম্পন্ন হলেন, তা'তে তোমার কি? তোমার এতো আনন্দ কিসের?"

তখন বুদ্ধ বললেন দৃপ্ত কণ্ঠে —"হে উদায়ি তুমি বলছো কি? এরূপ কথা বলা তোমার ভারি অন্যায় তা। বড়ো অশোভন তোমার উক্তি। আনন্দের এ প্রীতি-চিত্তের গুরুত্ব কতো, এর কী বা বুঝবে তুমি? ওর এ চিত্ত-প্রসন্নতা হেতু যে মহীয়ান পুণ্যসম্পদ অর্জিত হয়েছে, সে পুণ্য এতো শক্তিশালী ও প্রভাবশালী যে, এতেই অনায়াসে লাভ করা যায়—সপ্তবায় ইন্দ্রত্ব ও সপ্তবার চক্রবর্তী রাজত্ব। কিন্তু, এজন্যেই আনন্দ সাক্ষাৎ করবে অর্হত্ব ফল।"

সম্বুদ্ধের একান্ত-সত্য ঈদৃশী তেজোময়ী বাণী শ্রবণে উদায়ী স্তম্ভিত ও বিমর্ষ হলেন। ভিক্ষুসংঘের মুখমণ্ডল হলো প্রসন্নোজ্জ্বল এবং আনন্দ হলেন বিস্ময়োৎফুল্ল।

(অঙ্গুত্তর নিকায়—তিক নিপাত)

১৯। আনন্দ ও অভয়---

বৈশালীর মহাবনের কূটাগার শালা। আনন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন দু'জন অভিজ্ঞ লিচ্ছবী। এক জনের নাম অভয়, অপরের নাম পণ্ডিত কুমার। উভয়ে স্থবিরকে সগৌরবে বন্দনা করে একান্তে উপবিষ্ট হলেন। অভয় আনন্দকে বললেন---"ভন্তে, নিগ্রন্থনাথপুত্র নিজকে এ বলে পরিচয় দেবার প্রয়াস পান যে---তিনি যেন সর্বজ্ঞ-সর্বদর্শী, নিরবশেষ

জ্ঞান-দর্শন পরিজ্ঞাত; সুপ্ত, জাগ্রত, স্থিত ও গমনাগমন সকল অবস্থাতেই সতত সর্বজ্ঞতা-জ্ঞানেই স্থিত থাকেন।

তিনি এরূপও প্রজ্ঞপ্তি করেন যে---'দুষ্কর তপশ্চর্যায় পুরাতন (পূর্বজন্মে) সঞ্চিত কর্মের ধ্বংস সাধিত হয়, নূতন কর্ম অকৃত হয় এবং রহিত করা হয় কর্মোৎপন্নের কারণ। এরূপে কর্ম-ক্ষয়ে দুঃখ-ক্ষয়, দুঃখ-ক্ষয়ে বেদনা-ক্ষয়, বেদনা-ক্ষয়ে সর্ব দুঃখ ধ্বংস হয়ে যায়। এরূপে সংদৃষ্টিক ক্লেশ ধ্বংসকারী বিশুদ্ধি প্রভাবে বর্ত-দুঃখের সমতিক্রান্তি হয়।' মহামান্য আনন্দ, ভগবান বুদ্ধ এ সম্বন্ধে কিরূপ বলে থাকেন?"

তত্ত্বজ্ঞানী আনন্দ ধীরকণ্ঠে বল্‌লেন---"অভয়, তথাগত বলে থাকেন--ক্লেশ ধ্বংসকারী বিশুদ্ধি ত্রিবিধ। তা সম্যক্‌রূপে জ্ঞাত হয়ে মহাকারুণিক বুদ্ধের করুণাঘন অন্তর আকুল হয়ে উঠ্‌লো---মানবগণ যা'তে বিশুদ্ধি লাভ করেন, শোক-পরিদেবন সমতিক্রম করেন, দুঃখ-দৌর্মনস্যের অন্ত, সম্যক্ জ্ঞান লাভ এবং অমৃত-নির্ঝর নির্বাণ সাক্ষাৎ করেন। এ কারণেই সুগতের করুণার্দ্র কণ্ঠে করুণাবাণী মন্দ্রিত হয়ে উঠেছিলো---মুক্তি প্রদায়ক ত্রিবিধ বিশুদ্ধির সরল-সুন্দর বিশ্লেষণ।

অভয়, এ ত্রিবিধ বিশুদ্ধির যথার্থ স্বরূপ অতি সংক্ষেপে প্রকাশ করবো, অভিনিবেশ সহকারে শ্রবণ করুন---

(১) ভিক্ষু প্রথমতঃ শীলবান হয়ে থাকেন। বিনয়-শীলে সুশিক্ষিত হন এবং তা সম্যক্ আচরণ করেন। নূতন অকুশল কর্ম উৎপাদন করেন না, পুরাতন (পর্বজন্মের) সঞ্চিত অকুশল কর্ম-ফল ভোগ করে ক্রমশঃ তার ক্ষয় সাধন করেন। এটিই প্রত্যক্ষ ক্লেশ ধ্বংসকারী প্রথম বিশুদ্ধি, যা সংদৃষ্টিক, ক্লেশ ধ্বংসকারী, অকালিক, এসো-পশ্যিক, ঔপনায়নিক ও বিজ্ঞ-জনের স্বয়ং জ্ঞাতব্য।

(২) অভয়, শীলগুণ বিভূষিত ভিক্ষু পঞ্চ কামগুণ পরিত্যাগ করে ধ্যানে নিবিষ্ট হন এবং অনুক্রমে চতুর্থ ধ্যান পর্যন্ত অধিগত হন। সে ভিক্ষু নূতন অকুশল কর্মের সৃষ্টি করেন না, পুরাতন সঞ্চিত অকুশল কর্ম---ফলভোগ করে ক্রমশঃ তার ক্ষয় সাধন করেন। এটিই প্রত্যক্ষ ক্লেশ ধ্বংসকারী

দ্বিতীয় বিশুদ্ধি, যা সংদৃষ্টিক, ক্লেশ-ধ্বংসকারী, অকালিক, এসো-পশ্যিক, ঔপনায়নিক ও বিজ্ঞজনের স্বয়ং জ্ঞাতব্য।

(৩) অভয়, শীল ও সমাধিপরায়ণ ভিক্ষু অনুক্রমে স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী ও অনাগামী ধ্যানস্তর অতিক্রমের পর তৃষ্ণা-ক্ষয়ে অর্হত্ব ফল সাক্ষাৎ করেন। চিত্ত-বিমুক্তি ও প্রজ্ঞা-বিমুক্তি জনিত পরম সুখ তিনি উপভোগ করেন। তখন দৃষ্ট-ধর্মে তিনি স্বয়ং অভিজ্ঞান সাক্ষাৎ করে নির্বাণের পরাশান্তিতে অবস্থান করেন। তিনি নূতন অকুশল কর্মের সৃষ্টি করেন না, পুরাতন সঞ্চিত অকুশল-কর্ম---ফল ভোগ করে ক্রমশঃ তার ক্ষয় সাধন করেন। ইহাই প্রত্যক্ষ ক্লেশ ধ্বংসকারী তৃতীয় বিশুদ্ধি, যা সংদৃষ্টিক, ক্লেশধ্বংসী, অকালিক, এসো-পশ্যিক, ঔপনায়নিক ও বিজ্ঞজনের স্বয়ং জ্ঞাতব্য।

অভয়, ক্লেশ ধ্বংসকারী বিশুদ্ধি এই তিন প্রকারই। তথাগত বুদ্ধ মানবদের এ ত্রিবিধ বিশুদ্ধির উপায় জ্ঞাত হয়ে ও প্রত্যক্ষ করে নর-দেবের শোক-পরিদেবনের সমতিক্রমণ, দুঃখ-দৌর্মনস্যের অস্ত, জ্ঞান অধিগম ও নির্বাণ সাক্ষাতের জন্য সম্যক্‌রূপে ভাষণ করেন।"

শাস্ত্র-বিশারদ আনন্দের বিদ্বজ্জনোচিৎ গভীর তত্ত্বপূর্ণ অপূর্ব-বাণী শ্রবণে পণ্ডিত কুমার অভয়কে গাঢ়স্বরে বললেন---"হে অভয়, সম্বুদ্ধের শ্রেষ্ঠ বাণী আনন্দ কর্তৃক সুভাষিত হয়েছে। কেন তুমি তা অনুমোদন করছো না?"

অভয় সবিস্ময়ে বললেন---"কি বলছো বন্ধু! কেন আমি মতিমান আনন্দের সুভাষিত বাক্য অনুমোদন করবো না? তার যে, মস্তক পাত হবে, যেজন আয়ুষ্মান আনন্দের এমন সুভাষিত বাক্য অনুমোদন না করবে!"

লিচ্ছবীদ্বয় আনন্দোক্ত সারগর্ভ-বাণী সানন্দে অনুমোদন ও প্রতিগ্রহণ করে স্থবিরের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শনান্তে আপন পথে চলে গেলেন।

(অঙ্গুত্তর নিকায়—তিকনিপাত)

২০। প্রশ্ন সমাধান—

কৌশাম্বীর ঘোষিতারাম। একদিবস আয়ুষ্মান ভদ্রজিত আনন্দের নিকট সমাগত হলেন। প্রথম সন্তোষজনক আলাপের পর আনন্দ ভদ্রজিৎকে

প্রশ্ন করলেন---"বন্ধু ভদ্রজিৎ, দর্শনীয়ের অগ্র কি? শ্রবণীয়ের অগ্র কি? সুখের মধ্যে উত্তম সুখ কি? সংজ্ঞার মধ্যে শ্রেষ্ঠ সংজ্ঞা কি? ভবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভব কি?"

প্রশ্নোত্তরে ভদ্রজিৎ বললেন---"বন্ধু আনন্দ, ব্রহ্মা আছেন যিনি অভিভূ, অনভিভূত, সর্বদর্শী ও বশবর্তী। যিনি এরূপ ব্রহ্মদের দর্শন পেয়েছেন, সে দর্শনই দর্শনীয়ের অগ্র।

আভাস্বর নামক ব্রহ্মগণ অতিশয় সুখমগ্ন। তাঁরা কোন কোন সময় এরূপ প্রীতিবাক্য উচচারণ করেন---'আহা, কী সুখ; আহা, কী সুখ।' যিনি এ শব্দ শ্রবণ করেছেন তা-ই তাঁর শ্রবণীয়ের অগ্র।

শুভকিণহ্ নামক ব্রহ্মগণ চিত্ত-শান্তিতে পরম সুখী। নিরন্তর তাঁরা সুখই উপভোগ ক'রে থাকেন। সুতরাং সুখের মধ্যে তা-ই উত্তম সুখ।

অকিঞ্চন আয়তন উপগত অরূপ ব্রহ্মগণের সংজ্ঞাই সংজ্ঞার মধ্যে শ্রেষ্ঠ সংজ্ঞা।

'নৈব সংজ্ঞা না সংজ্ঞা' আয়তন উপগত অরূপ ব্রহ্মগণ আছেন, এই ব্রহ্মলোকই ভবের অগ্র।"

তখন আনন্দ ধীর কণ্ঠে বললেন---"বন্ধু ভদ্রজিৎ, আপনি যা বললেন, তা অতি অকিঞ্চিৎকর কথা।"

ভদ্রজিৎ---আয়ুষ্মান আনন্দ, আপনি বহু শ্রুত, আপনিই বলুন।

আনন্দ বললেন---"আমি বলছি, আপনি মন-সংযোগ করুন---যা দর্শনে আসক্তির ক্ষয় হয়, তা দর্শনীয়ের অগ্র। যা শ্রবণে আসক্তির ক্ষয় হয়, তা শ্রবণীয়ের অগ্র। যে সুখানুভবের মাধ্যমে সংপ্রাপ্ত হয় আসক্তির ক্ষয়, তা সর্ববিধ সুখের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সুখ। যে সংজ্ঞা উৎপাদনে আসক্তির ক্ষয় হয়, সে সংজ্ঞাই শ্রেষ্ঠ সংজ্ঞা। যে ভবে (যে আত্মভাবে বা নর, দেব ও ব্রহ্ম-কায়ে) স্থিত থেকে, অনন্তর আসক্তির ক্ষয় করা যায়, সে অন্তিম ভবই ভবের অগ্র।"

আয়ুষ্মান ভদ্রজিৎ তথ্যভাষী আনন্দের তথ্যপূর্ণ ভাষণ সানন্দে

অনুমোদন করলেন।

(অঙ্গুত্তর নিকায়—পঞ্চকনিপাত)

২১। প্রশ্ন ও উত্তর—

শ্রাবস্তীর জেতবন বিহার। জ্ঞান-পিপাসু আনন্দ সম্বুদ্ধকে প্রশ্ন করলেন---"প্রভু, কুশল-জনক শীল সমূহ কিরূপ হিত-সাধক এবং কিরূপ ফলদায়ক ?"

প্রত্যুত্তরে বুদ্ধ বললেন---"আনন্দ, শীল সমূহ অননুতাপ হিত-সাধক এবং অননুতাপ ফল-দায়ক।"

"প্রভু, অননুতাপ কোন্ অর্থ-সাধক ও কোন্ ফলদায়ক ?"

"প্রমোদ-সাধক ও প্রমোদ ফল-দায়ক।"

"প্রভু, প্রমোদ কোন্ অর্থ-সাধক, কোন্ ফল-দায়ক ?"

"প্রীতি-সাধক, প্রীতি ফল-দায়ক।"

"প্রভু, প্রীতি কোন্ অর্থ-সাধক, কোন্ ফল-দায়ক ?"

"প্রশান্তি-সাধক, প্রশান্তি ফল-দায়ক।"

"প্রভু, প্রশান্তি কোন্ অর্থ-সাধক, কোন্ ফল-দায়ক ?"

"সুখ-সাধক, সুখ ফল-দায়ক।"

"প্রভু, সুখ কোন্ অর্থ-সাধক, কোন্ ফল-দায়ক ?"

"সমাধি-সাধক, সমাধি ফল-দায়ক।"

"প্রভু, সমাধি কোন্ অর্থ-সাধক, কোন্ ফল-দায়ক ?"

"যথাভূত জ্ঞান দর্শন-সাধক, যথাভূত জ্ঞানদর্শন ফলদায়ক।"

"প্রভু, যথাভূত জ্ঞানদর্শন কোন্ অর্থ-সাধক, কোন্ ফল-দায়ক ?"

"শান্তিপ্রদ বিরাগ-সাধক, শান্তিপ্রদ বিরাগ ফল-দায়ক"।

"প্রভু, শান্তিপ্রদ বিরাগ কোন্ অর্থ-সাধক, কোন্ ফলদায়ক ?"

"বিমুক্তি জ্ঞানদর্শন-সাধক, বিমুক্তি জ্ঞানদর্শন ফলদায়ক। সুতরাং

আনন্দ, কুশল-জনক শীল সমূহ অনুক্রমে শ্রেষ্ঠ হতে শ্রেষ্ঠতমে উপনীত করায়।''

সুগতের সুনীতি-সম্মত অমোঘ প্রত্যুত্তরে আনন্দ অতিশয় আনন্দিত হলেন।

(অঙ্গুত্তর নিকায়—দশম নিপাত)

২২। *গোশৃঙ্গ শালবন—*

একদা তথাগত গোশৃঙ্গ শালবনে সশিষ্য অবস্থান করছিলেন। সেখানে এক পূর্ণিমা রজনীতে ধর্মসেনাপতি শারীপুত্রের নিকট মহমান্য মহামৌদ্‌গল্যায়ন, মহাকশ্যপ ও অনুরুদ্ধ স্থবির সমাগত হলেন। উদ্দেশ্য, ধর্মশ্রবণ করবেন। তদ্দর্শনে ধর্ম-পিপাসু আনন্দ ও রেবত স্থবিরও তদভিমুখে অগ্রসর হলেন। শারীপুত্র অনতিদূরে দেখতে পেলেন, আনন্দ ও রেবত স্থবির আসছেন। তখন ভদ্র-শারীপুত্র ভদ্র-আনন্দকে স্বাগত সম্ভাষণ জানিয়ে বললেন—''তথাগতের সেবকাগ্রগণ্য আয়ুষ্মান্ আনন্দের শুভাগমন হোক। সৌম্য আনন্দ, বড়ো মনোরম এ গোশৃঙ্গ শালবন। স্নিগ্ধা, ধবলিতা ও চন্দ্রিকোদ্ভাসিতা যামিনী; শালবৃক্ষরাজি ফুল্ল-কুসুমসম্ভার-সমলঙ্কৃত; পুষ্পের মনোহর সৌরভে আমোদিত হচ্ছে সকলদিক। বন্ধু আনন্দ, বলুন দেখি, এ মাধুর্যপূর্ণ রমণীয় শালবন কিরূপ ভিক্ষুর সংস্পর্শে শোভমান হবে?''

আনন্দ বললেন—'বন্ধু শারীপুত্র, যে ভিক্ষু বহুশ্রুত, ধর্মধর, শ্রুতধর্ম সুগ্রহণকারী হন; যে ধর্মের আদিতে কল্যাণকরশীল, মধ্যে কল্যাণপ্রদ সমাধি এবং অন্তে কল্যাণ জনক প্রজ্ঞা প্রদর্শিত হয়েছে; যে ধর্মে অর্থ-ব্যঞ্জন সংযুক্ত সর্বাঙ্গ পরিপূর্ণ ও পরিশুদ্ধ-ধর্ম সম্যক্‌রূপে প্রকটিত হয়েছে; যে ভিক্ষুর এরূপ সদ্ধর্ম সুবিদিত, সুগৃহীত ও মনশ্চক্ষে অনুদর্শিত হয়েছে; যিনি এধর্মে বহুশ্রুত ও অনুপ্রবিষ্ট হয়েছেন, তিনিই চতুর্পারিষদে পাপধ্বংস

মূলক আনুপূর্বিক পদ-ব্যঞ্জন সংসক্ত অমৃতময় সত্যধর্ম দেশনা করে থাকেন। বন্ধু শারীপত্র, সেরূপ ভিক্ষুর সংস্পর্শেই এ গোশৃঙ্গ শালবন শোভমান হবে।"

তদনন্তর এক সময় শারীপুত্র ভগবৎ সকাশে উপনীত হয়ে আনন্দোক্ত বিষয় প্রকাশ করলেন। তখন বুদ্ধ প্রসন্ন হয়ে অনুমোদন সূচক বাক্যে বললেন---"সাধু, সাধু শারীপুত্র, যেরূপ ভাবে বললে সম্যক্ বর্ণনা করা হয়, সে ভাবেই আনন্দ সম্যক্ বর্ণনা করতে সমর্থ। হে শারীপুত্র, সত্যই আনন্দ বহুশ্রুত, শ্রুতধর ও শ্রুতগ্রাহী। যে সমস্ত ধর্ম আদি, মধ্য ও অন্তে কল্যাণময়; অর্থ-ব্যঞ্জনযুক্ত, সর্বাঙ্গ পরিপূর্ণ ও বিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রকাশক; সেরূপ ধর্ম আনন্দের বহুবার শ্রুত হয়েছে, সুষ্ঠুরূপে ধৃত হয়েছে, বারম্বার আবৃত্তি করাতে সুপরিচিত হয়েছে, মনশ্চক্ষে; অনুদর্শন করা হয়েছে এবং প্রজ্ঞাদ্বারা অনুশীলন করে ধর্মে সুপ্রবিষ্ঠ হয়েছে। পারিষদ চতুষ্টয়ে আনন্দ অকুশল নাশক মনোরম ধর্মোপদেশ সুমধুর কণ্ঠে পরিবেষণ করে থাকে। সর্বাঙ্গ পরিপূর্ণ, পদ-ব্যঞ্জন পরিশোভিত, আনুপূর্বিক সুশৃংখলায় সুসজ্জিত, মর্মস্পর্শী ও কর্ণ-সুখকর অপূর্ব দেশনায় সে শ্রোতাদের আনন্দ বর্ধন করে।"

সুগতের এই একান্ত সত্যকথা আয়ুষ্মান্ শারীপুত্র প্রসন্নমুখে অনুমোদন করলেন।

(মধ্যম নিকায়—মহাগোশৃঙ্গসত্র)

১৬। বুদ্ধের জন্য প্রাণদানে উদ্যত—

এক

তখন দশবল বুদ্ধ রাজগৃহের বেণুবন বিহারে অবস্থান করছিলেন। এমন সময় বুদ্ধের বিরুদ্ধে দারুণ বিদ্রোহের সৃষ্টি করলেন কুমতি পরায়ণ ভিক্ষু দেবদত্ত। শাক্যমুনিকে হত্যার উদ্দেশ্যে তাঁর দুষ্টবুদ্ধি উদ্ভাবনের অবধি নেই। তদুদ্দেশ্যে তিনি বিবিধ উপায় ও ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নিলেন। তিনি চান, বুদ্ধকে ধরাতল থেকে নিশ্চিহ্ন করতে। দুরভিসন্ধি চরিতার্থ

করার মানসে একবার তিনি নিযুক্ত করেছিলেন ধনুর্ধর, আর একবার পর্বত থেকে নিক্ষেপ করেছিলেন প্রকণ্ড শিলা। অথচ পুণ্য-পুরুষ সম্যক্ সম্বুদ্ধ যে অপরাজেয়; তাঁকে হত্যা করতে পারে, জগতে এমন শক্তি যে, কারো নেই, তা বুঝবার মতো জ্ঞান দেবদত্তের ছিল না। তিনি কেবল উঠে-পড়েই লেগেছেন—যে কোনো উপায়েই হোক, বুদ্ধকে হত্যা করবেন, এটা ছিল তাঁর দৃঢ় সঙ্কল্প।

মগধরাজ অজাতশত্রুর নালগিরি নামক হস্তীটি অতি প্রচণ্ড ও ভয়াবহ। দেবদত্তের বিশ্বাস, নালগিরিই বুদ্ধকে হত্যা করতে সমর্থ। সুতরাং তিনি গজরাজকে প্রচুর তীব্র-সুরা পান করিয়ে উন্মাদ করে তুললেন। এমন সময়ে বুদ্ধ ভিক্ষুগণ সঙ্গে নিয়ে অন্ন ভিক্ষায় বের হয়েছেন। দেবদত্ত মদমত্ত নালগিরিকে ছেড়ে দিলেন ভিক্ষারত বুদ্ধের সম্মুখে। উন্মত্ত হস্তীর বংহতি-নাদে দিগন্ত কম্পিত হয়ে উঠল। করিরাজ ঘন ঘন শুণ্ড আস্ফালন করে ধর্মরাজ অভিমুখে ধাবিত হলো। তখন কী যে একটা ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, তা অবর্ণনীয়। ত্রাহি-ত্রাহি মহারব ওঠল চার দিকে। প্রাণভয়ে পালাতে লাগল পথিকগণ। সকলের মুখেই ভীতিরব ধ্বনিত হলো—"হায়! হায়! এখনি বুঝি বুদ্ধ আক্রান্ত হবেন।"

ভিক্ষুদের মধ্যেও মহাচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হলো। কিন্তু, ভয়াতীত অর্হৎগণ অচিন্তনীয় বুদ্ধলীলা ও মহিমাব্যঞ্জক মহাশক্তি প্রকাশ পাবার শুভ মুহূর্ত উপস্থিত হয়েছে দেখে, ধীরচিত্তে অপেক্ষা করতে লাগলেন। কেঁপে ওঠল তখন একনিষ্ঠ সেবক আনন্দের অন্তর। সুগতের এ বিপদ তিনি অকাতরে বক্ষ পেতে নেবেন, এ তাঁর দৃঢ়পণ। তিনি অকুতোভয়ে দ্রুত গিয়ে দাঁড়ালেন বুদ্ধের সম্মুখে, তাঁকে আড়াল করে।

তখন অসাধারণ প্রভাবশালী দশবলের নির্ভীক কণ্ঠে ধ্বনিত হলো আশ্বাস-বাণী—"সরে দাঁড়াও আনন্দ, আমার জন্য শঙ্কিত হয়ো না। তোমার জীবন-দানের প্রয়োজন হবে না। তথাগতের প্রাণ-নাশের আশঙ্কা কর তুমি? তথাগতের প্রাণ-নাশ করতে পারে, তেমন শক্তিমান জগতে কেউ নেই। যাও আনন্দ, স্বস্থানে গিয়ে দাঁড়াও।"

অপ্রমেয় মৈত্রী-করুণার মূর্ত-প্রতীক সম্বুদ্ধের সম্মুখে এসে উন্মত্ত গজরাজ তৎক্ষণাৎ প্রকৃতিস্থ হয়ে গেল। প্রচণ্ডতা বিদূরিত হয়ে শান্ত-সুদান্তে হলো পরিণত। পশুনাগ মনুজনাগের পাদোপরি রক্ষা করল আপন মস্তক। স্বীয় মস্তকে ও পৃষ্ঠদেশে বর্ষণ করল শ্রীবুদ্ধের পদরজ। বিস্ময়োৎফুল্ল জনগণের হর্ষ-ধ্বনিতে রাজগৃহ মুখরিত হলো। শুধু দেবদত্তের মুখখানা হয়ে গেল বিমর্ষ। সশিষ্য সুসংযত পদক্ষেপে প্রস্থান করলেন অমিতাভ।

(খুল্ল হংস জাতক—৫৩৩)

দুই

মমতা পরায়ণ আনন্দ তথাগতের জন্য প্রাণদানে উদ্যত হয়েছিলেন, এ বিষয় নিয়ে বেণুবন বিহারে ভিক্ষুদের মধ্যে আলোচনা চলতে লাগল। এমন সময়ে বুদ্ধ তথায় উপস্থিত হলেন এবং আলোচ্যমান বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞাত হয়ে বললেন—"ভিক্ষুগণ, কেবল এ জন্মে নয়, অতীত জন্মেও বহুবার আমার জন্য সে প্রাণদানে উদ্যত হয়েছিল। শোনো ভিক্ষুগণ, অতীতের এক করুণ কাহিনী—

রোহন্ত মৃগ—

সুদূর অতীতে হিমালয়ের বন-প্রদেশে রোহন্ত নামে এক সোনার বরণ হরিণ অবস্থান করতো। তার সুগঠিত-তনু উজ্জল কান্তিময় ছিল। এ মৃগটি বহুশত মৃগের অধিনায়ক। রোহন্তের ছিল এক কনিষ্ঠ সহোদর, আর এক অনুজা ভগ্নী। ভ্রাতার নাম—চিত্র, আর বোনের নাম —সুতনা। এদের শরীরও ছিল উজ্জ্বল স্বর্ণবর্ণ। মহারণ্যে স্বাধীনভাবে ও মনানন্দে এরা বিচরণ করে। তারা বনের লতা-পাতা ও কচি-ঘাস খায় এবং পান করে স্বচ্ছ-হ্রদের শীতলবারি। তাদের মনোরম রাজ্য ছিল সৌন্দর্যভরা। সেখানে তারা কালাতিপাত করতো পরম সুখে।

একদা এক ব্যাধ জাল বিস্তার করল তাদের জলপানের ঘাটে। মৃগরাজ মৃগপারিষদ পরিবৃত হয়ে জলপানের উদ্দেশ্যে হ্রদে অবতরণের সময় মৃগপতি পাশ-বদ্ধ হলো। মৃগশ্রেষ্ঠ তখন প্রমাদ গণল। সে করুণা-ময় অন্তরে চিন্তা করল--"প্রথমতঃ প্রত্যেকের জলপান সমাপ্ত হোক, তারপর হবে অন্য কর্তব্য। আমি আবদ্ধ হয়েছি জানলে, সবাই ভয়ে জলপান না করেই ছুটে পালাবে।"

মৃগদের জলপান সমাপ্ত হলে মৃগপতি বারত্রয় সজোরে পা আকর্ষণ করল। কিন্তু, ছিন্ন করতে পারল না পাশ-রজ্জু। অপিচ, পাশ-গ্রন্থি আরো কশে গিয়ে চর্ম, মাংস ও স্নায়ু কেটে অস্থিতে গিয়ে লাগল। মৃগরাজ এমন এক কাতর-ধ্বনি করল যে, এতেই মৃগ সমূহ বুঝতে পারল--- 'নিশ্চয়ই কোনও এক মৃগ পাশ-বদ্ধ হয়েছে।' তখনই মহাযূথের সমস্ত মৃগ সন্ত্রস্ত হয়ে তীব্রবেগে পলায়ন করল।

চিত্র ও সুতনা পলায়নপর মৃগদের মধ্যে অগ্রজকে দেখতে না পেয়ে চিন্তা করল---"আমাদের সহোদর বিপন্ন হয়েছেন না কি? তাঁকে কেন দেখা যাচ্ছে না?" এ চিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই উভয়ের হৃদয় কেঁপে উঠল। তখনই ভ্রাতা-ভগ্নী দ্রুত ছুটে এসে দেখল---যিনি পাশ-বদ্ধ হয়েছেন, তিনি আর কেউ নন্, তাদেরই অগ্রজ। দেখে, এ দু'টি প্রাণীর হৃদয় যেন বিদীর্ণ হবার উপক্রম হলো। মর্মান্তিক দুঃখে হলো ম্রিয়মান্।

মৃগরাজ ভ্রাতা-ভগ্নী উভয়কে দেখেই অত্যধিক আতঙ্কিত হলো। তাদের স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বল্‌ল---"ভাই-বোন্, তোরা এখান থেকে যথাসত্বর পলায়ন কর্, এখানে বিপদের কারণ আছে। চিত্র, তুই দ্রুত গিয়ে যূথের সবাইকে রক্ষা কর্।"

তখন চিত্র বল্‌ল বাষ্পরুদ্ধ স্বরে---"দাদা, আপনি পাশ-বদ্ধ হয়েছেন। আমি কোন্ প্রাণে আপনাকে ছেড়ে যাবো? এখানে মৃত্যুর কারণ বিদ্যমান থাকলেও, জীবন থাকতে আপনাকে ছেড়ে যেতে পারবো না।" এ বলে চিত্র অগ্রজের দক্ষিণ পার্শ্বে দেহের সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে স্থিত হলো।

তৎপর সুতনাকে পলায়নের জন্য বলাতে সেও চিত্রের অনুরূপই

বল্‌ল এবং অগ্রজের বামপার্শ্বে এসে দাঁড়াল। এমন সময় দূরে দেখা গেল, ব্যাধ প্রহরণ হস্তে দ্রুত আসছে। তখন অগ্রজ বল্‌ল ভীত স্বরে---"অই দেখ্‌, রুদ্রমূর্তি ব্যাধ আসছে; সে নিশ্চয়ই আমাদের প্রাণ সংহার করবে। এ সময় তোরা পলায়ন কর্‌।"

তবুও চিত্র পালাল না। সে নির্ভয়ে যথাস্থানেই দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু, সুতনা হরিণী-সুলভ আতঙ্কে আতঙ্কিতা হয়ে স্থির থাকতে পারল না। মৃত্যুভয়ে বড়ো ভীতা হয়ে পড়ল সে। একবার দ্রুতবেগে কিছুদূর ছুটে যায় সে, আবার দাঁড়িয়ে ভীত-চকিত নেত্রে ব্যাধ আর ভ্রাতা-দ্বয়কে নিরীক্ষণ করে। সে পুনঃপুনঃ এভাবে বুকভরা স্নেহ-মমতা নিয়ে কিছুদূর চলে গেল। এবার আর পারল না, ভ্রাতাদের জন্য ওর কোমল অন্তর গুম্‌রে কেঁদে ওঠল। স্নেহ-মমতার তীব্র আকর্ষণ ওর মৃত্যু-ভয়কে পরাজিত করল। দাঁড়িয়ে চিন্তা করল---"সহোদরদ্বয়কে ব্যাধ-কবলে রেখে আমি কোথা যাচ্ছি? মৃত্যু যদি ললাটে লেখা থাকে, কে তা রোধ করবে? যদি মরতে হয়, ভাই-বোন্‌ তিনজন এক সঙ্গেই মরবো।" এ চিন্তার পর সুতনা ফিরে এলো এবং অগ্রজের পার্শ্বে নির্ভয়ে দাঁড়াল।

ব্যাধ এসে তদবস্থায় মৃগত্রয়কে দেখে আশ্চর্যান্বিত হলো। সে স্বগত বল্‌ল---"একি ব্যাপার! জাল-বদ্ধ হয়েছে একটা মাত্র মৃগ, অথচ এর দু'পাশে দু'টি মৃগ দাঁড়িয়ে রয়েছে, এর তাৎপর্য কি?"

ব্যাধের কথা শুনে মৃগরাজ অস্বাভাবিক মনুষ্যকণ্ঠে বল্‌ল---"মহাশয়, আমরা তিনটি প্রাণী এক মায়ের গর্ভজাত ভাই-বোন্‌। আমার প্রতি এরা বড়ো মমতা-পরায়ণ। আমার এ বিপদে তারা ম্রিয়মান হয়েছে। আমার জন্য এরা স্বীয় জীবনকেও তুচ্ছ মনে করছে। আমার মৃত্যুতে এরাও মৃত্যু বরণ করবে অকাতরে; এটা তাদের দৃঢ় সংকল্প।"

ব্যাধ মুগ্ধ-বিস্ময়ে চিন্তা করল---"কি আশ্চর্য! পশুর মধ্যে এরূপ সহৃদয়তা, এমন স্নেহ-মমতা, এমন মৈত্রী-করুণা বিরাজ করা তো বড়ো বিস্ময়ের বিষয়! এরূপ সদ্‌গুণ বিশিষ্ট মৃগশ্রেষ্ঠকে যদি হত্যা অথবা দুঃখ প্রদান করি, তবে আমাকে মহাপাপগ্রস্ত হতে হবে।" এভেবে

ব্যাধের মনোভাব পরিবর্তিত হয়ে গেল। ভয় ও করুণা যুগপৎ অধিকার করল ওর চিত্তকে। যথাসত্বর পাশ-রজ্জু ছিন্ন করে মৃগরাজকে সে মুক্তি ও অভয় দান করল। অগ্রজের মুক্তিতে চিত্র ও সুতনার অন্তর আনন্দময় হলো।

ভিক্ষুগণ, তখন আনন্দ ছিল চিত্রমৃগ, উৎপলবর্ণা ছিল সুতনা, ছন্দক ছিল ব্যাধ এবং আমি ছিলাম রোহন্ত মৃগরাজ। আনন্দ চিত্রমৃগ জন্মেও আমার জন্য জীবন ত্যাগ করতে কৃত-সংকল্প হয়েছিল। বহু জন্মাবধি আনন্দ এবম্বিধ মৈত্রী-করুণা ধর্ম পূর্ণ করে এসেছে। সেই মহান্ পুণ্যের প্রভাবেই এখন সে সকলের প্রিয়, মনোজ্ঞ, দর্শনীয় ও গৌরবের পাত্র হয়েছে।

ভিক্ষুগণ সম্বুদ্ধের মুখে আনন্দের জন্মান্তরীণ অপর্ব বার্তা শুনে অত্যধিক সন্তুষ্ট হলেন এবং তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করলেন।

(রোহন্ত মৃগ জাতক—৫০১)

১৭। অগ্র উপাধি লাভ---

এক

মহামান্য আনন্দ ছিলেন বহুবিধ সদ্‌গুণে বিমণ্ডিত। তাঁর গরিষ্ঠ পুণ্যাবদান সমূহ অসাধারণ ও অনুপমেয়। সুদূর অতীতে লক্ষকল্প পূর্বে যেই মহান্ উদ্দেশ্য সাধনায় তিনি নিজকে করেছিলেন উৎসর্গ; যেই সুদুর্লভ রত্ন লাভের উদগ্র বাসনা নিয়ে পদুমোত্তর বুদ্ধের পদারবিন্দে মস্তক রেখে করেছিলেন ঐকান্তিক প্রার্থনা; যা একান্তই কাম্য ও বাঞ্ছনীয়; যে ঈপ্সিত বিষয়ের প্রাপ্তিতে হয় সর্বতোভাবে পূর্ণতা লাভ; তাঁর সেই কল্প-নিধি সাধনা হয়েছে সিদ্ধ, প্রার্থনা হয়েছে ফলবতী।

(১) তাঁর অক্লান্ত সাধনায় লব্ধ প্রথম ফল—তথাগত বুদ্ধের 'প্রধান সেবকত্ব পদ'। এ দুর্লভ গরীয়ান পদে অভিষিক্ত হয়ে তিনি নিজকে

মনে করলেন---পরম পুণ্যবান ও সৌভাগ্যবান। আহা, কী সে বিস্ময়কর সেবাব্রত! সেবা নয়, যেন সাধনা! অগাধ শ্রদ্ধা-ভক্তি, অফুরন্ত প্রীতি-প্রেম, অসীম মমতা-ভালোবাসা, ঝর্ণার মতো যেন উচ্ছল হয়ে পড়তো! নিরালস্য, বীর্যবত্তা, প্রগাঢ় প্রাণের টান ও ঐকান্তিক যত্ন-প্রযত্নই সেই গরিষ্ঠ অবদানের অমূল্য উপাদান। সাধক আনন্দ বিচক্ষণতা ও বিচার-বুদ্ধির প্রভাবে সুগতের চিত্তানুযায়ী মনোময় সেবায় জয় করেছিলেন তথাগতের মহান্ অন্তর।

(২) তাঁর ঐকান্তিক সাধনার দ্বিতীয় ফল---'বহুশ্রুত জ্ঞান'। যে গুণের অধিকারী হয়ে তিনি 'ধর্ম-ভাণ্ডাগারিক' বা ধর্মরত্ন ভাণ্ডারের অধ্যক্ষ অভিধায় হয়েছিলেন আখ্যায়িত। যেই অসামান্য গুণ-গৌরবে তিনি সকলেরই হয়েছিলেন গৌরবনীয় ও আদরণীয়, এরূপ গরিষ্ঠ গুণ-গরীমায় বিমণ্ডিত হয়ে তিনি বহুশ্রুত ভিক্ষুদের মধ্যে হয়েছিলেন সর্বাগ্রগণ্য।

(৩) তৃতীয় ফল---স্মৃতিমানের অগ্র উপাধি লাভ। 'একশ্রুতি' শক্তি সম্পন্ন ছিলেন আনন্দ। অনন্যসাধারণ পুণ্য-ঋদ্ধিময় স্মরণ শীলতার প্রভাবে যা তিনি একবার শুনতেন, জীবনে কখনও তা ভুলতেন না। যে কোনও সময়ে তা সম্পূর্ণ নির্ভুলভাবেই বলতে পারতেন। এমন কি, একটি অক্ষর অথবা যতিচিহ্ন পর্যন্ত ব্যতিক্রম ঘটতো না। তদ্ধেতু সম্বুদ্ধ স্মৃতিমান্ ভিক্ষুদের মধ্যে আনন্দকেই 'স্মৃতিমানের অগ্র' এ উপাধিতে বিভূষিত করেছিলেন।

(৪) চতুর্থফল---গতিমানের অগ্র উপাধি লাভ। আনন্দ এমন বিচক্ষণ জ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন যে, একপদ বা একবাক্য থেকে ষাট হাজার পদ বা বাক্য গ্রহণ করতে পারতেন। বুদ্ধ যা বলতেন, তাঁর চিত্তানুরূপই আনন্দ সমস্ত পদ জ্ঞাত হতেন, চুম্বকের আকর্ষণের মতো। এরূপ দ্রুত গতিতে জ্ঞাত হবার অসাধারণ ক্ষমতাই আনন্দকে বৈশিষ্ট্য দান করেছিল। তাই বুদ্ধ তাঁকে 'গতিমানের অগ্র' এ অভিধায় বিমণ্ডিত করেছিলেন।

(৫) পঞ্চম ফল---ধৃতিমানের অগ্র উপাধি লাভ। বুদ্ধের সেবায়, ধর্ম-বিনয় শিক্ষায়, আবৃত্তিতে, অনুশীলনে, উৎসাহ-উদ্দীপনায়, ধর্মধারণ

ক্ষমতায় ও সহিষ্ণুতায় আনন্দ ছিলেন অসদৃশ। তদ্ধেতু সুগত তাঁকে 'ধৃতিমানের অগ্র' এ উপাধিতে বিভূষিত করেছিলেন।

মতিমান্ আনন্দ প্রধান সেবকের পদ লাভ করা অবধি বুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গেই বিচরণ করতেন, ছায়ার মতো। অহর্নিশ সম্যক্ সম্বুদ্ধের সান্নিধ্যে অবস্থান, দর্শন, ধর্ম-শ্রবণ ও সেবা-ব্রত সম্পাদনাদি সর্ব বিষয়ে এবং সকল অবস্থাতেই তিনি কতো যে প্রীতি-সুখ অনুভব করতেন, তা অতুলনীয় ও অনির্বচনীয়।

দুই

শ্রাবস্তীর জেতবন বিহার। মহতী ধর্ম-সভায় ধর্মোপদেশ পরিবেষণ করছেন ধর্মকেতু সম্বুদ্ধ। এ সভায় সম্মিলিত হয়েছেন শ্রাবস্তীর রাজা-প্রজা, ধনী-দরিদ্র, ভিক্ষু-ভিক্ষুণী, উপাসক ও উপাসিকা মহাপারিষদ। তথাগতের সুকণ্ঠে মন্দ্রিত হচ্ছিল মধুর-মোহন ব্রহ্মস্বর। চমৎকৃত, বিমোহিত ও উচ্ছ্বসিত হলেন শ্রোতৃবৃন্দ। অভিনিবেশ সহকারে শুনছেন সকলে সুগতের প্রসন্নোজ্জ্বল মুখ-নিঃসৃত পীযূষ বর্ষিণী বাণী। আবাল-বৃদ্ধ নির্বিশেষে সকলের অন্তরেই জেগে ওঠল পুলক-শিহরণ।

আশ্চর্য-পুরুষ অমিতাভ দেশনার মাধ্যমে সমুজ্জ্বলরূপে ফুটিয়ে তুল্লেন মহিমান্বিত আনন্দের সুষমা-মণ্ডিত গুণপণা। অমৃতের অজস্রধারা বর্ষণসম বর্ণনায় মুখর হয়ে ওঠলেন শ্রীবুদ্ধ স্থবিরের এক একটা দীপ্তিমান্ পুণ্যাবদান। সেবাপরায়ণতার উজ্জ্বল পরাকাষ্ঠা, বহুশ্রুত-জ্ঞানের দীপ্যমান্ নিদর্শন, স্মৃতিমানের অসদৃশতা, গতিমান্ ও ধৃতিমানের অসাধারণত্ব প্রতিপাদন কল্পে বহুবিধ ন্যায়-যুক্তির অবতারণা করে তথ্যভাষী তথাগত চমৎপ্রদ বর্ণনা-বিলাসে প্রকাশ করলেন আনন্দের দীপ্তোজ্জ্বল কীর্তি-কলাপ।

বুদ্ধের মুখ-নিঃসৃত স্থবিরের অপূর্ব প্রশংসা কীর্তন শ্রবণে বিমুগ্ধ হলেন শ্রোতৃবৃন্দ। আনন্দের প্রতি জনগণের অন্তরে প্রবল শ্রদ্ধা গাঢ়তররূপে রেখাপাত করল। প্রত্যেকেই হৃদয়ের গৌরবময় আসনে তাঁকে প্রতিষ্ঠাপিত

করলেন। মধুরভাষী অমিতাভ সম্মিলিত মহাপরিষদকে সম্বোধন করে মেঘমন্দ্র স্বরে ঘোষণা করলেন—"সজ্জনবৃন্দ, আমার শ্রাবক সংঘের মধ্যে যারা বহুশ্রুত, তাদের মধ্যে আনন্দই অগ্রগণ্য। যারা স্মৃতিমান্, গতিমান্ ও ধৃতিমান্, তাদের মধ্যেও আনন্দ সর্বাগ্রগণ্য। আমার সেবক ভিক্ষুদের মধ্যে আনন্দই প্রধান সেবক।"

তথাগত মহাপারিষদ সমক্ষে গরিষ্ঠ আনন্দকে গৌরবময় অগ্র উপাধিতে বিভূষিত করার পর ধর্মাসন ত্যাগ ক'রে ওঠলেন। সমবেত জনগণ তাঁকে নতশিরে বন্দনা করলেন। তখন সকলের 'সাধু সাধু' হর্ষ-ধ্বনিতে সভামণ্ডপ মুখরিত হলো। মহাপারিষদ আনন্দ স্থবিরকে জানালেন শ্রদ্ধাভিনন্দন।

মহামান্য আনন্দের সাফল্য মণ্ডিত হয়েছে সুদীর্ঘ কালের প্রার্থনা। সম্বুদ্ধের প্রশংসা লাভ করা পরম সৌভাগ্যের বিষয়। তাই আজ আনন্দের অন্তর অফুরন্ত আনন্দে হয়েছে ভরপূর, প্রীতি-রসে হয়েছে সিক্ত-প্লাবিত। সুদূর স্মরণাতীত কাল থেকে সর্বতোভাবে নিজকে কুশল কর্মে প্রতিষ্ঠাপিত করে সম্যক্ সঙ্কল্প ও সম্যক্ প্রচেষ্টার মাধ্যমে আজ লাভ করলেন তিনি এমন গরিষ্ঠ পদ-গৌরব, মহান্ সম্মান্, মর্যাদা, সৎকার ও পূজা। বস্তুতঃ, কর্মানুযায়ী আনন্দই এপদের একমাত্র যোগ্যপাত্র।

জগতগুরু বুদ্ধ আনন্দকে এরূপ গৌরবদান করলেও, কিন্তু তাঁর চিত্ত হলো না আত্মাভিমানে উচ্ছ্বসিত, আত্মশ্লাঘায়ও হলো না স্ফীত। অপিচ, আত্মশুদ্ধি, আত্মশিক্ষা, আত্মসংযম, আত্মদমন, আত্মবলি, আত্মোৎসর্গ, আত্ম-সংশোধন, আত্মদীপ ও আত্মশরণে তাঁর চিত্ত হলো অগ্রগতিতে আগুয়ান।

(মনোরথ পূরণী ও থেরগাথার্থকথা)

২৫। মহাপুণ্যবান দেবপুত্র—

শ্রাবস্তীর জেতবন বিহার। একদিন দিব্যদর্শী বুদ্ধ আনন্দপ্রমুখ ভিক্ষুগণকে প্রসন্ন কণ্ঠে বললেন—"হে ভিক্ষুগণ, আজ রাত্রির শেষযামে

আমার নিকট অন্যতর এক দেবপুত্র এসেছিলেন। দেবতার অভিরূপ দেহ-জ্যোতিঃতে জেতবন উদ্ভাসিত হয়েছিল। এ দেবপুত্র আমাকে দেব-লীলায় বন্দনা করলেন এবং একান্তে স্থিত হয়ে আমার নিকট তাঁর অন্তর্নিহিত আনন্দ-ভাব প্রকাশ করলেন। তিনি সুমধুর দিব্য-কণ্ঠে বললেন ---'ভন্তে ভগবন্, ঋষিসংঘ পরিসেবিত এ জেতবন বড়োই শোভা পাচ্ছে। ধর্মরাজ, আপনি প্রীতি-দায়িনী অপূর্ব বাক্যে কতোই দিয়েছিলেন আমায় অমৃত-মধুর ধর্মোপদেশ। যে জীবন কুশলকর্ম-বিমণ্ডিত, ফলজ্ঞান * পরিশোভিত, সদ্ধর্ম ও শীলগুণে বিভূষিত, সে পরমার্থ জীবনই শ্রেষ্ঠ-জীবন। এতেই দেব-নর বিশুদ্ধতা লাভ করে, গোত্র বা ধনৈশ্বর্যে নয়। তাই জ্ঞানীব্যক্তি স্বীয় কল্যাণ কামনায় একান্ত আগ্রহে পুণ্য সম্ভার অর্জন করেন, এতেই বিশুদ্ধি লাভ হয়। মহামান্য প্রাজ্ঞশ্রেষ্ঠ শারীপুত্র স্থবিরের মতো যে ভিক্ষু শীল, প্রজ্ঞা ও উপশম গুণপ্রভাবে ভবপারাবার উত্তীর্ণ হয়েছেন, তাঁর পক্ষে এ লাভই পরম লাভ।'

ভিক্ষুগণ, দেবপুত্র এতদূর বলে আমাকে বন্দনান্তে সেখানেই অন্তর্হিত হলেন।''

সুগতের ভাষণ পরিসমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই বিচক্ষণ আনন্দ প্রফুল্ল মুখে বললেন---''ভগবন্, নিশ্চয়ই এ দেবপুত্র অনাথপিণ্ডিক হবেন। দানক-শ্রেষ্ঠ অনাথপিণ্ডিক মহামান্য শারীপুত্রের প্রতি অত্যধিক প্রসন্ন ছিলেন।''

তখন ভগবান উদাত্ত কণ্ঠে সপ্রশংস বাক্যে বললেন---''সাধু, সাধু আনন্দ, যে বিষয় তর্ক-বিচারে উপলব্ধি করতে সময় সাপেক্ষ, আমার বলার সঙ্গে সঙ্গেই তুমি সম্যক্‌রূপে তা উপলব্ধি করেছো। আনন্দ, তুমি যথার্থই বলেছো; এ দেবপুত্রই অনাথপিণ্ডিক।''

বুদ্ধের এ উক্তিতে স্থবির আনন্দের জ্ঞানের গভীরতা, বিচার-বুদ্ধির নিপুণতা ও প্রত্যুৎপন্ন মতিত্বের আভাস রয়েছে সমুজ্জ্বল। এরূপ 'গুণজ্ঞান'---প্রধান সেবকের একান্তই বৈশিষ্ট্য প্রতিপাদক।

(সংযুক্ত নিকায়—দেবপুত্র সংযুক্ত)

* স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী অনাগামী ও অর্হত্বফল সম্বন্ধে জ্ঞান।

২৬। পঞ্চবিধ তেজঃ—

শ্রাবস্তীর পূর্বারাম। সেদিন আশ্বিনী পূর্ণিমা, মহাপ্রবারণা উপোসথ দিবস। এ শুভ তিথি উপলক্ষে শ্রাবস্তীর শ্রদ্ধাপ্রবণ নর-নারী পূর্বারামে সমাগত হয়েছেন। কোশলরাজ প্রসেনজিৎও অপরাহ্নে সমুজ্জ্বল রাজাভরণে বিভূষিত হয়ে পুষ্প ও সুগন্ধদ্রব্য নিয়ে বিহারে উপনীত হলেন। সে-সময়ে জগজ্জ্যোতিঃ সম্বুদ্ধ মহাপারিষদ পরিবৃত হয়ে ধর্মাসনে উপবিষ্ট আছেন।

তখন পারিষদের শেষপ্রান্তে অর্হৎ কালুদায়ি স্থবির ধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে নিমীলিত নেত্রে সমাসীন ছিলেন। তাঁর দেহবর্ণ স্বাভাবিক সোনার বরণই ছিল। এখন তাঁকে আরো অধিক জ্যোতির্ময় দেখাচ্ছিল। এমন সময় পূর্বদিগন্তে স্নিগ্ধোজ্জ্বল শুভ্র-রশ্মির মনোরম প্রভায় জগৎ উদ্ভাসিত করে পূর্ণচন্দ্রের আবির্ভাব হলো এবং পশ্চিম দিগন্তে অস্তমিত হচ্ছিল আলোক-ভাস্বর দিনমণি।

অনুসন্ধিৎসু আনন্দের প্রবল ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করল---পশ্চিম দিগন্তে অস্তগমনোন্মুখ সূর্যের দীপ্তোজ্জ্বল লোহিতক-মণিনিভ মনোরম অরুণ-বরণ আলোকমালা। আবার পূর্বদিগন্তে নবোদিত পূর্ণচন্দ্রের চিত্তাকর্ষক দীপ্তিময়ী স্নিগ্ধা-ধবলা জ্যোৎস্না। একদিকে কোশলরাজের শোভন-মোহন নয়না-ভিরাম শরীর-প্রভা, অপরদিকে পুণ্যপুরুষ শ্রীবুদ্ধের অনুপম অপরূপ ষড়রশ্মি দেদীপ্যমান কনক-বরণ দিব্য-কান্তিময় দেহের অনুপমা প্রভা।

তথাগতের শরীর-প্রভাই আনন্দের নয়ন-রঞ্জন করলো সমধিক। সর্ববিধ প্রভা অতিক্রম করে অসদৃশরূপে বিরোচিত হচ্ছেন জ্যোতির্ময় বুদ্ধ। তখন অনুপম প্রীতিরসে পরিপ্লুত হলো আনন্দের অন্তর। তিনি বুদ্ধকে বললেন প্রসন্নোজ্জ্বল মুখে---"ভন্তে ভগবন্, আমি এখন বিশেষ ভাবেই নিরীক্ষণ করলাম--উদীয়মান চন্দ্র, অস্তগমনোন্মুখ আদিত্য, সমাগত নৃপতি ও তথা-গতের শরীর-প্রভা। কিন্তু প্রভু, প্রভা চতুষ্টয়ের মধ্যে সবচেয়ে অনুত্তর-তথা-গতের প্রভাই অনুত্তরা, নয়নাভিরামা, রুচিদায়িনী ও মনোরঞ্জিনী! সকল প্রভাই অতিক্রম করে বিরোচিত হচ্ছে সুগত-প্রভা। ভগবানের পুণ্যময়

শরীর-প্রভার নিকট সর্বপ্রভাই যেন ম্রিয়মান বলে মনে হচ্ছে! প্রভু, ভবদীয় এমন বৈশিষ্ট্য-পূর্ণ প্রভা সন্দর্শনে আমার অন্তরে অনুপম প্রীতির সঞ্চার হয়েছে, প্রাণে জেগেছে পুলক-শিহরণ।''

আনন্দের এই হর্ষোৎফুল্ল উক্তির প্রত্যুত্তরে বুদ্ধ বললেন--''শোনো আনন্দ, দিবসে বিরোচিত হয় দিনমণি, নিশায় নিশাপতি, বেশ-বিন্যাসেই বিরোচিত হন রাজা, ধ্যাননিবিষ্ট হলেই বিরোচিত হন ক্ষীণাসব। কিন্তু আনন্দ, বুদ্ধগণ পঞ্চবিধ তেজে দিবা-নিশি বিরোচিত হয়ে থাকেন। পঞ্চ-বিধ তেজঃ কি কি? যথা---শীলতেজঃ, গুণতেজঃ, প্রজ্ঞাতেজঃ, পুণ্য-তেজঃ ও ধর্মতেজঃ।

আনন্দ, এই তেজঃ পঞ্চকে তথাগত সতত বিরোচিত, বিভাসিত, বিভূষিত ও পরিশোভিত হয়ে থাকেন। শীলতেজের নিকট দুঃশীল-তেজঃ নিয়ত পরাজিত হয়; তথা—গুণতেজের নিকট নির্গুণ তেজঃ, প্রজ্ঞা-তেজের নিকট দুষ্প্রজ্ঞা তেজঃ, পুণ্যতেজের নিকট অপুণ্যতেজঃ এবং ধর্মতেজের নিকট অধর্মতেজঃ সর্বদা পরাভূত হয়। এ পঞ্চবিধ তেজে তেজস্বী পুরুষ নিরন্তর বিরোচিত হন।''

সম্বুদ্ধের একান্ত সত্য এ-সুশোভন বাক্য আনন্দ সানন্দে অনুমোদন ও প্রতিগ্রহণ করলেন।

(ধর্মপদার্থকথা—ব্রাহ্মণ বর্গ)

২৭। *মার্গফল অভিব্যক্তি*---

একদা সম্বুদ্ধ নাদিক নামক গ্রামের এক ইষ্টক-নির্মিত আবাসে অবস্থান করছিলেন। তথায় এক দিবস আনন্দ উপযুক্ত সময় মনে করে উৎসুক অন্তরে সুগতকে জিজ্ঞাসা করলেন---''প্রভু, কিছুদিন পূর্বে এই নাদিক গ্রামে শাল্হ ভিক্ষু দেহত্যাগ করেছেন। এরপর ভিক্ষুণী নন্দা, উপাসক সুদত্ত (অনাথপিণ্ডিক), উপাসিকা সুজাতা, উপাসক ককুধ, কালিঙ্গ, নিকট কাটিস্সহ, তুট্ঠ, সন্তুষ্ট, ভদ্র ও সুভদ্র এই উপাসকগণ নাদিকেই দেহত্যাগ

করেছেন। তাঁরা মৃত্যুরপর কে কোন্ গতি প্রাপ্ত হয়েছেন?"

তদুত্তরে দিব্যদর্শী বুদ্ধ বললেন---"আনন্দ, শাল্ব ভিক্ষু অর্হৎ হয়েছিল, সে পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হয়েছে। ভিক্ষুণী নন্দা লাভ করেছিল অনাগামী ফল, সে শুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোকে প্রাদুর্ভূত হয়েছে; সেখানেই সে পরিনির্বাপিত হবে। উপাসক সুদত্ত সকৃদাগামী, উপাসিকা সুজাতা স্রোতাপন্না, ওরা দেবলোকে উৎপন্ন হয়েছে। ককুধ, কালিঙ্গ, নিকট, কটিস্সহ, তুট্ঠ, সন্তুট্ঠ, ভদ্র ও সুভদ্র প্রভৃতি অনাগামী ফললাভী, তারাও শুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোকে প্রাদুর্ভূত হয়েছে। তথায় তারা নির্বাণ সাক্ষাৎ করবে।

আনন্দ, এই নাদিকে পঞ্চাশেরও অধিক অনাগামী উপাসক তনু-ত্যাগের পর শুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হয়েছে, তারা সেখান থেকেই নির্বাণ সাক্ষাৎ করবে। নব্বই জনেরও অধিক সকৃদাগামী এবং পঞ্চশতেরও অধিক স্রোতাপন্ন উপাসক-উপাসিকা দেহ ত্যাগের পর দেবলোকে প্রাদুর্ভূত হয়েছে।

আনন্দ, মানবের তো মৃত্যু হবেই, এটা তো স্বাভাবিক ধর্ম। তোমরা যদি নিয়ত মৃতব্যক্তি সম্বন্ধে এরূপ ভাবেই আমাকে জিজ্ঞাসা করে থাকো, তবে তো তা আমার পক্ষে একান্তই ক্ষতিকর এবং উপদ্রব ও ক্লেশজনক। জ্ঞানোন্মেষ সহকারে বুদ্ধ-চক্ষে নিরীক্ষণ করা তথাগতের পক্ষে তা কেবল কায়িক পরিশ্রম করা মাত্র; অপিচ, এতে বিনেয়-জনের মুক্তি লাভও ঘটে না, কোনো অর্থ-সিদ্ধও হয় না। সুতরাং আনন্দ, ধর্মাদর্শ (ধর্মরূপ দর্পণ) স্বরূপ ধর্মের ক্রমপর্যায় দেশনা করবো। আর্যশ্রাবকগণ ইচ্ছা করলে, আজ থেকে স্বীয় লব্ধ মার্গ-ফলের কথা প্রকাশ করতে পারবে।

আনন্দ, সে ধর্মাদর্শ ও ধর্মপর্যায় কিরূপ? এ বুদ্ধ শাসনে আর্যশ্রাবকগণ সম্বুদ্ধের গুণরাজি সম্যক্রূপে জ্ঞাত হয়ে তৎপ্রতি অবিচলিতা শ্রদ্ধা সম্পন্ন হয়। তারাই প্রকৃষ্টরূপে অবগত হয়ে থাকে---তথাগত কিরূপ গুণের অধিকারী হলে 'অর্হৎ, সম্যক্ সম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণ সম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ, অনুত্তর পুরুষ-দমনকারী সারথি, দেব-নরের শাসনকর্তা, বুদ্ধ ও ভগবান' এসব অভিধায় আখ্যায়িত হন।

তারাই ধর্মের গুণরাশি যথার্থরূপে জ্ঞাত হয়ে তৎপ্রতি হয় অচলা শ্রদ্ধা সম্পন্ন। তারাই সম্যক্‌রূপে জ্ঞাত হয়ে থাকে---'সু-আখ্যাত, সংদৃষ্টিক, অকালিক, সুবিশুদ্ধ হেতু 'এসো দেখো' বলে আহ্বান যোগ্য, ঔপনায়নিক (মার্গফল প্রদায়ক), বিজ্ঞের স্বয়ং জ্ঞাতব্য এ ধর্ম।

তারা সংঘের গুণরাজি যথাযথ জ্ঞাত হয়ে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা-প্রযুক্ত হয়। তারাই সম্যক্ বিদিত হয়ে থাকে---'তথাগতের শ্রাবকসংঘ সুপ্রতিপন্ন, ঋজুমার্গ প্রতিপন্ন, ন্যায় প্রতিপন্ন, সমীচীন প্রতিপন্ন, আট শ্রেণীতে সুবিভক্ত (মার্গস্থ-ফলস্থ হিসাবে) চার পুরুষ যুগল, আহবনীয় (আহ্বান করে দান প্রদানের যোগ্য), প্রাপণীয়, দাক্ষিণ্য (দানীয় বস্তু পাবার যোগ্য পাত্র), অঞ্জলি-বদ্ধ হয়ে বন্দনার যোগ্য, জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র।''

আর্যশ্রাবকগণ আর্য-কান্ত শীলে নিজকে সম্যকরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। যে শীল বিজ্ঞজন প্রশংসিত, পাপমুক্ত ও সমাধিপ্রাপক, সে-শীলেই তারা বিমণ্ডিত হয়। হে আনন্দ, এরূপ ধর্মাদর্শ ও ধর্মপর্যায় সমন্বিত আর্যশ্রাবকগণ যদি ইচ্ছা করে, তবে তারা স্বীয় লব্ধ মার্গ-ফলের কথা প্রকাশ করতে পারে।''

মতিমান আনন্দ প্রসন্ন অন্তরে সুগত-বাক্য অনুমোদন ও প্রতিগ্রহণ করলেন।

(দীর্ঘ নিকায়—মহাপরিনির্বাণ সূত্র)

২৮। দেবরাজ জনবসভ—

নাদিকের ইষ্টকাবাস। এক নির্জন রাত্রে আনন্দের অন্তরে এরূপ প্রশ্নের উদয় হলো---''কাশী, কোশল, বর্জী, মল্ল, চেতি, বংশ, কুরু, পাঞ্চাল, মৎস্য, সুরসেন প্রভৃতি প্রদেশ সমূহের উপাসক-উপাসিকাদের মধ্যে যাঁদের মৃত্যু হয়েছে, তাঁদের গতি সম্বন্ধে বুদ্ধ প্রকাশ করেছেন। তথা নাদিকের ভক্তবৃন্দ সম্বন্ধেও ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু, এযাবৎ মগধবাসী সম্বন্ধে তো কোনও উল্লেখ করেন নি। এ পর্যন্ত অঙ্গ-মগধের বহু ধর্মজ্ঞ, ধার্মিক ও শ্রদ্ধাবানের মৃত্যু হয়েছে, তাঁদের সম্বন্ধে বুদ্ধ নীরব কেন? তাঁদের

বিষয় প্রকাশ করলে জনগণের শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পেতো, এতে কল্যাণই হতো; সদ্ধর্ম আচরণে তাঁদের প্রবৃত্তি জন্মাতো এবং এতেই তাঁরা সুগতি লাভ করতেন।

মগধরাজ বিম্বিসার ছিলেন পরম ধার্মিক। ত্রিরত্নে ছিল তাঁর অচলা শ্রদ্ধা, আর্য-কান্ত শীলে পরমা প্রীতি। তাঁর কোন্ গতি হয়েছে, তাও প্রকাশ করেন নি বুদ্ধ। যে মগধে তিনি সম্বোধি লাভ করেছেন, সে মগধের বুদ্ধ-ভক্তদের সম্বন্ধে তাঁর এ নীরবতা ভালো মনে হচ্ছে না। কারণ, এতে মগধের ভক্তবৃন্দের অন্তরে আঘাতও লাগতে পারে। আমি সুগতকে বিশেষ-ভাবে অনুরোধ করবো, তিনি যেন তাঁদের সম্বন্ধে যথাযথ ঘোষণা করেন।" এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে নিশাবসানে বুদ্ধ সমীপে তাঁর চিন্তিত বিষয় নিবেদন করলেন। তাঁর মনোভাব নিপুণতার সহিত ব্যক্ত করার পর শাস্তাকে বন্দনা ও প্রদক্ষিণান্তে প্রত্যাবর্তন করলেন।

প্রজ্ঞানিধি ভগবান মধ্যাহ্ন আহারের পর ইষ্টকাবাসে প্রবেশ করে ধ্যানে অভিনিবিষ্ট হলেন। অভিনিবেশ সহকারে বুদ্ধ-নেত্রে একে একে অব-লোকন করতে লাগলেন মগধের পরলোকগত শ্রদ্ধাবান উপাসক-উপাসিকাদের মধ্যে কে কোথায় কোন্ গতি, কোন্ অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছেন। অভিজ্ঞান প্রভাবে সম্যক্ রূপে অবগত হলেন তাঁর অভীষ্ট বিষয়। অপরাহ্নে তিনি ধ্যানাসন হতে ওঠে ইষ্টকাবাস থেকে বের হলেন এবং বিহার-ছায়ায় প্রজ্ঞাপ্ত আসনে উপবেশন করলেন।

সেবক আনন্দ দেখলেন---তথাগতের পুণ্য-লাঞ্ছিত আনন আজ অতি সমুজ্জ্বল ও সুপ্রসন্ন হয়েছে। তা দেখে প্রীতিতে পূর্ণ হয়ে ওঠ্‌ল বুদ্ধগত-প্রাণ আনন্দের অন্তর। তিনি প্রীতি-উচ্ছ্বাসে বললেন---"প্রভু ভগবন্, ইদানীং আপনাকে সুপ্রসন্ন দেখাচ্ছে, মুখবর্ণ সমুজ্জ্বল হয়েছে। মনে হয়, আজ নিশ্চয়ই আপনি শান্তিতে অবস্থান করেছেন।"

বুদ্ধ স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন---"আনন্দ, আজ মধ্যাহ্ন আহারের পর নির্জনে সমাধীন হয়ে মগধের পরলোকগত উপাসক-উপাসিকাদের সম্বন্ধে একে একে চিন্তা করতে আরম্ভ করলাম। এমন সময় এরূপ এক অদৃশ্য দৈব-বাণী

আমার শ্রুতি-গোচর হলো---'ভগবন্, আমি জনবসভ; সুগত, আমি জনবসভ।'

আনন্দ, ইতিপূর্বে 'জনবসভ' বলে কারো নাম তুমি শুনেছো কি?''

''প্রভু, ইত্যগ্রে কখনও আমি এরূপ নাম শুনিনি। অপিচ, এখন জনবসভ নাম শুনে আমার শরীর রোমাঞ্চিত হচ্ছে। মনে হয় প্রভু, এ জনবসভ নিম্ন শ্রেণীর দেবতা নন্।''

''আনন্দ, সেই দৈববাণীর সঙ্গে সঙ্গেই দীপ্তিময় অপরূপ লাবণ্য-মণ্ডিত সে দেবপুত্র আমার সম্মুখে আবির্ভূত হলেন। তখন দেবপুত্র আবার সুধা-ময় কণ্ঠে বললেন---'ভগবন্, আমি বিম্বিসার; সুগত, আমি বিম্বিসার। ভন্তে, মহারাজ বৈশ্রবণের সহিত ইতিপূর্বেও আমার মিলন ঘটেছিল। বর্ত্তমান মিলন হচ্ছে সপ্তম মিলন। আমি মানবকুলেও রাজা ছিলাম, এখন দেবকুলেও আমি রাজা। মানবকুলের সাত জন্ম এবং দেবকুলের সাত জন্ম, এ চৌদ্দটি পূর্বজন্মের কথা আমি স্মরণ করতে পারি। ভগবন্, আমি এখন দুঃখময় চার অপায়-বিমুক্ত। অধুনা আমি সকৃদাগামী ফল সাক্ষৎ করবার প্রচেষ্টায় আছি।'

আনন্দ তখন সবিস্ময়ে বললেন---''আশ্চর্য, আশ্চর্য ভন্তে! জনবসভ দেবপুত্রের এ উক্তি একান্তই বিস্ময়কর! তিনি যে এ মহান্ প্রতিষ্ঠা স্রোতাপত্তি ফল সাক্ষাৎ করেছেন, তা কিরূপে অবগত হলেন?''

শোনো আনন্দ, দেবপুত্র বলে যেতে লাগলেন---'হে ভগবন্, হে সুগত, একমাত্র আপনারই আনুকূল্যে আমার এ নিয়তি। ভন্তে, যে মুহূর্তে আমি তথাগতের প্রতি একাগ্রচিত্ত ও অচলা শ্রদ্ধাপ্রবণ হয়েছিলাম, তখন থেকেই সম্যক্রূপে জ্ঞাত হয়েছিলাম---আমি দুর্গতিমুক্ত হয়েছি। দীর্ঘকাল যাবৎ আমার যে, এ সৌভাগ্য প্রবর্তিত হবে, তাও আমি জ্ঞাত হয়েছিলাম। অধুনা আমি সকৃদাগামী ফল লাভের আশাতেই রয়েছি।

ভন্তে, মহারাজ বৈশ্রবণ কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে কোনো কার্যোপলক্ষে এখন আমি মহারাজ বিরূঢ়কের নিকট যাচ্ছি। পথে চিন্তা করলাম---'আমার পরমারাধ্য মুক্তিদাতা ভগবান এখন কোথা আছেন এবং কোন্ অবস্থায় বিহরণ করছেন?' তখন জ্ঞাত হলাম প্রভু, আপনি এখানে

নিবিষ্টচিত্তে মগধের পরলোকগত শ্রদ্ধাপ্রবণ উপাসক-উপাসিকাদের গতি ও অবস্থা নির্ণয়ে ব্যাপৃত আছেন।

ভগবন্, মগধের শ্রদ্ধাবানগণ মৃত্যুরপর কিরূপ গতি ও কোন্ অবস্থা সম্প্রাপ্ত হয়েছেন, তা আমি ইতিপূর্বে স্বয়ং মহারাজ বৈশ্রবণের মুখেই শুনেছি। ভন্তে, তখনই আমি চিন্তা করেছিলাম---'ভগবানকেও দর্শন করবো এবং এ বিষয়ও তাঁকে নিবেদন করবো।' প্রভু, এখন কেবল এ দ্বিবিধ কারণেই আমার এ আগমন।"

বুদ্ধের মুখে এ অপূর্ব কথা শুনে আনন্দ বিস্ময় ও বিমুগ্ধ হলেন। সুগত-বাক্য সানন্দে তিনি অনুমোদন ও অভিনন্দন করলেন। ভিক্ষু-ভিক্ষুণী ও উপাসক-উপাসিকাদের নিকট আনন্দ সাগ্রহে এ প্রীতিদায়িনী বার্তা প্রচার করলেন। এতে জনসাধারণের চিত্ত শ্রদ্ধায় সমৃদ্ধ হয়েছিল।

(দীর্ঘ নিকায়---জনবসভ সূত্র)

২৯। নিকৃষ্টতম দোষ চতুষ্টয়---

শ্রাবস্তীর জেতবন বিহার। মহাকারুণিক বুদ্ধ পাঁচজন লোককে ধর্মদেশনা করছেন। তখন তাঁকে বীজনী দ্বারা শীতল বায়ু দান করছেন আনন্দ। শ্রোতৃ পঞ্চকের অবস্থা দেখে স্থবির ক্ষোভস্বরে বুদ্ধকে বললেন---"প্রভু, লক্ষ জনকে দেশনা করার মতো এদের আপনি উদাত্ত কণ্ঠে দেশনা করছেন। আমার মনে হয়, এ কেবল আপনার নিষ্ফল পরিশ্রম।"

সুগত বিস্ময় দৃষ্টিতে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন---"আনন্দ, এরূপ বল্‌ছো কেন?"

"প্রভু, শ্রোতাদের অবস্থা লক্ষ্য করুন। একজন উপবিষ্টাবস্থায় ঘুমে ঢলে পড়ছে, একজন করছে নখে মৃত্তিকা খনন, বৃক্ষ * সঞ্চালন করছে একজন, একজন চেয়ে রয়েছে আকাশের দিকে, ধর্ম শুনছে মাত্র একজনই।"

বিমুক্তির হেতু-সম্পদ সম্পন্ন ব্যক্তি যদি এক জনও হন, ওঁর জন্যও মহাকারুণিক তথাগতের অন্তর হয়ে ওঠে উচ্ছ্বসিত, কণ্ঠ হয় মুখর। তখন

* ছোট গাছ।

আকাশ-গঙ্গা অবতরণ করার মতো মেঘমন্দ্রস্বরে দেশনা করেন মুক্তির বাণী। বুদ্ধের নিকট ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণ, ধনী-নির্ধন, হীন-উত্তম ভেদাভেদ নেই। এক জনের জন্যও তিনি শত ক্রোশ অতিক্রম করে সাগ্রহে তাঁকে মুক্তিদান করেন। বুদ্ধ-কৃত্য, বুদ্ধের স্বভাব-ধর্ম ও বুদ্ধের রীতি-নীতি এরূপই।

সুগত জিজ্ঞাসা করলেন---"হে আনন্দ, এদের সম্বন্ধে তুমি অবগত আছ কি?"

"না ভন্তে।"

"তবে শোনো আনন্দ, এদের মধ্যে যে লোকটি নিদ্রা যাচ্ছে, সে পাঁচ শত জন্মাবধি সর্প হয়েছিল। এ নিদ্রায় সে অভ্যস্ত এবং এ নিদ্রা ওর সংস্কারের আকর্ষণ। তাই সে আমার কথায় মন সংযোগ করতে পারছে না।"

আনন্দ সমুৎসুকে জিজ্ঞাসা করলেন---"এ লোকটি যে, পাঁচশত বার সর্পরূপে জন্মগ্রহণ করেছিল, তা কি অনুক্রমে, না কোনো কোনো সময়ে?"

"আনন্দ, এ লোকটি অতীতে এক সময় মানবকুলে, এক সময় দেবকুলে, আর এক সময় সর্পকুলে, এরূপভাবে যে কতো জন্ম পরিগ্রহ করেছে, এর ইয়ত্তা নেই। তা ছাড়াও, এক সময় ক্রমান্বয়েই পাঁচশত বার সর্পকুলে জন্ম পরিগ্রহ করেছিল।

আর যে লোকটি নখে মাটি খনন এবং আঙ্গুল দিয়ে মাটিতে রেখাপাত করছে, সে অনুক্রমে পাঁচশত বার কেঁচোরূপে জন্ম পরিগ্রহ করেছিল। মহীলতার স্বভাব মাটি খনন করা। এর সে অভ্যাস এখনও রয়ে গেছে।

যে লোকটি গাছ নাড়ছে, অনুক্রমে সে পাঁচশত বার বানররূপে জন্ম পরিগ্রহ করেছিল। সেই সুদীর্ঘ কালের অভ্যাস এখনও তার রয়ে গেছে।

যে লোকটি আকাশ নিরীক্ষণ করছে, সে পাঁচশত জন্মে নক্ষত্র-গণক ছিল। আকাশ অবলোকনের কারণও হচ্ছে পূর্বসংস্কার। তাই আমার কথার প্রতি এর চিত্তাকর্ষণ হচ্ছে না।

যে লোকটি আমার দেশিত ধর্ম একাগ্রমনে শুনছে, সে অনুক্রমে পাঁচশত জন্মে ত্রিবেদ পারদর্শী ও মন্ত্র-অধ্যাপক ব্রাহ্মণ ছিল। এর পূর্ব সংস্কারানু-

রূপ গঠিত চিত্তের অনুপ্রেরণায় সগৌরবে মনোযোগের সহিত ধর্ম শুনছে। সত্যধর্মের প্রতিটি বিষয়ে সে উৎসাহিত ও অভিরমিত হচ্ছে। এর উদ্দেশ্যেই আমি ধর্মদেশনা করছি।"

আনন্দ কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন---"প্রভু, আপনার পীযূষবর্ষিণী ওজস্বিনী দেশনা কতো মর্মস্পর্শী! যেমন ভন্তে চর্মভেদ করে মাংসে, মাংস ভেদ করে অস্থিতে, অস্থি ভেদ করে অস্থিমজ্জায় মিশে যাওয়ার মতোই চমকপ্রদ অপূর্ব বাণী! তবুও কেন প্রভু, এদের চিত্ত আকৃষ্ট হচ্ছে না? এদের মর্মস্থলে কেন ঘা দিতে পারছে না? আশ্চর্য ভন্তে, এরা যেন শ্রবণেন্দ্রিয় হতে বিচ্যুত! এর কারণ কি ভন্তে?"

"আনন্দ, আমার দেশিত ধর্ম এদের পক্ষে সুশ্রবণীয় বলে তোমার মনে হচ্ছে নাকি?"

"সবিস্ময়ে আনন্দ জিজ্ঞাসা করলেন—"ভন্তে, দুঃশ্রবণীয় হবে কেন!"

"আনন্দ, এরা বহু শত সহস্র কল্পাবধি বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের নাম পর্যন্ত কখনও শোনেনি। সদ্ধর্ম শ্রবণে অসমর্থ হয়ে অনন্ত জন্ম অসারেই জীবন অতিক্রম করেছে। অতীতের সুদীর্ঘ কাল ধরে এরা কেবল অসার বাক্যই শুনে এসেছে। প্রমাদ বহুল হয়েই অতীত জন্ম এরা অতিবাহিত করেছে। তাই এরা তখন ধর্মাচরণ ও ধর্মশ্রবণ করতে সক্ষম হয়নি।"

"ভন্তে, সক্ষম না হওয়ার মূল কারণ কি?"

"আনন্দ, কামরাগ, বিদ্বেষ, মোহ ও তৃষ্ণা এ চারটি মহাদোষের কারণেই এরা সক্ষম হতে পারেনি। বস্তুতঃ অনুরাগাগ্নি জগতে অদ্বিতীয় অগ্নি এ অগ্নি নিরন্তর জীবনকে দগ্ধ-বিদগ্ধ করে। সেরূপ বিদ্বেষ সম পাপগ্রহ, মোহ সম সুদৃঢ় জাল এবং তৃষ্ণা সমা অপূর্ণা নদী এ জগতে আর দ্বিতীয় নেই।"

সার্থক হলো বুদ্ধের ধর্ম দেশনা। একাগ্রচিত্তে যিনি ধর্ম শুনেছিলেন, তিনি হলেন স্রোতাপন্ন। আনন্দ সুগতের একান্ত সত্যবাণী সানন্দে অনুমোদন ও প্রতিগ্রহণ করলেন।

(ধর্মপদার্থকথায় পঞ্চ উপাসকের কাহিনী)

৩০। মৃত্যু অনিশ্চিত----

শ্রাবস্তীর জেতবন বিহার। একদিন পূর্বাহ্নে বুদ্ধ আনন্দকে সঙ্গে নিয়ে ভিক্ষার্থী হয়ে শ্রাবস্তীর জনপদে বের হলেন। পথে এক স্থানে সুগতের মুখে স্মিত-হাস্য বিকশিত হলো। আনন্দের নয়ন-পথে তখন বিভাসিত হলো বুদ্ধের শ্বেত দন্তের শ্বেত-রশ্মি। "অকারণে বুদ্ধ হাসেন না' এ চিন্তা করে কৌতূহলাক্রান্ত হলো আনন্দের অন্তর। তিনি বিনীত-বাক্যে এ হাসির কারণ জিজ্ঞাসা করলেন।

সুগত জিজ্ঞাসা করলেন---"আনন্দ, ওই নদী-তীরে পাঁচ শত গো-শকট দেখছো কি?"

"হ্যাঁ ভন্তে।"

"শকট সমূহ বস্ত্রে পূর্ণ। যিনি এর মালিক, তাঁর নাম---'মহাধন বণিক'। বৃষ্টিতে নদী জলপূর্ণ হওয়াতে নদী অতিক্রম করতে অসমর্থ হয়ে বণিক সিদ্ধান্ত করেছেন, এ বৎসর এখানেই বস্ত্র বিক্রয় করবেন। কিন্তু আনন্দ, তাঁর জীবনের যে, অন্তরায় ঘটবে, তা তিনি জানেন না।"

আনন্দ তখন ব্যগ্র কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন--"প্রভু, তাঁর জীবনের অন্তরায় কখন ঘটবে?"

"আর মাত্র সাত দিন। সপ্তম দিনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই বণিকের মৃত্যু হবে। আজকার করণীয় কাজ আজই সম্পাদন করা কর্তব্য। আগামীকাল যে, মৃত্যু হবে না, তাই বা কে জানে। মহাশক্তিশালী মৃত্যুরাজের সঙ্গে পেরে ওঠা সম্ভব নয়।"

আনন্দের অন্তর তখন করুণার্দ্র হলো। তিনি বল্লেন---"প্রভু, আমি এখন গিয়ে তাঁকে একথা জানাবো।"

"যাও আনন্দ, হঠাৎ বলবে না; উপদেশের মাধ্যমে বুঝিয়ে দেবে।"

আনন্দ ভিক্ষাচর্যায় বের হয়ে বণিক সন্নিধানে উপনীত হলেন। তিনি স্থবিরকে হৃষ্টচিত্তে আহার্য দ্রব্য দান করলেন। আনন্দ জিজ্ঞাসা করলেন---"উপাসক, আপনারা কোথা থেকে এসেছেন?"

"ভন্তে, বারাণসী থেকে।"

"কদ্দিন এখানে থাকবেন?"

"মনে হয় ভন্তে, এক বৎসরের কম নয়।"

"উপাসক, সংসার অনিত্য। তথা জীবনও অনিত্য। এই আছে এই নেই, জল বুদ্বুদের মতো। কখন যে, জীবনের অন্তরায় ঘটবে, তা অতি দুর্জ্ঞেয়। অপ্রমাদের সহিত অবস্থান করাই ভালো।"

"ভন্তে, আমার জীবনের কি কোনও অন্তরায় ঘটবে?"

"অসম্ভব নয়; জ্ঞানীজন কিন্তু, মৃত্যুর জন্য সর্বদাই প্রস্তুত থাকেন।"

"ভন্তে, কি করা উচিত?"

"দান, শীল ও ভাবনায় নিযুক্ত হওয়াই একান্ত প্রয়োজন। বুদ্ধ প্রকাশ করেছেন, আপনার পরমায়ু আর মাত্র সাতদিন অবশিষ্ট আছে। কুশলকর্মে অবহিত হউন।"

আনন্দের কথা শুনে বণিক সন্ত্রস্ত হলেন। তিনি খুব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। ব্যগ্র কণ্ঠে বলে উঠলেন---"জীবনের সব কিছুই তো অপূর্ণ রয়ে গেলো।"

আনন্দ বললেন---"উপাসক, মহাসমুদ্রের মতো অপূর্ণই থেকে যায় তৃষ্ণা। বহু অপূর্ণ আশা নিয়েই মানুষকে জীবন-লীলা সংবরণ করতে হয়। যেহেতু, আয়ু অতি ক্ষণস্থায়ী, তরঙ্গ সদৃশ তরল, পদ্ম-পত্রস্থ জল-বিন্দুর মতো অতি চঞ্চল। ধর্মই পরলোকগামীর পাথেয় স্বরূপ, ধর্মই ভয়োদ্বিগ্ন জনের আশ্বাসক, এ জগতে ধর্ম ব্যতীত স্থির-প্রেমা আর অন্য বান্ধব নেই। উপাসক, সম্যক্ সম্বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হউন। তাঁর উপদেশই অনুসরণ করুন।"

বণিক ত্রাসিত অন্তরে সুগতের সহিত সাক্ষাৎ করলেন। কারুণিক বুদ্ধ করুণাঘন অন্তরে তাঁকে বললেন---"উপাসক, জ্ঞানীর পক্ষে এরূপ চিন্তা করা উচিত নয়---এ বর্ষা এখানে অতিবাহিত করবো, গ্রীষ্মে ওখানে অবস্থান করবো, এ বৎসর একাজ, পর বৎসর অমুক কাজ সম্পাদন করবো। প্রতি মুহূর্তেই জীবনের অন্তরায় সম্বন্ধে চিন্তা করা কর্তব্য। মৃত্যু কখনও সময়ের অপেক্ষা করে না এবং করে না কাউকে অনুগ্রহ। শিশু, যুবা,

বৃদ্ধ; পণ্ডিত-মূর্খ, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলকেই নির্বিচারে অবলীলা ক্রমে গ্রাস করে। সকালে কি বিকালে, দিবসে কি রাত্রে, অদ্য কি কল্য, এখন কি তখন, স্বগৃহে কি পরগৃহে, স্বদেশে কি বিদেশে, পথে ঘাটে মাঠে, কখন যে কোথায়, কি অবস্থায় বা কিভাবে, কৃতান্তের কবলিত হতে হবে, এর তো নিশ্চয়তা নেই। মোহান্ধ মূর্খজনই আপন জীবনের অন্তরায় সম্বন্ধে চিন্তা করে না। অজ্ঞ ব্যক্তিই আপন মৃত্যুর কথা ভুলে থাকে। তাদের পক্ষেই পাপকর্ম সম্পাদন করা অতি সহজ। এরূপ মোহান্ধ ব্যক্তিরই সংসার-ভ্রমণ দীর্ঘতর হয়। উপাসক, সাত দিন ব্যাপী আপনি কুশল কর্মেই নিরত থাকুন; দান, শীল ও ভাবনায় নিযুক্ত হোন। আপনার পরম সৌভাগ্য যে, অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র বুদ্ধ ও আর্যসংঘের সাক্ষাৎ পেয়েছেন এবং অপ্রমাণ পুণ্যার্জনের সুযোগ লাভ করেছেন। ধার্মিকের ভবিষ্যৎ জীবন হয় আনন্দময় ও সুখময়।"

সম্বুদ্ধের উপদেশ শুনে তিনি অনেকটা সান্ত্বনা পেলেন এবং তখন হতেই কুশল কর্মে ব্রতী হলেন। প্রত্যহ তিনি বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষু সংঘকে আর্যোচিত বিশুদ্ধ সংঘদান দিয়ে, আর্যকান্ত শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে এবং বুদ্ধের নির্দেশানুযায়ী ভাবনায় আত্মনিয়োগ করে মহাপুণ্য অর্জন করলেন।

সপ্তম দিন আহার কৃত্যের অবসানে তথাগত ত্রিবিধ কুশল কর্মের আশ্চর্যপ্রদ ঋদ্ধিময়-পুণ্যফল সম্বন্ধে বর্ণনা করলেন। সুগতের প্রাণস্পর্শী অপূর্ব দেশনা শুনে বণিক আনন্দে অভিভূত হলেন। শান্তিদায়ক ধর্মবাণী বিদূরিত করলো তাঁর ত্রাস ও সন্তাপ। তখনই তিনি স্রোতাপত্তি ফল সাক্ষাৎ করলেন। স্রোতাপন্নের অন্তরে যে, কী প্রীতি ও আনন্দের সঞ্চার হয়, তা অনির্বচনীয়। সেই অনুপম ও অফুরন্ত আনন্দ নিয়ে মহাধনাঢ্য বণিক সে দিনই ইহলোক ত্যাগ করলেন। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তিনি তুষিত ভবনে মহাপুণ্যঋদ্ধি সম্পন্ন দেবপুত্র রূপে প্রাদুর্ভূত হলেন। বণিকের দেবলোক প্রাপ্তির শুভ বার্তা শুনে আনন্দ অত্যধিক আনন্দিত হলেন।

(ধর্মপদার্থকথা—মহাধন বণিকের কাহিনী)

৩১। উত্তরোত্তর সম্যক্ প্রচেষ্টা—

একদা ধর্মকেতু তথাগত ধর্মপ্রচার মানসে সশিষ্য কোশলরাজ্যে পরিক্রমণে বের হলেন। একদিন দীর্ঘপথ অতিক্রম করার সময় পথি মধ্যে কোনও এক স্থানের এক প্রকাণ্ড শালবন সুগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। তখন তিনি মার্গ ত্যাগ করে শালবনাভিমুখে অগ্রসর হলেন। তাঁর পশ্চাদনুসরণ করলেন ভিক্ষুগণ। । সম্বুদ্ধ শালবনে প্রবেশ করলেন। সেখানে এক বিবেক পূর্ণস্থানে উপগত হয়ে বসবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে, সেবক আনন্দ আসন পেতে দিলেন। লোকগুরু শাস্তা সমাসীন হলে, তাঁর পশ্চাতে অর্ধচন্দ্রাকারে উপবিষ্ট হলেন ভিক্ষুগণ। সেবক আনন্দ সেবা কাজে নিযুক্ত হলেন।

তখন দিব্যদর্শী বুদ্ধের প্রসন্নোজ্জ্বল আনন স্মিতহাস্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠ্লো। পুণ্য-লক্ষণ লাঞ্ছিত শুক্-তারকানিভ শোভন-শুভ্র দন্তরাজির মোহন-রশ্মি বিদ্যুৎ-বিকাশবৎ আলোকিত করলো বনভূমি। অনুসন্ধিৎসু আনন্দের অন্তরে জাগ্লো ঔৎসুক্য। জিজ্ঞাসা করলেন---"প্রভু, আপনার এ হাসির কারণ কি? এখানে এমন কোন্ বিষয় দর্শন করলেন, যা আমাদের দৃষ্টি-শক্তির অতীত?"

সমন্তচক্ষু বুদ্ধ প্রসন্নকণ্ঠে বললেন---"আনন্দ, শোনো তবে, এক অপূর্ব কাহিনী। সুদূর অতীতে এ প্রদেশ ছিলো বহু জনাকীর্ণ সমৃদ্ধ নগর। তখন এ নগরে অবস্থান করছিলেন ভগবান কশ্যপ বুদ্ধ। তখন এ নগরে অবস্থান করছিলেন ভগবান কশ্যপ বুদ্ধ। তাঁর গবেসী নামক এক উপাসক ছিলেন। এ উপাসকের কিন্তু, শীল-বিশুদ্ধির প্রতি তেমন মনোযোগ ছিলো না। পঞ্চশত উপাসক গবেসীর অনুবর্তী হয়ে চল্তো। তাঁদের তিনি উপদেশ দিতেন। কিরূপ গুণ সম্পন্ন হলে ত্রিরত্নের উপাসকরূপে গণ্য হয় এবং তা'তে কতদূর পুণ্য-সম্পদের অধিকারী হয়, ইত্যাদি উপদেশ দানে তাঁদের প্রতিষ্ঠাপিত করেছিলেন ত্রিশরণে। তাঁদেরও কিন্তু, তেমন একাগ্রতা ছিলো না শীল-বিশুদ্ধির প্রতি।

এক দিবস গবেসীর অন্তরে এরূপ ভাবোদয় হলো---"আমি পাঁচশত

উপাসকের অগ্রণী, প্রধান, উপকারী ও কুশলকর্মে নিয়োজক। অথচ আমার তেমন দৃষ্টি নেই শীল-বিশুদ্ধির প্রতি। সহচরদের অবস্থাও তাই। আমি তাদেরই সমপর্যায়ভুক্ত, শ্রেষ্ঠ নই এ বিষয়ে। আমার তাদের চেয়ে অধিক গুণবান হওয়া উচিত।" এ'মনে করে তিনি সহচরদের নিকট উপস্থিত হয়ে দৃঢ়তার সহিত বললেন---"তোমরা আজ থেকে আমায় বিশুদ্ধ ও অখণ্ড শীলবান বলে ধারণা করবে।"

আনন্দ, সেদিন থেকে গবেসী উপাসক বিশুদ্ধ ও অখণ্ড-শীলে নিজকে করলেন প্রতিষ্ঠাপিত। এদিকে পঞ্চশত উপাসকও সমবেত হয়ে এরূপ আলোচনায় প্রবৃত্ত হলেন---"এ গবেসী উপাসক আমাদের অগ্রণী ও কুশল কর্মের উদ্যোক্তা। কিন্তু, তিনি এখন হতে হবেন বিশুদ্ধ ও অখণ্ডশীল-পূরক। তিনি যদি তা পারেন, তবে আমরা কেন তা পারবো না? এখন হতে আমরাও হবো বিশুদ্ধ ও অখণ্ড-শীলবান।" এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে তাঁরা সকলেই গবেসীর নিকট উপস্থিত হয়ে বল্লেন---"আর্য, আজ থেকে আমাদেরও বিশুদ্ধ শীল-পূরক ও অখণ্ড-শীলবান বলে ধারণা করবেন।"

অতঃপর আনন্দ, গবেসী চিন্তা করলেন---"এরাও যদি আমার ন্যায় শীলবান হয়ে থাকে, তবে তো এক সমানই হয়ে গেলাম। তা হবে না, আমাকে এদের শ্রেষ্ঠতরই হতে হবে।" এ চিন্তার পর তিনি উপাসকদের নিকট গিয়ে স্থির কণ্ঠে বল্লেন---"প্রিয় বন্ধুগণ, তোমরা আজ থেকে আমায় স্ত্রী-সহবাস বিরত, ব্রহ্মচারী বলেই ধারণা করবে।"

আনন্দ, সেদিন থেকে গবেসী হলেন ব্রহ্মচারী। অন্য উপাসকগণও সংকল্প করলেন যে---"গবেসী যদি ব্রহ্মচারী হন, আমরা কি তা পারি না? আমরাও ব্রহ্মচারী হবো।" তাঁরা গবেসীকে একথা জানালেন।

আনন্দ, গবেসী সোৎসাহে চিন্তা করলেন---"এরা ব্রহ্মচারী হলে, আমি তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর একাহারী হবো।" একথা তাঁদের নিকট গিয়ে বললেন।

আনন্দ, সেদিন থেকে গবেসী বিকাল ভোজন ত্যাগ করে একাহারী হলেন। তাঁকে অনুসরণ করে পঞ্চশত উপাসকও হলেন একাহারী, ত্যাগ

করলেন বিকাল ভোজন। অতঃপর আনন্দ, গবেসী তাঁদের থেকে শ্রেষ্ঠ হবার মানসে ভগবান কশ্যপ বুদ্ধের নিকট লাভ করলেন সুদুর্লভ প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা। অপ্রমাদের সহিত শ্রমণ-ধর্ম রক্ষা করে অচিরেই সাক্ষাৎ করলেন অর্হত্ব ফল।

আনন্দ, গবেসীর প্রব্রজ্যা গ্রহণে তাঁর সহচর পঞ্চশত উপাসকও কশ্যপ বুদ্ধের নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা গ্রহণ করলেন। তাঁরাও অচিরে তৃষ্ণাক্ষয় করে রোধ করলেন জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহ।

আনন্দ, গবেসী প্রমুখ পঞ্চশত পাসক শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠতর, উৎকৃষ্ট থেকে উৎকৃষ্টতর সদ্ধর্ম সাধনে উত্তরোত্তর সম্যক্ প্রচেষ্টা পরায়ণ হয়ে, অচিরেই অনুত্তর বিমুক্তি-সুখের অধিকারী হয়েছিলেন। সেহেতু আনন্দ এরূপই প্রত্যেকের শিক্ষা করা কর্তব্য, এরূপই সম্যক্ সঙ্কল্প করা উচিত---"আমিও নিশ্চয় শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠতর, উত্তম থেকে উত্তমতর, উত্তরোত্তর সম্যক্ প্রচেষ্টা পরায়ণ হয়ে অনুত্তর বিমুক্তি-সুখ সাক্ষাৎ করবো।"

আনন্দপ্রমুখ ভিক্ষুগণ সম্বুদ্ধের শ্রীমুখ নিঃসৃত সারগর্ভ অপূর্ব কথা শুনে পরমাপ্রীতি উপভোগ করলেন। আত্মশুদ্ধির উপায় মূলক এই পরমার্থ শিক্ষা প্রত্যেকেই অন্তরের সহিত গ্রহণ করলেন।

(অঙ্গত্তর নিকায়—পঞ্চক নিপাত)

৩২। *ক্ষোভোপশম—*

কৌশাম্বীর ঘোষিতারাম। সেবক আনন্দ বুদ্ধকে ক্ষুব্ধ স্বরে নিবেদন করছেন---"চলুন ভন্তে, এ মুহূর্তেই এস্থান ত্যাগ করে চলে যাই। এখানে আর অবস্থান করা ঠিক হবে না।"

বুদ্ধ স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন---"আনন্দ, এরূপ বল্‌ছো কেন?"

আনন্দ বেদনা-মিশ্রিত স্বরে বললেন---"এখানকার লোকেরা ভিক্ষুদের পশ্চাদ্ধাবন ক'রে আক্রোশপূর্ণ তিরস্কার করছে। তা শুনে আমি অত্যধিক মর্মাহত হয়েছি। চলুন প্রভু, এখনি এস্থান ত্যাগ করি।"

সুগত শান্ত কণ্ঠে বললেন---"কোথা যাবে আনন্দ ?"

"চলুন প্রভু, আমরা অন্যত্র যাই।"

"সেখানকার লোকেরাও যদি তিরস্কার করে ?"

"তা হলে প্রভু, সে স্থানও ত্যাগ করে অন্যত্র যাবো।"

"আনন্দ, এরূপ করা তো ঠিক নয়। যেখানে উৎপন্ন হয়েছে অবাঞ্ছিত কারণ, সেখানেই হতে হবে এর উপশম। তারপর যেতে পারো অন্যত্র। আনন্দ, তিরস্কার করছে কারা ?"

"ভন্তে, দাস-কর্মচারী পর্যন্ত সকলেই।"

"কেন আনন্দ, এরূপ তিরস্কার করার কারণ কি ?"

"প্রভু, উদয়ন রাজার প্রধানা মহিষী শ্যামাবতীর প্রতি সপত্নী মাগন্ধী ঈর্ষা ও বিদ্বেষ পরায়ণ হয়ে ওঁর বিবিধ অনিষ্ট সাধনের চেষ্টা করেও যখন কিছুই করতে পারলো না, তখন শ্যামাবতীর একান্ত শ্রদ্ধার পাত্র বুদ্ধ ও ভিক্ষুগণকে তিরস্কার করে যদি তাঁর মনোবেদনার সৃষ্টি করতে পারে, মাগন্ধী এতেই আত্মপ্রসাদ লাভ করবে, তাই তিরস্কার করতে লোক নিযুক্ত করেছে। তিরস্কারের এটাই একমাত্র কারণ।"

"ওরা কিরূপ তিরস্কার করছে ?"

"ওরা ভিক্ষুদের পশ্চাদনুসরণ করে বলছে---"চোর চোর, হে অজ্ঞ, মূর্খ, উষ্ট্র, গর্দভ, নারকী, হে পশু, তোদের দুর্গতি ব্যতীত সুগতি নেই, একান্তই তোরা দুর্গতিগামী, ইত্যাদি।"

বুদ্ধ শান্ত কণ্ঠে বললেন---"আনন্দ, সংগ্রামে অবতীর্ণ গজবরের শরীরে ধনু-নিঃসৃত অজস্রশর এসে পড়ে, কিন্তু করিবর তা সহিষ্ণুতার সহিত সহ্য করে। আনন্দ, আমিও তদ্রূপ সহিষ্ণুতার সহিত দুর্জনে পরুষ-বাক্য সহ্য করবো। কারণ এজগতে দুঃশীল ব্যক্তিই সমধিক।

আনন্দ, শিক্ষার গুণে হস্তীও সুদান্ত হয়। আত্মসংযমীই মানবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কারণ, তিনি তিতিক্ষার সহিত দুর্জনের পরুষ-বাক্য সহ্য করেন। গজরাজ সুদান্ত হলে সকলদিক দিয়েই কল্যাণজনক হয়; কিন্তু আনন্দ, আত্মসংযমী মহান্‌জন ততোধিক কল্যাণদায়ক হন।"

অবিসংবাদী সম্বুদ্ধের পরম শান্তিপ্রদ অমৃত-প্রলেপবৎ হিতবাণী শ্রবণে আনন্দের ক্ষোভ ও মর্মদাহ তৎক্ষণাৎ উপশান্ত হয়ে গেলো এবং মুখমণ্ডলও প্রসন্নোজ্জ্বল হলো।

(ধর্মপদার্থকথা—নাগবর্গ)

৩৩। তীর্থীয় প্রভাব—

শ্রাবস্তীর জেতবন বিহার। উপস্থায়ক আনন্দ এক সময় তথাগতকে বলছেন---"প্রভু ভগবন, জগতে যতদিন অর্হৎ সম্যক্ সম্বুদ্ধের প্রাদুর্ভাব না হয়, ততদিনই তীর্থংকর পরিব্রাজকগণ সেবা, পূজা, গৌরব, সম্মান, সৎকার, খাদ্য, ভোজ্য, বস্ত্র, বাসবভন, শয়নাসন ও ঔষধ-পথ্যাদি যাবতীয় বিষয়-বস্তু যথেষ্ট পরিমাণে লাভ করে থাকেন।

যখন ভন্তে, সম্যক্ সম্বুদ্ধ জগতে আবির্ভূত হন, তখন থেকেই তীর্থঙ্কর সন্ন্যাসীদের সকল প্রকার লাভ-সৎকারের পরিহানি ঘটে। অথচ তথাগত ও ভিক্ষু সংঘের দৈনন্দিন লাভ-সৎকারাদি সর্ববিষয়েরই সমৃদ্ধি হচ্ছে। অমিতাভের অনন্যসাধারণ প্রভাবের নিকট তীর্থঙ্করদের প্রভাব প্রতি মুহূর্তেই নিষ্প্রভ ও পরাভূত হচ্ছে।"

আনন্দের এ উক্তি শ্রবণে বুদ্ধ বললেন---"আনন্দ, তুমি যথার্থই বলেছো। বুদ্ধের প্রভাবের নিকট তীর্থঙ্করদের প্রভাব যে, পরাভব ও পরিক্ষীণ হবে, এ রীতি একান্তই স্বাভাবিক। যেমন মনে করো, যতক্ষণ প্রভাকরের উদয় না হয়, ততক্ষণ মাত্র খদ্যোৎ বিরোচিত হয়। বিরোচনের প্রাদুর্ভাবে খদ্যোৎ হতপ্রভ হয়ে পড়ে। ঠিক সেরূপই আনন্দ, যতদিন সম্যক্ সম্বুদ্ধরূপ প্রভাকরের উদয় না হয়, ততদিনই খদ্যোতোপম তীর্থঙ্কর-প্রভাবরূপ ক্ষীণতম-প্রভা বিরোচিত হয়।

এর কারণ কি আনন্দ? এরা নিজেও অবিশুদ্ধ, এদের শিষ্যগণও অবিশুদ্ধ। নিজেও কুতার্কিক ও কুদৃষ্টি পরায়ণ, শিষ্যগণও সেরূপ। নিজেও নয় দুঃখ-মুক্ত, শিষ্যগণও নয় দুঃখ-মুক্ত। এটাই একমাত্র কারণ।"

আনন্দ বুদ্ধের একান্ত সত্যবাণী সানন্দে অনুমোদন ও প্রতিগ্রহণ করলেন।

(উদান—উৎপত্তি সূত্র)

৩৪। কূপ-জল—

থূন নামক মল্লদিগের ব্রাহ্মণগ্রাম। সর্বজ্ঞবুদ্ধ ও ভিক্ষুসংঘ তখন সে গ্রামের এক বৃক্ষ-মূলে উপবিষ্ট আছেন। দূরপথ অতিক্রম করাতে সকলেই পিপাসিত হয়েছেন। সেবক আনন্দকে বুদ্ধ আদেশ করলেন---"আনন্দ, ওই কূপ থেকে পানীয় জল নিয়ে এসো।"

আনন্দ বললেন---"প্রভু, কূপজল দূষিত হয়েছে। এ গ্রামের ব্রাহ্মণগণ এখানকার কূপ সমূহ ভূসি ও তৃণ দিয়ে পূর্ণ করে দিয়েছে। উদ্দেশ্য—বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘ যেন জলপানে বঞ্চিত হন। সুতরাং প্রভু, কূপ থেকে জল আনা সম্ভব নয়।"

বুদ্ধ দ্বিতীয়বার আদেশ করলেও আনন্দ পূর্বোক্ত রূপই বললেন। অপ্রতিম তথাগত তৃতীয়বার গাঢ়স্বরে বললেন---"আমি আদেশ করছি আনন্দ, কূপ থেকে জল নিয়ে এসো।"

তৃতীয়বার যখন আদিষ্ট হলেন, আর উপায় কি; পাত্র হস্তে তাঁকে যেতেই হলো। কূপের নিকট গিয়ে দেখলেন, অদ্ভুত ব্যাপার! কূপের জল স্ফীত হয়ে ভূসি-তৃণ ভেসে যাচ্ছে, কূপের মুখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে, কী স্বচ্ছ--নির্মল জল! আশ্চর্য হলেন আনন্দ। চিন্তা করলেন---"নিশ্চয়ই এটা তথাগতের মহাশক্তি! আহা, সুগত অসাধারণ গুণনিধি।"

স্থবির পাত্রপূর্ণ জলনিয়ে সুগত সমীপে উপনীত হয়ে সবিস্ময়ে বললেন---"আশ্চর্য, অতি আশ্চর্য প্রভু! কূপের জল উচ্ছল হয়ে পড়ছে, ভেসে গেছে ভূসি-তৃণ! স্বচ্ছ ও বিশুদ্ধ জল পাত্র পূর্ণ করে নিয়ে এলাম। ভগবন্, এখন জল পান করুন।"

মুনিপুঙ্গব প্রীতিফুল্ল কণ্ঠে বললেন---"আনন্দ, যিনি তৃষ্ণার মূলোচ্ছেদ

করেছেন, তাঁর জন্য সতত সর্বত্র বিদ্যমান রয়েছে পানীয় জল। কূপ বা সরোবর অন্বেষণের প্রয়োজন হয় না।"

"তৃষ্ণা-বিমুক্ত মহান্ ব্যক্তি মাত্রেরই এরূপ প্রভাব" একথা জ্ঞাত হয়ে আনন্দ অতীব প্রসন্ন ও চমৎকৃত হলেন।

(উদান ও বিমানবত্থু অর্থকথা)

৩৫। হেতু ও নিদান—

এক সময় অমিতাভ বুদ্ধ কর্মাশ্বদম্য নামক নগরে অবস্থান করছিলেন। তত্ত্বজ্ঞান-পিপাসু আনন্দ একদিন উপযুক্ত সময় মনে করে ভগবৎ সকাশে উপনীত হলেন। তাঁকে বন্দনান্তে বিনম্রভাবে বললেন---"আশ্চর্য, আশ্চর্য প্রভু! প্রতীত্য-সম্যুৎপাদ যেমন গম্ভীর, তেমনই গভীররূপে প্রতীয়মান হয়। অথচ, তা আমার নিকট অতি সুস্পষ্ট ও অতি সুখ-বোধ্য।"

আয়ুষ্মান আনন্দের এ উক্তি শুনে ভূরিপ্রজ্ঞ তথাগত গাঢ়স্বরে বললেন--"এরূপ বলো না আনন্দ, এরূপ বলো না। প্রতীত্য-সম্যুৎপাদ অতীব জটিল-তত্ত্বপূর্ণ গভীর বিষয়। তা ভাবুকের নিকট গভীরতররূপেই প্রতীয়মান হয়। এ সত্য সম্যক্ উপলব্ধি করতে না পেরে, প্রবেশ করতে না পেরে এর গভীরতম অভ্যন্তরে, বিজড়িত গ্রন্থিযুক্ত সূত্র-গুটিকার মতো তৃষ্ণা-বিজটিত মানবগণ মুক্তিলাভে অসমর্থ হয়ে, সংসার-চক্রে বারংবার বিঘূর্ণিত হচ্ছে। হচ্ছে না তবুও দুঃখ-দুর্গতির অবসান।

আনন্দ, তোমাকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে---'জরা-মরণের হেতু কি?' তবে তুমি প্রত্যুত্তরে বল্‌বে---'জন্ম।' আবার যদি জিজ্ঞাসিত হও---'জন্মের হেতু কি?' উত্তর দিও---'ভব'১। যদি জিজ্ঞাসিত হও---'ভবের হেতু কি?'

১। কর্মরূপ মহাশক্তি। যার প্রভাবে পুনঃ জন্ম লাভ হয়। অর্থাৎ অবিদ্যা, নিবরণ ও সংযোজন যুক্ত হয়ে তৃষ্ণারূপ জলসিক্ত কর্মরূপ ক্ষেত্রে বিজ্ঞানরূপ বীজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এতেই ভবিষ্যত পুনর্ভবে জন্ম হয়, একেই 'ভব' বলা হয়। অথবা নাম-রূপ সম্ভব হওয়ার লক্ষণই 'ভব'!

তবে উত্তর দিও—'উপাদান' ২ যদি জিজ্ঞাসিত হও—'উপাদানের হেতু কি?' তবে উত্তর দিও—'তৃষ্ণা'। যদি জিজ্ঞাসিত হও—'তৃষ্ণার হেতু কি? তবে উত্তর দিও—বেদনা'। যদি জিজ্ঞাসিত হও—'বেদনার' হেতু কি?' তবে উত্তর দিও—'স্পর্শ' যদি জিজ্ঞাসিত হও—'স্পর্শের হেতু কি?' তবে উত্তর দিও—'নাম-রূপ'। যদি জিজ্ঞাসিত হও—'নাম-রূপের হেতু কি?' তবে উত্তর দিও—'বিজ্ঞান' ৩ যদি জিজ্ঞাসিত হও—'বিজ্ঞানের হেতু কি?' তবে উত্তর দিও—'নাম-রূপ'।

এরূপে আনন্দ, নাম-রূপ থেকে বিজ্ঞানের উৎপত্তি; বিজ্ঞান থেকে নাম-রূপের উৎপত্তি; নাম-রূপ থেকে স্পর্শ ৪ স্পর্শ থেকে বেদনা, বেদনা থেকে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা থেকে উপাদান, উপাদান থেকে ভব, ভব থেকে জন্ম, জন্ম থেকে জরা-মরণ, জরা-মরণ থেকে শোক, পরিদেবন, দুঃখও দৌর্মনস্যাদি বিবিধ অশান্তির সৃষ্টি হয়। এরূপেই উৎপন্ন হয় সমগ্র দুঃখরাশি।

আনন্দ, বেদনা হতেই তৃষ্ণার উৎপত্তি হয়, তৃষ্ণা হতে অন্বেষণ, অন্বেষণ হতে লাভ, লাভ হতে বিচার ৫ বিচার হতে ইচ্ছা (অনুরাগ), ইচ্ছা হতে আকর্ষণ, আকর্ষণ হতে পরিগ্রহণ, পরিগ্রহণ হতে মাৎসর্য, মাৎসর্য হতে আরক্ষ, আরক্ষ হতে দণ্ডগ্রহণ, শস্ত্রগ্রহণ, কলহ, বিবাদ, বিগ্রহ, তুচ্ছার্থক, পিশুণ ও মিথ্যা বাক্যাদি বিবিধ পাপের উৎপত্তি হয়।

(১) রক্ষা করার বিষয়-বস্তুর অভাবে দণ্ডগ্রহণ, শস্ত্রগ্রহণ, কলহ ও বিবাদাদি অকুশল উৎপন্ন হয় না। তদ্ধেতু 'আরক্ষ'—উক্ত অকুশল সমূহের হেতু ও নিদান।

(২) মাৎসর্যের অভাবে আরক্ষের উৎপত্তি হয় না। তদ্ধেতু মাৎসর্য—আরক্ষের হেতু নিদান।

২। তৃষ্ণার দৃঢ়তর অবস্থা।

৩। 'বিজনাতী'তি বিঞ্ঞাণং' বিশেষভাবে জানে, এ অর্থে বিজ্ঞান। প্রতিসন্ধি বশে ১৯ প্রকার ও প্রবর্তীবশে ৩২ প্রকার বিপাকচিত্ত 'বিজ্ঞান' নামে অভিহিত হয়। এখানে প্রতিসন্ধি-বিজ্ঞানই জ্ঞাতব্য। 'প্রতিসন্ধি, অর্থ মাতৃগর্ভে প্রথমোৎপত্তি।

৪। চক্ষু, শ্রোত, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় ও মনঃ সংস্পর্শ।

৫। লব্ধ বিষয়কে কিরূপ করতে হবে, তা স্থীরিকরণ।

(৩) পরিগ্রহের অভাবে মাৎসর্যের উৎপত্তি হয় না। অতএব পরিগ্রহণ---মাৎসর্যের হেতু ও নিদান।

(৪) আকর্ষণের অভাবে পরিগ্রহের উৎপত্তি হয় না। সুতরাং আকর্ষণ---পরিগ্রহের হেতু ও নিদান।

(৫) ইচ্ছার অভাবে আকর্ষণের উৎপত্তি হয় না। তদ্ধেতু ইচ্ছা---আকর্ষণের হেতু ও নিদান।

(৬) বিচারের অভাবে ইচ্ছার উৎপত্তি হয় না। অতএব বিচার---ইচ্ছার হেতু ও নিদান।

(৭) লাভের অভাবে বিচারের উৎপত্তি হয় না। এজন্য লাভ---বিচারের হেতু ও নিদান।

(৮) অন্বেষণের অভাবে লাভের উৎপত্তি হয় না। এজন্য অন্বেষণ---লাভের হেতু ও নিদান।

(৯) তৃষ্ণার অভাবে অন্বেষণের উৎপত্তি হয় না। এজন্য তৃষ্ণা---অন্বেষণের হেতু ও নিদান।

(১০) স্পর্শের অভাবে বেদনার উৎপত্তি হয় না। সুতরাং স্পর্শ---বেদনার হেতু ও নিদান।

(১১) নাম-রূপের অভাবে স্পর্শের উৎপত্তি হয় না। এজন্য নাম-রূপ---স্পর্শের হেতু ও নিদান।

আনন্দ, বিজ্ঞান থেকে নাম-রূপের উৎপত্তি হয়। বিজ্ঞান যদি মাতৃগর্ভে প্রবেশ না করে। তা হলে মাতৃগর্ভে নাম-রূপের প্রতিষ্ঠা হবে কি?"

"হবে না ভন্তে।"

আনন্দ, বিজ্ঞান মাতৃগর্ভে প্রবেশ ক'রে, আবার যদি নিষ্ক্রান্ত হয়ে যায়, তা হলে নাম-রূপের উৎপত্তি হবে কি?"

"হবে না ভন্তে"

"আনন্দ, বিজ্ঞান যদি শিশুকালে নিষ্ক্রান্ত হয়, তা হলে নাম-রূপের বৃদ্ধি, বিকাশ ও প্রসারণ হবে কি?"

"না ভন্তে।"

"তদ্ধেতু আনন্দ, বিজ্ঞানই নাম-রূপের হেতু ও নিদান।"

'আনন্দ, নাম-রূপে যদি বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠা লাভ না করে, তা হলে ভবিষ্যতে জন্ম, জরা ও মরণাদি দুঃখ সমূহের উৎপত্তি হবে কি?"

"না ভন্তে।"

"তদ্ধেতু আনন্দ, নাম-রূপেই বিজ্ঞানের হেতু ও নিদান।"

পণ্ডিত আনন্দ সম্বুদ্ধের তত্ত্ব-বাণী সানন্দে অনুমোদন ও প্রতিগ্রহণ করলেন।

(দীর্ঘনিকায়—মহানিদান সূত্র)

৩৬। সপ্ত অপরিহানির কারণ—

একদা অবিসংবাদী শাক্যমুনি রাজগৃহের গৃধ্রকূট পর্বতে অবস্থান করছিলেন। তথায় একদিন মহামাত্য বর্ষকার ব্রাহ্মণের জ্ঞাতার্থে তিনি মতিমান্ আনন্দকে জ্ঞানগর্ভ বাক্যে জিজ্ঞাসা করলেন—

১। "আনন্দ, বজিগণ যে, সর্বদা সম্মিলিত হয় এবং পুনঃ পুনঃ একত্রিত হয়, একথা কি তুমি শুনেছো?"

প্রত্যুত্তরে আনন্দ বললেন—"হ্যাঁ প্রভু, তা শুনেছি।"

তখন বুদ্ধ দৃঢ় কণ্ঠে বললেন—"আনন্দ, যতদিন বজিগণ সম্মিলিত হবে, পুনঃপুনঃ একত্রিত হবে, ততদিন তাদের পরিহানি ঘট্‌বে না; অধিকন্তু, তাদের শ্রীবৃদ্ধিই প্রত্যাশা করবে।

২। আনন্দ, বজিগণ যে একই সময়ে সম্মিলিত হয়ে থাকে এবং এক সঙ্গেই তাদের কর্তব্য কাজ সম্পাদন করে থাকে, একথা কি তুমি শুনেছো?"

"হ্যাঁ প্রভু, তা শুনেছি।"

"যতদিন ওরা এ নিয়ম মেনে চলবে, ততদিন ওদের পরিহানি ঘটবে না; বরঞ্চ তাদের শ্রীবৃদ্ধিই প্রত্যাশা করবে।

৩। আনন্দ, বজ্জিগণ যে তাদের পুরাতন রাজধর্ম মেনে চলে, অপ্রজ্ঞাপ্ত বিধি প্রজ্ঞাপ্ত করে না এবং প্রজ্ঞাপিত বিধির উচ্ছেদ সাধন করে না, একথা কি তুমি শুনেছো ?''

''হ্যাঁ ভন্তে, তা শুনেছি।''

''যতদিন ওরা এনিয়ম মেনে চলবে, ততদিন ওদের পরিহানি ঘটবে না; অধিকন্তু, তাদের শ্রীবৃদ্ধিই প্রত্যাশা করবে।

৪। আনন্দ, বজ্জিগণ যে তাদের বয়োবৃদ্ধগণকে যথোচিত পূজা, সৎকার ,গৌরব ও সম্মান করে এবং তাদের নীতি-বাক্য মেনে চলা উচিত মনে করে, একথা কি তুমি শুনেছো ?''

''হ্যাঁ ভন্তে, তা শুনেছি।''

''যতদিন ওরা এ নিয়ম মেনে চলবে, ততদিন ওদের পরিহানি ঘটবে না; বরঞ্চ তাদের শ্রীবৃদ্ধিই প্রত্যাশা করবে।

৫। আনন্দ, বজ্জিগণ যে তাদের কুলবধূ অথবা কুলকুমারীকে বল পূর্বক নিয়ে এসে স্বীয় গৃহে বাস করায় না (ব্যভিচারে রত হয় না), একথা কি তুমি শুনেছো ?''

''হ্যাঁ ভন্তে, তা শুনেছি।''

যতদিন ওরা এ নিয়ম মেনে চলবে, ততদিন ওদের পরিহানি ঘটবে না; অধিকন্তু, তাদের শ্রীবৃদ্ধিই প্রত্যাশা করবে।

৬। আনন্দ, বজ্জিগণ তাদের নগরাভ্যন্তরে ও বহির্নগরে বজ্জীরাজগণের যে সমস্ত চৈত্য বিদ্যমান রয়েছে, উহাদের তারা যথাযথ পূজা, সৎকার, সম্মান ও গৌরব করে থাকে এবং যে সমস্ত সম্পত্তি উক্ত চৈত্য সমূহের পূজার জন্য প্রদত্ত হয়েছে, পুনরায় তা হরণ করে না, একথা কি তুমি শুনেছো ?''

''হ্যাঁ ভন্তে, তা শুনেছি।''

''যতদিন ওরা এ নিয়ম মেনে চলবে, ততদিন ওদের পরিহানি ঘটবে না, বরঞ্চ তাদের শ্রীবৃদ্ধিই প্রত্যাশা করবে।

৭। আনন্দ, বজ্জিগণ অর্হৎদের ধর্মতঃ সুরক্ষার সুব্যবস্থা করে থাকে, যেমন—অনাগত অর্হৎগণ যা'তে দেশে আগমন করেন এবং সমাগত অর্হৎগণ

যা'তে সুখে অবস্থান করেন, একথা কি তুমি শুনেছো ?"

"হ্যাঁ ভন্তে, তা শুনেছি।"

"আনন্দ, যতদিন ওরা এ নিয়ম মেনে চলবে, ততদিন ওদের পরিহানি ঘটবে না, বরঞ্চ ওদের শ্রীবৃদ্ধিই প্রত্যাশা করবে।"

(দীর্ঘনিকায়—মহাপরিনির্বাণ সূত্র)

৩৭। অনন্যশরণ—

তখন তথাগত বেলুবগ্রামে বর্ষাযাপন করছিলেন। বর্ষাবাস আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বলবৎ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছিলেন। প্রবল মারাত্মক বেদনায় অভিভূত হয়ে পড়লেন। কিন্তু, তিনি সম্প্রযুক্ত জ্ঞানে স্মৃতিসহকারে অবস্থান করে সহ্য করতে লাগলেন রোগ-যন্ত্রণা। করলেন না কোনও প্রকার কাতরোক্তি।

এ সময়ে তিনি চিন্তা করলেন---"সেবক ভিক্ষুকে না জানিয়ে এবং ভিক্ষুসংঘকেও উপদেশ না দিয়ে, পরিনির্বাণ লাভ করা আমার পক্ষে সমীচীন হবে না। একান্তই আমাকে দৃঢ়বীর্য সহকারে এ ব্যাধি অপনয়ন করতে হবে এবং আরো কিছুদিন অবস্থান করতে হবে জীবন-সংস্কার অধিষ্ঠান করে।"

দশবল বুদ্ধ তাঁর পরিকল্পনানুরূপ বিহরণ করাতে অচিরেই এ মারাত্মক ব্যাধি উপশম হলো। একটু স্বস্তি বোধ হলে, বিহার থেকে বের হয়ে বিহার-ছায়ায় উপবেশন করলেন। এমন সময় উপস্থায়ক আনন্দ তাঁকে বন্দনা করে আনন্দোচ্ছ্বাসে বললেন---"প্রভু ভগবন্, আমার মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছে। আপনার নিরাময়তাও দেখলাম, সহনশীলতাও দেখলাম! প্রভু, আপনার রোগের সময় আমার কী যে অবস্থা হয়েছিলো, তা আর কি বলবো। তখন ভন্তে, শূলারোপিত ব্যক্তির মতো আমার শরীর হয়েছিলো অচল, চোখে দেখছিলাম কেবল অন্ধকার, আমার সম্যক্ পরিচিত চতুর্বিধ স্মৃতিপ্রস্থান এবং অন্যবিধ ধর্মও কিছুতেই স্মৃতিপথে উদিত করতে পারি

নি। সবই যেন ভুলে গিয়েছিলাম। তবুও ভন্তে, আমার এটুকু মাত্র প্রত্যাশা ছিলো---ভিক্ষুসংঘকে কোনও অন্তিম উপদেশ না দিয়ে সুগত কখনও পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হবেন না।”

তখন সম্বুদ্ধ ধর্ম-সংবেগপূর্ণ অন্তরে অথচ স্থির-গম্ভীর স্বরে বললেন-- “আনন্দ. আমার নিকট আর কি প্রত্যাশা করে ভিক্ষুসংঘ? ব্যক্তি-বিশেষের কোনও পার্থক্য নেই আমার নিকট, আচার্যের গূঢ় মুষ্টিও নেই। অন্তর্বাহির সম্পূর্ণ সুসমঞ্জস রেখেই দেশনা করেছি মুক্তিপ্রদ সত্যধর্ম। আনন্দ, তথাগতের অন্তরে কখনও এরূপ ভাবের উদয় হতে পারে না— ‘ভিক্ষুসংঘ আমিই পরিচালনা করবো, অথবা মমোদ্দেশিক হোক ভিক্ষুসংঘ।’ আনন্দ, তাদৃশ তথাগত কি ভিক্ষুসংঘকে অন্তিম সময়ে বলার মতো কিছু অবশিষ্ট রাখতে পারে?

আনন্দ, এখন আমি জীর্ণ, বৃদ্ধ ও য়ঃভারাক্রান্ত; সম্প্রাপ্ত হয়েছি পরমায়ুর অন্তিম সীমা। এখন অশীতি বৎসর বয়ঃক্রম হয়েছে সমাগত। যেমন আনন্দ, জীর্ণ-শকটের জীর্ণ-সংস্কার করে শকট চালাতে হয় সন্তর্পণে, তথাগতের শরীরের অবস্থাও হয়েছে সেরূপ। আনন্দ, রূপাদি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয় সমূহের প্রতি মনোযোগ না দিয়ে, নিরোধ করে লৌকিক বেদনা, সমাধি সম্প্রাপ্ত অবস্থাতেই এখন স্বস্তি বোধ করেন তথাগত।

আনন্দ, তোমরা হও আত্মদ্বীপ-আত্মশরণ অনন্যশরণ এবং ধর্মদ্বীপ-ধর্মশরণ অনন্যশরণ। যেমন আনন্দ, মহাসমুদ্রে ভাসমান দুঃখগ্রস্ত ও মৃত্যু-ভয়ে সন্ত্রস্ত মানুষ যদি কোনও একটা দ্বীপ সম্প্রাপ্ত হয়, তা হলে দ্বীপের আশ্রয় লাভে সে হয় পরম সুখী, সমুদ্রের দুঃখ ও মৃত্যুভয় হতেও সে হয় প্রমুক্ত। তাদৃশ হে আনন্দ, তোমরাও নিজকে নিজের দ্বীপ স্বরূপ বরণ ক'রে উত্তীর্ণ হও ভব-সমুদ্র। একমাত্র নিজেই নিজের আশ্রয়, স্বীয় কর্ম-শুদ্ধিই নিজকে করবে মুক্তি দান। অন্য কারো উপর প্রত্যাশা রেখো না, অন্য কারো নেই সে ক্ষমতা। সুতরাং আনন্দ, সেরূপই তোমরা ধর্ম-দ্বীপ ধর্ম-শরণ অনন্যশরণ হও।

আনন্দ, কিরূপে হয় ভিক্ষু আত্মদ্বীপ-আত্মশরণ অনন্যশরণ এবং ধর্মদ্বীপ-

ধর্মশরণ অনন্যশরণ? দৃঢ়বীর্য ও সম্প্রযুক্ত জ্ঞান সপন্ন স্মৃতিমান্ ভিক্ষু---কায়ে কায়ানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী, বেদনায় বেদনানুদর্শী ও ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে, এ চতুর্বিধ 'স্মৃতিপ্রস্থান' ভাবনায় হয় অভিনিবিষ্ট এবং তৎপ্রতি লোভ ও দৌর্মনস্য ত্যাগ করে হয় আত্মদ্বীপ-আত্মশরণ অনন্যশরণ ও ধর্মদ্বীপ-ধর্মশরণ অনন্যশরণ।

আনন্দ, যে ভিক্ষু আমার বিদ্যমানে অথবা অবিদ্যমানে আত্মদ্বীপ-আত্মশরণ অনন্যশরণ এবং ধর্মদ্বীপ-ধর্মশরণ অনন্যশরণ হয়ে বিহরণ করে, সে ভিক্ষু কাম, ভব, দৃষ্টি ও অবিদ্যা এ চতুর্বিধ যোগ-সূত্র ছিন্ন ক'রে শিক্ষাকামীদের মধ্যে হবে অগ্রতম ও শ্রেষ্ঠতম।" সম্বুদ্ধের এ সারগর্ভবাণী মতিমান আনন্দ সানন্দে অনুমোদন ও অভিনন্দন করলেন।

(মহাপরিনির্বাণ সূত্র)

৩৮। দুষ্কৃতাপরাধ—

শাস্তা তখন বৈশালীতে অবস্থান করছিলেন। সে দিন ছিলো মাঘী পূর্ণিমা। সুগত মধ্যাহ্ন আহারের পর সেবক আনন্দকে আদেশ করলেন---"আনন্দ, বসবার আসন নাও, দিবা-বিশ্রামের জন্য চাপাল চৈত্যে যাবো।" তখন আনন্দ আসন হস্তে ধর্মস্বামীর পশ্চাদনুসরণ করলেন।

চাপাল চৈত্যে উপনীত হলেন জিনরাজ। উপস্থায়ক আসন পেতে দিলেন সগৌরবে। বুদ্ধসুলভ সুসংযত হয়ে প্রজ্ঞাপিত আসনে সমাসীন হলেন মুনিপুঙ্গব। তাঁকে বন্দনা করে স্থবির একান্তে উপবেশন করলে, বুদ্ধ ভাবাবেশে বললেন—"আনন্দ, বৈশালী রমণীয়া, উদেন চৈত্য রমণীয়, গৌতমক চৈত্য, সত্তম্ব চৈত্য, বহুপুত্র চৈত্য, আনন্দ চৈত্য ও চাপাল চৈত্য রমণীয়।

আনন্দ, যে কারো ভাবিত হয়েছে চার ঋদ্ধিপাদ, পুনঃ পুনঃ হয়েছে বর্ধিত, রথচক্র সম হয়েছে অনর্গল অভ্যস্ত, বাস্তুভূমি সদৃশ হয়েছে সুপ্রতিষ্ঠিত, পরিচিত, অনুষ্ঠিত ও দীর্ঘদিন নিষ্পাদিত, তিনি ইচ্ছা করলে 'আয়ুকল্প'

কাল * বা ততোধিক কাল অবস্থান করতে পারেন।

আনন্দ, তথাগত বুদ্ধের চার ঋদ্ধিপাদ ভাবিত, বহুলীকৃত, দীর্ঘদিন অনুশীলিত ও সম্যকরূপে সম্পাদিত হয়েছে। সুতরাং আনন্দ, তথাগত ইচ্ছা করলে, 'আয়ুকল্প' কাল অথবা এর চেয়েও কিছু অধিক কাল অবস্থান করতে পারেন ।

উপস্থায়ক আনন্দ বুদ্ধের এ স্পষ্টোক্তির প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারলেন না। কারণ, বশবর্তী দেবরাজ কর্তৃক তিনি অভিভূত হয়েছিলেন। বুদ্ধের কথার মর্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করবার মতো অবস্থা তখন আনন্দের ছিলো না। তাই তিনি, আয়ুকল্প' কাল অবস্থানের জন্য বুদ্ধকে প্রার্থনা করেন নি।

তথাগত পুনরায় একথার দ্বিরুক্তি ও ত্রি-উক্তি করলেন। কিন্তু, তবুও স্থবির উপলব্ধি করতে পারলেন না এর মর্মার্থ। তিনি প্রার্থনা করলেন না যে---"ভগবন্, জগতের কল্যাণার্থে আপনি কল্পকাল অবস্থান করুন"

অতঃপর ভগবান আনন্দকে গাঢ়স্বরে আদেশ করলেন---"আনন্দ, তুমি অন্যত্র গমন করো।"

শাস্তার আদেশ আনন্দ শিরোধার্য করে তাঁকে বন্দনান্তে অনতিদূরে এক বৃক্ষ মূলে গিয়ে উপবেশন করলেন। স্থবির সে স্থান ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই পাপমতি মাররাজ মারজিতের সম্মুখে আবির্ভূত হয়ে অনুযোগের সুরে বললেন ---"ভগবন্, আপনার পরিনির্বাণ প্রাপ্তির এ'ই উপযুক্ত সময়। এবার আপনি পরিনির্বাপিত হোন। আপনি বলেছিলেন---'যতদিন আমার শ্রাবক-শ্রাবিকা, ভিক্ষু-ভিক্ষুণী ও উপাসক-উপাসিকা সুগঠিত না হবে; যতদিন ওরা আর্যমার্গ ও ফলের অধিকারী, নিপুণ, বিশারদ, বহুশ্রুত ও ধর্মানুধর্ম পালনকারী না হবে; যতদিন ওরা ধর্ম-বিনয়ে সুশিক্ষিত না হবে; নৈর্বাণিক গম্ভীর-ধর্মের সূক্ষ্ম তত্ত্বের মর্মোদ্‌ঘাটন ও বিভাজন করে সুন্দর, সরল ও হৃদয়গ্রাহী বাক্যে ব্যাখ্যা করতে না পারবে এবং ধর্মতঃ প্রতিবাদে

* যে কালের মানুষের যে পরিমাণ আয়ু প্রবর্তিত হয়, তা 'আয়ুকল্প' নামে অভিহিত হয়। গৌতম বুদ্ধের সময়ে মানবের পরমায়ু ছিল ১২০ বৎসর। এটিই তখনকার সময়ের আয়ুকল্প।

পরবাদ খণ্ডন, কুমতির উচ্ছেদ সাধন করতে সক্ষম না হবে, ততদিন আমি পরিনির্বাপিত হবো না।'

ভগবন্, আপনি এ কথাও প্রকাশ করেছিলেন---'যতদিন আমার শাসন-ব্রহ্মচর্য সমৃদ্ধ, স্ফীত, বিস্তৃত, বহুজন জ্ঞাত, বিপুলতা প্রাপ্ত হয়ে দেব-নরের নিকট সুপ্রকাশিত না হবে, ততদিন আমি পরিনির্বাপিত হবো না।'

ভগবন্, আপনার মনোবাসনা এখন সর্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। এখন আপনার পরিনির্বাণ লাভের উপযুক্ত সময়, আপনি পরিনির্বাপিত হোন।''

পাপমতি মাররাজের এরূপ উক্তি শুনে সুগত গম্ভীর স্বরে বললেন---''হে হীনমতি মার, এখন তুমি নিশ্চিন্ত হও, অচিরেই আমি মহাপরিনির্বাণ লাভ করবো, আজ থেকে তিনমাস পরে তথাগত পরিনির্বাপিত হবেন।''

দুই

শাক্যমুনি বুদ্ধ সেক্ষণেই চাপাল চৈত্যে স্মৃতি ও সজ্ঞানে বিসর্জন করলেন 'আয়ু-সংস্কার'। তাঁর আয়ুসংস্কার বিসর্জনের সঙ্গে সঙ্গেই অতি ভীষণ লোমহর্ষকর মহাভূমিকম্প সঞ্জাত হলো। ভয়ঙ্কর মেঘগর্জনের সঙ্গে প্রকাশিত হলো বিদ্যুল্লতা, ক্ষণিক বৃষ্টিও হলো বর্ষণ।

এতে তখন বিস্ময়ে স্তম্ভিত হলেন আনন্দ। অতি ব্যাকুলান্তরে তিনি চিন্তা করলেন---''এ কেমন অত্যাশ্চর্য মহাভূমিকম্প, কী ভীষণ লোমহর্ষকর মহান্ ভূমিকম্প, একক্ষণেই যুগপৎ সংঘটিত হলো কেমন ভীতিপ্রদ মেঘগর্জন, অশনি নির্ঘোষ, বিদ্যুৎ স্ফুরণ হলো কী তীব্রতর, যেন আমার মর্মস্থল বিদ্ধ করলো! কেন? এরূপ মহাভূমিকম্পের কারণ কি?''

তখনই আনন্দ সুগত সমীপে উপনীত হয়ে বন্দনান্তে ব্যগ্রকণ্ঠে বললেন ---''আশ্চর্য, আশ্চর্য প্রভু! কী ভীষণ রোমাঞ্চকর ভূমিকম্প; মেঘগর্জন, অশনি-নির্ঘোষ, বিদ্যুৎ স্ফুরণ ও ক্ষণিক বৃষ্টি বর্ষণ একক্ষণেই যুগপৎ সংঘটিত হলো! প্রভু! এরূপ ভূমিকম্পের কারণ কি?''

প্রত্যুত্তরে সয়ম্ভূ গম্ভীর স্বরে বললেন---"শোনো আনন্দ, আটটি কারণে ভূমিকম্প হয়; যথা----

প্রথম কারণ---এ মহাপৃথিবী জলোপরি প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, এজল বায়ুতে প্রতিষ্ঠিত। যখন মহাবায়ু প্রবাহিত হয়, তখন পৃথিবী-সন্ধারক জল কম্পিত হয়। জল কম্পিত হলে পৃথিবী কম্পিত হয়।

দ্বিতীয় কারণ---যে কোনো চিত্তজয়ী ঋদ্ধিমান্, শ্রমণ-ব্রাহ্মণ অথবা মহাঋদ্ধি-মহানুভাব সম্পন্ন দেবতার যদি পৃথিবী-সংজ্ঞা সামান্য পরিমাণ, অপ্(জল) সংজ্ঞা অপ্রমাণ সুভাবিত হয়, তা হলে তিনি ইচ্ছা করলে, এ মহা পৃথিবী কম্পিত প্রকম্পিত করতে পারেন।

তৃতীয় কারণ---যে মুহূর্তে বোধিসত্ত্ব তুষিত-কায় চ্যুত হয়ে স্মৃতি-সম্প্রযুক্ত জ্ঞানে মাতৃগর্ভে অন্তিম জন্ম গ্রহণ করেন, সে মুহূর্তে পৃথিবী কম্পিত হয়।

চতুর্থ কারণ---যে শুভক্ষণে অন্তিম জন্মধারী বোধিসত্ত্ব মাতৃগর্ভ থেকে নিষ্ক্রান্ত হন, সেক্ষণে পৃথিবী কম্পিত হয়।

পঞ্চম কারণ---যে মুহূর্তে তথাগত অনুত্তর সম্যক্ সম্বুদ্ধত্ব জ্ঞান লাভ করেন, সে মুহূর্তে পৃথিবী কম্পিত হয়।

ষষ্ঠ কারণ---যে শুভক্ষণে তথাগত অনুত্তর ধর্মচক্র প্রবর্তন করেন, সেক্ষণে পৃথিবী কম্পিত হয়।

সপ্তম কারণ---যখন তথাগত স্মৃতিসম্প্রযুক্ত জ্ঞানে আয়ুসংস্কার বিসর্জন করেন, তখন পৃথিবী কম্পিত হয়।

অষ্টম কারণ---যখন তথাগত অনুপাদিশেষ নির্বাণ ধাতুতে পরিনির্বাপিত হন, তখন এ মহাপৃথিবী কম্পিত হয়।"

তিন

সুগত-বাক্য শ্রবণে চিন্তাশীল আনন্দের অন্তরে সন্দেহের সঞ্চার হলো। চিন্তা করলেন তিনি সন্দিগ্ধমনে---"ভগবান আজ আয়ুসংস্কার বিসর্জন করলেন না কি?" শাস্তা কিন্তু, তাঁকে সে চিন্তা করার অবকাশ না দিয়ে,

আদেশ-সূচক বাক্যে বললেন---"আনন্দ, ধর্ম ভাষণ করবো, তৎপ্রতি মন সংযোগ করো, পারিষদ আট প্রকার, যথা---ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, গৃহপতি, শ্রমণ, চতুর্মহারাজিক, তাবতিংস ,মার ও ব্রহ্মপারিষদ।

আনন্দ, ইতিপূর্বে আমি অন্য চক্রবালে বহুবার গিয়েছি। তথায় ক্ষত্রিয় সমাগমে উপনীত হলে, তথাকার শ্রেষ্ঠ আসনে সমাসীন হয়ে ধর্মমূলক আলাপেই প্রবৃত্ত হয়েছি। যেরূপ তাদের বর্ণ, আমারও সেরূপ বর্ণ; যেরূপ তাদের কণ্ঠস্বর, আমারও সেরূপ কণ্ঠস্বর। তাদের ধর্মোপদেশ পরিবেষণ করেছি, মুক্তির পথ দেখিয়েছি, ধর্মগ্রহণ করিয়েছি, ধর্ম শুনে তারা আনন্দিত ও উৎসাহিত হয়েছে। অথচ, 'আমি কে' তা ওরা কখনও জানতে পারে নি। ওরা কেবল বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে আমার দিকে চেয়েই থাকতো। চিন্তা করতো---"আশ্চর্য পুরুষ ইনি কে? দেবতা, না মানব?" আমার অন্তর্ধানের পরও ওদের মধ্যে এরূপ আলোচনা হতো---"কে ইনি মধুর স্বরে বলে গেলেন অপূর্ব কথা? ইনি কি দেবতা, না মানব?" ব্রাহ্মণাদি অন্যান্য পারিষদ সম্বন্ধেও এরূপ জ্ঞাতব্য।"

চার

এর পরও আনন্দকে অবকাশ না দেবার ইচ্ছায় তথাগত বুদ্ধ বলে যেতে লাগলেন গম্ভীর ধর্মকথা, যা আট প্রকার অভিভবনীয় বিষয় ও আট প্রকার বিমোক্ষের বিষয়। বুঝিয়ে দিলেন এ জটিলতত্ত্ব, প্রাঞ্জল হৃদয়গ্রাহী ভাষায়।

* * * * *

এর পরও আনন্দকে কিছু বলার অবকাশ না দিয়ে বুদ্ধ পুনরায় বলতে আরম্ভ করলেন---"আনন্দ, আমি সম্বোধি লাভের পর পঞ্চম সপ্তাহে উরুবেলায় নৈরঞ্জনা নদীতীরে অজপাল ন্যগ্রোধ-তরুমূলে যখন অবস্থান করছিলাম, তখন পাপমতি মার আমার নিকট উপস্থিত হয়ে বলেছিলো---'ভগবন্, আপনার সাধনা সিদ্ধ হয়েছে, বাসনা হয়েছে চরিতার্থ, সর্বতোভাবে লব্ধ হয়েছে আপনার ইচ্ছিত বিষয়। এখন আপনার পরিনির্বাণ লাভের উপযুক্ত সময়। হে সুগত, এখন আপনি পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হোন।"

আনন্দ, কুমতি-মারের এরূপ উক্তি শ্রবণে আমি বলেছিলাম---'হে পাপ-মতি মার, যতদিন আমার শ্রাবক-শ্রাবিকা, ভিক্ষু-ভিক্ষুণী ও উপাসক-উপাসিকা সম্যক্‌রূপে গঠিত না হবে, আর্যমার্গ ও ফলের অধিকারী, নিপুণ, বিনীত, বিশারদ ও বহুশ্রুত হয়ে ধর্মতঃ প্রতিবাদে পরবাদ খণ্ডন ও কুমতির উচ্ছেদ সাধন করতে সক্ষম না হবে, ততদিন আমি পরিনির্বাপিত হবো না।

হে মন্দমতি মার, যতদিন আমার প্রবেদিত ব্রহ্মচর্য সমৃদ্ধ, স্ফীত, বিস্তৃত ,বহুজন জ্ঞাত, বিপুলতা প্রাপ্ত ও দেব-নরের নিকট সুপ্রকাশিত না হবে, ততদিন আমি পরিনির্বাপিত হবো না।'

আনন্দ, পুনরায় আজ এমাত্র চাপাল চৈত্য দুষ্টমার আমার নিকট এসে পূর্বের মতো আমাকে পরিনির্বাণ লাভের জন্য অনুযোগ ও অনুরোধ করতে লাগলো। আনন্দ, তদুত্তরে তাকে বললাম---'নিশ্চিন্ত হও তুমি মন্দমতি, অচিরেই তথাগত পরিনির্বাপিত হবেন; আজ থেকে তিন মাস অন্তে তথাগত মহাপরিনির্বাণে নির্বাপিত হবেন।'

আনন্দ, আজ এই মাত্র তথাগত সজ্ঞানে ও স্মৃতি সহকারে আয়ুসংস্কার বিসর্জন করেছেন।''

আনন্দের অন্তরের নিধি, জীবনাধিক শাক্যমুনির, এবম্বিধ উক্তি শ্রবণে মর্মান্তিক দুঃখে ও শোকে অভিভূত হয়ে পড়লেন তিনি। বাষ্পরুদ্ধ কাতর কণ্ঠে তিনি প্রার্থনা করলেন---''ভগবন্, জগতের কল্যাণার্থ আপনি দয়া করে কল্পকাল অবস্থান করুন। প্রভু, দেব-নরের হিতসুখার্থ কল্পকাল অবস্থান করুন।''

বুদ্ধ গম্ভীর স্বরে বললেন---''ক্ষান্ত হও আনন্দ, তথাগতের নিকট অনর্থক আর এরূপ প্রার্থনা করো না। এরূপ প্রার্থনার সময় অতীত হয়ে গেছে।''

আনন্দ অশ্রু-গদ্‌গদ কণ্ঠে দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার প্রার্থনা করলেন। কিন্তু, প্রতিবারে বুদ্ধ একই প্রকার উক্তিতে আনন্দের প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করলেন। তিনি একনিষ্ঠ সেবকের প্রার্থনাতিশয্যে এও বলতে বাধ্য হলেন যে---''আনন্দ, তথাগতের সম্বুদ্ধত্বে তেমার শ্রদ্ধা আছে কি?''

আনন্দ দৃঢ় কণ্ঠে বললেন---"হ্যাঁ প্রভু, নিশ্চয়ই শ্রদ্ধা আছে।"

"তবে কেন তুমি, বারত্রয় এরূপ প্রার্থনায় তথাগতকে নিপীড়ন করছো ?"

"প্রভু, সুগতোক্ত অমোঘবাণী, যা আমার স্বকর্ণে শুনেছি, তা'ই আমার অন্তরে গাঢ়তররূপে ধারণ করেছি। প্রভু, আপনি বলেছেন---'আনন্দ, যে কারো 'চার ঋদ্ধিপাদ' ভাবিত হয়েছে,-তিনি ইচ্ছা করলে, 'আয়ুকল্প' কাল অথবা ততোধিক কাল বেঁচে থাকতে পারেন।"

"আনন্দ, যা বল্‌লে, তা কি তুমি বিশ্বাস করো ?"

"হ্যাঁ ভন্তে, নিশ্চয়ই বিশ্বাস করি।"

"তা হলে আনন্দ, এটা তোমারই দুষ্কৃতি হয়েছে, তোমারই অপরাধ। যেহেতু, তুমি হৃদয়ঙ্গম করতে পারো নি তথাগতের এমন স্পষ্টোক্তি, সুস্পষ্ট আভাস। প্রার্থনা করলে না তথাগতকে।

আনন্দ, ইতিপূর্বেও গৃধ্রকূট পর্বত, উদেন চৈত্য ও সারন্দদ চৈত্যাদি বহু স্থানে আমি তোমায় পুনঃ পুনঃ বলেছি এরূপ একই কথা। আজ এ চাপাল চৈত্যেও করেছি একইরূপ উক্তি। কিন্তু আনন্দ, তুমি তো কোনও সময়ে, কোথাও আমায় এরূপ প্রার্থনা করোনি। তথাগত তোমার প্রার্থনা দু'বার উপেক্ষা করলেও, তৃতীয়বারে নিশ্চয়ই সম্মত হতেন। তাই বলছি আনন্দ, এটা তোমারই দুষ্কৃতি হয়েছে, তোমারই অপরাধ।

আনন্দ, তোমায় পূর্বেও কি বলিনি---"সমস্ত মনোজ্ঞ ও প্রিয়জন থেকে নিশ্চয়ই বিচ্ছিন্ন হতে হবে ? এ ক্ষেত্রে এর অন্যথাভাব কিরূপেই বা হতে পারে ? পঞ্চ স্কন্ধ বিপরিনামী (অনিত্য), সুতরাং 'তা বিনষ্ট না হোক' এরূপ কারণ এখানে বিদ্যমান থাকতে পারে না।

আনন্দ, বমন করার মতো তথাগত 'আয়ুসংস্কার' পরিত্যাগ করেছেন। অচিরেই তথাগতের পরিনির্বাণ হবে। আজ থেকে তিন মাস পরে তথাগত পরিনির্বাপিত হবেন; এটা সুনিশ্চিত ও অদ্বিতীয় বাক্যই ভাষিত হয়েছে। তথাগতের মুখ-নিঃসৃত এই একান্ত স্থির-বাক্য কিছুতেই প্রত্যাহার করা সম্ভব নয়; এমন কি, জীবন হেতুও নয়। এসো আনন্দ, মহাবন কূটাগার শালায় গমন করি।"

কূটাগার শালায় উপনীত হয়ে বুদ্ধ আদেশ করলেন—"আনন্দ, তুমি গিয়ে বৈশালীর ভিক্ষুগণকে বলে এসো যে, সকলেই যেন অচিরে সভামণ্ডপে সমবেত হয়।"

বিনীত-সেবক আনন্দ তখনই সুগতের আদেশ প্রতিপালন করলেন। ভিক্ষুগণ যথাসত্বর সভাগৃহে সমবেত হলে, বুদ্ধ যথাসময়ে সম্মিলিত মহা-পারিষদে উপস্থিত হলেন। তিনি নির্দিষ্ট আসনে সমাসীন হয়ে সমবেত ভিক্ষুগণকে তাঁর প্রচারিত শাসন-ব্রহ্মচর্যের চিরস্থায়িত্ব মূলক সপ্তত্রিংশৎ বোধিপক্ষীয় ধর্মসাধনার অমৃতময়ী অমূল্য-নীতি দেশনা করলেন। অতঃপর তথাগত মর্মস্পর্শী ভাষায় 'আয়ুসংস্কার' বিসর্জনের বার্তা ঘোষণা করলেন—

"পরিপক্কো বযো মযহং—পরিত্তং মম জীবিতং,
পহায বো গমিস্সামি—কতম্মে সরণ মত্তনো'তি।"

'আমার বয়স পূর্ণ হয়েছে, আমার জীবনের আর অল্প দিন মাত্র অবশিষ্ট আছে, তোমাদের ত্যাগ করেই চলে যাবো, আমার আশ্রয় আমি করে নিয়েছি।' এটিই বুদ্ধের অন্তিম বিদায়ের পূর্বাভাস।

মহাপরিনির্বাণ সূত্র)

৩৯। পানীয়-জলাহরণ—

চক্ষুষ্মান্ তথাগত চিরতরে বৈশালী ত্যাগ কালে গজ-দৃষ্টিতে বৈশালীর প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন। তখন তিনি আনন্দকে সম্বোধন করে বললেন—"আনন্দ, বৈশালীর প্রতি এ দৃষ্টিপাতই তথাগতের শেষ দৃষ্টিপাত।"

বিনায়ক বুদ্ধ উপস্থায়ক আনন্দ প্রমুখ মহাভিক্ষু পারিষদ সমভিব্যাহারে অনুক্রমে পাবা প্রদেশে কর্মকারপুত্র চুন্দের আম্রকাননে উপনীত হলেন। পরদিবস সশিষ্য তিনি চুন্দের গৃহে আহার করলেন। এ আহারই বুদ্ধের অন্তিম আহার। আহার গ্রহণের পরক্ষণেই শাক্যমুনি বিষম-রোগ রক্তামাশয়ে আক্রান্ত হলেন। মরণান্তিক যন্ত্রণার মতো দুঃসহ তীব্র বেদনা উৎপন্ন হলো। দশবল বুদ্ধের অসাধারণ সহন-শীলতার গুণে এবং স্মৃতি সম্প্রযুক্ত জ্ঞানে গুরুতর ব্যাধির তীব্র-বেদনা সহ্য করলেন। রোগাক্রান্ত হলেও, তাঁর অন্তিম-নিশ্বাস ত্যাগের একমাত্র অপরিহার্য স্থান

কুশীনগরে যাবার সংকল্প ক'রে সেবক ভিক্ষুকে বললেন---"এসো আনন্দ, কুশীনারায় গমন করি।"

আনন্দ বিনীত বাক্যে সম্মতি জ্ঞাপন করে ভিক্ষু-পারিষদ সহ তথাগতের অনুসরণ করলেন। কিয়দ্দূর গমনের পর সুগত খুব শ্রান্ত হয়ে পড়লেন। গমন-পথ ত্যাগ করে তিনি এক সান্দ্র-ছায়াময় বৃক্ষমূলে উপনীত হলেন। সেবককে আদেশ করলেন---"আনন্দ, সংঘাটি (দ্বিপট্ট চীবর) চতুর্ভণ করে বিছাও। বড়ো ক্লান্ত হয়েছি, বস্‌বো।"

আনন্দ আসন পেতে দিলেন। শ্রান্ত বুদ্ধ উপবেশন করে শ্রান্ত কণ্ঠে আদেশ করলেন---"আনন্দ, আমার জন্য পানীয়জল আহরণ করো। খুব পিপাসিত হয়েছি, জলপান করবো।"

উপস্থায়ক বিনীত-বাক্যে নিবেদন জানালেন---প্রভু, এ'মাত্র পাঁচশত গো-শকট নদী অতিক্রম করে গিয়েছে। নদীতে স্বল্প পরিমাণ জল। চক্রছিন্ন হয়ে জল আলোড়িত ও কর্দমাক্ত হয়েছে। সম্মুখে অদূরে রয়েছে সুতীর্থা রমণীয়া শীতল-মধুর স্বচ্ছ-সলিলা ককুত্থা নদী। প্রভু, সেখানে জলপান করবেন এবং স্নান করে শরীর শীতল করবেন"।

বুদ্ধ দ্বিতীয়বার ও তৃতীয়বার আদেশ করলেন। আনন্দ 'তথাস্তু ভন্তে, বলে পাত্র হস্তে নদী-তীরে উপস্থিত হলেন। দেখে তিনি আশ্চর্য হলেন যে—প্রবাহমান নদীজল স্বচ্ছ, অনাবিল ও সুপ্রসন্ন! বিস্ময়াবিষ্ট অন্তরে তিনি চিন্তা করলেন---"কি আশ্চর্য, এ-কি অদ্ভুত ব্যাপার, এটা নিশ্চয়ই মহিমার্ণব বুদ্ধের অসাধারণ শক্তি!

আনন্দ পাত্রপূর্ণ জল নিয়ে সুগত-সমীপে উপস্থিত হয়ে এ অপূর্ব বার্তা তাঁকে জানালেন। অভিজ্ঞান-মণ্ডিত বুদ্ধ নীরবে শুনলেন সেবকের কথা এবং পান করলেন তৃপ্তমনে শীতল-মধুর স্বচ্ছবারি। জল পানের পর শাস্তা অনেকটা স্বস্তি বোধ করলেন।

(মহাপরিনির্বাণ সূত্র)

৪০। বুদ্ধের অন্তিম জ্যোতিঃ দর্শনে—

সে সময়ে উক্ত নদীতীরে মল্লরাজপুত্র পুক্কুস উপস্থিত হয়ে বুদ্ধের

দর্শন লাভে প্রসন্ন হলেন। বুদ্ধ তাঁকে ধর্মদেশনা করলেন। ধর্ম শুনে রাজকুমার আশ্চর্য ও বিমুগ্ধ হয়ে ত্রিরত্নের শরণাপন্ন হলেন। তিনি শ্রদ্ধাতিশয্যে অতি মহার্ঘ সমুজ্জ্বল স্বর্ণবর্ণ দু'খানা সুকোমল বস্ত্র তথাগতকে দান করতে ইচ্ছা করলেন।

বুদ্ধ তাঁকে বললেন---"পুক্কুস, তুমি বস্ত্রদানের ইচ্ছা করলে, একখানা বস্ত্র আমাকে দাও, অপর খানা আনন্দকে দাও।"

রাজপুত্র সন্তুষ্ট হয়ে শাস্তাকে একখানা এবং আর একখানা বস্ত্র আনন্দকে দান করলেন। সুগত সংক্ষেপে বস্ত্র দানের ফল বর্ণনা করলেন। কুমার ধর্মশুনে প্রীতিফুল্লমনে বুদ্ধকে বন্দনা ও প্রদক্ষিণ করে চলে গেলেন। অতঃপর মতিমান্ আনন্দ দু'খানা বস্ত্রই সুগতের শরীরে সুন্দররূপে পরিবেষ্টন করে দিলেন। জ্যোতিষ্মান্ অমিতাভের দেহ-প্রভার নিকট বস্ত্রের উজ্জ্বলতা যেন নিষ্প্রভ হয়ে গেলো। তখন আনন্দ মুগ্ধ-বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে বললেন---"ভগবন্, আশ্চর্য, অতি আশ্চর্য-বিষয়, তথাগতের দেহ-বর্ণ এতো বিশুদ্ধ ও এতো উজ্জ্বল যে, আপনার শরীর সম্প্রাপ্ত হয়ে এমন সোনার-বরণ সমুজ্জ্বল বস্ত্রও নিষ্প্রভ হয়ে গেলো! প্রভু, বড়ো মনোরম, বড়ো স্নিগ্ধোজ্জ্বল, চোখ জুড়ানো প্রভাস্বরবর্ণ ভগবানের দেহজ্যোতিঃ!"

তখন জগজ্জ্যোতিঃ বুদ্ধ গাঢ় স্বরে বললেন---"যথার্থই বলেছো আনন্দ, এরূপই বটে। দু'টি সময়ে তথাগতের শরীর-বর্ণ অতি পরিশুদ্ধ এবং অতি উজ্জ্বল হয়। যে রাত্রে তথাগত সম্প্রাপ্ত হন অনুত্তর সম্যক্ সম্বোধি, আর যে-রাত্রে সম্প্রাপ্ত হন অনুপাদিশেষ মহাপরিনির্বাণ, এদু'টি সময়েই তথাগতের দেহ হয় অতীব পরিশুদ্ধ, জ্যোতিঃ হয় অতীব উজ্জ্বল। আনন্দ, অদ্য রজনীর জ্যোৎস্না ধবলিত বৈশাখী পূর্ণিমার অন্তিম প্রহরে কুশীনারায় মল্লরাজদের শালবনে যমক শালতরুর মধ্যস্থলে তথাগত ত্যাগ করবেন অন্তিম নিশ্বাস, মহাপরিনির্বাণে নির্বাপিত হবেন তথাগত। এসো আনন্দ, ককুত্থা নদীতে গমন করি।"

'তথাস্তু প্রভু', বলে আনন্দ বিনম্র বাক্যে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন।

(মহাপরিনির্বাণ সূত্র)

৪১। চুন্দ ও সুজাতার দান-মহিমা—

মহামানব বুদ্ধ সশিষ্য ককুত্থা নদীর তীরে উপনীত হলেন। তিনি ধীরে ধীরে নদীর গহনজলে অবতরণ করলেন। জ্যোতিষ্মানের দেহ-জ্যোতিঃতে নদীর জল জ্যোতির্ময় হয়ে গেলো। স্বচ্ছ-শীতল সলিলে অবগাহন করলেন পুণ্যপুরুষ, অন্তিম অবগাহন। তারপর করলেন জলপান। নদী উত্তীর্ণ হয়ে তিনি তত্রত্য আম্র-কাননে উপনীত হলেন। সেখানে সজ্জিত বস্ত্রাসনে নরসিংহ দক্ষিণ-পার্শ্ব হয়ে সিংহ-শয্যায় শয়ন করলেন।

তখন তিনি আনন্দকে বললেন---"আনন্দ, যদি কেহ চুন্দকে এরূপ কথা বলে---'হে চুন্দ, তোমার বড়োই দুর্ভাগ্য, বড়োই অলাভ; যেহেতু, তথাগত পরিশেষে তোমার প্রদত্ত আহার্য-বস্তু আহার করেই ব্যাধিগ্রস্ত হয়েছেন এবং এতেই তিনি দেহ-ত্যাগ করেছেন। এ তোমার একান্তই পরিহানি ও অকল্যাণকর।"

আনন্দ, তজ্জনিত চুন্দের উৎপন্ন অনুতাপ ও অনুশোচনা তুমি এরূপ প্রশংসা বাক্যে অপনোদন করবে---'উপাসক চুন্দ, তোমার পরম লাভ ও পরম সৌভাগ্যের বিষয়, যেহেতু তোমারই সর্বশেষ প্রদত্ত আহার্য পরিভোগ করে তথাগত পরিনির্বাপিত হয়েছেন। উপাসক চুন্দ, ভগবানের মুখেই শুনেছি---দু'টি আহার্য-দানই সমফল ও সমবিপাক-দায়ক। অন্য সমস্ত আহার্যবস্তু-দান থেকে অধিকতর ফল-দায়ক, বিপাক-দায়ক এবং মহাপুণ্য-প্রসূ। সে দু'টি দান হলো---যে অন্ন ভোজন ক'রে তথাগত সম্প্রাপ্ত হয়ে থাকেন---"অনুত্তর সম্যক্ সম্বুদ্ধত্ব জ্ঞান' *, আর যে অন্ন ভোজন ক'রে তথাগত---'অনুপাদিশেষ মহাপরিনির্বাণে নির্বাপিত হন'। চুন্দের আয়ু, বর্ণ, সুখ, বল, যশঃ,স্বর্গ ও আধিপত্য-দায়ক বিপুল-পুণ্য সঞ্চিত হয়েছে। আনন্দ, এরূপ মহিমা-ব্যঞ্জক কথা বলে চুন্দের অনুতাপ অপনোদন করবে।"

(মহাপরিনির্বাণ সূত্র)

* সুজাতার পরমান্ন খেয়ে গৌতম সম্বুদ্ধত্ব জ্ঞান লাভ করেছিলেন।

৪২। পরমপূজা—

অতঃপর লোকনাথ বুদ্ধ আনন্দকে বললেন---"এসো আনন্দ, হিরণ্যবতী নদীর পরতীরে কুশীনারায় মল্লরাজগণের শালবনে গমন করি।" উপস্থায়ক বিনীত বাক্যে সম্মতি জানালেন। মুনীন্দ্র ভিক্ষুমহাপারিষদ সমভিব্যাহারে যথাসময় সেই শালোদ্যানে উপনীত হলেন। তিনি শ্রান্ত স্বরে বললেন---"আনন্দ, বড়ো ক্লান্ত হয়েছি, শয়ন করবো। যমক শালতরুর মধ্যবর্তী স্থানে আমার জন্য উত্তর শিয়র করে মঞ্চ স্থাপন করো।"

কেঁপে উঠলো তখন একনিষ্ঠ সেবক আনন্দের অন্তর। দরবিগলিত ধারায় প্রবাহিত হলো অশ্রুবারি। তাঁর হৃদয়-আলো, সাধন-নিধি, প্রাণাধিক-প্রাণ শাক্যমুনির অন্তিম-শয্যা তাঁকেই রচনা করতে হবে। ধীমান্ নীরব-রোদনে কম্পিত-হস্তে প্রাণারাম আরাধ্যের আদেশ উত্তমরূপে প্রতিপালন করলেন। নরসিংহ স্মৃতি-সম্প্রযুক্ত জ্ঞানে মঞ্চোপরি দক্ষিণ-পার্শ্ব হয়ে দক্ষিণ-পায়ের উপর বামপদ স্থাপন করে সিংহ-শয্যায় শয়ন করলেন। এ শয়নই শাক্যসিংহের অন্তিম শয়ন।

জগজ্জ্যোতিঃ অমিতাভের পূত-দেহের অনুপম আলোক-ধারা প্রবাহিত হয়ে প্লাবিত করলো সমগ্র শালোদ্যান। বিজলি-চমক্‌সম ঝিক্-মিক্ করে বিচ্ছুরিত হতে লাগলো ষড়-রশ্মির সমুজ্জ্বল স্নিগ্ধ-সুন্দর আলোকচ্ছটা। মুঞ্জরিত নব-কিশলয় পরিশোভিত শালতরুরাজি ফুল্ল-বিকশিত কুসুম-সম্ভার সমলঙ্কৃত হয়ে বিচিত্র মোহনবেশে গৌরব-রবি জিনরাজকে যেন গৌরব-মণ্ডিত সম্বর্ধনা করতে লাগলো। শালপুষ্পরাশি বারি-বর্ষণ সম অবিরল ঝরে পড়তে লাগলো সুগত-শরীরে। পাদপরাজি আপন অঙ্গ-ভূষণ সাধের পুষ্পালঙ্কারে পূজার্হ মহামানবকে যেন আকুলান্তরে নিবেদন করছে প্রাণ-ঢালা পূজোপচার।

জ্ঞাননিধি তথাগত স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন আনন্দকে---"আনন্দ, এই যমক শালতরু অকালে হয়েছে পুষ্পিত। অগ্রভাগ থেকে মূলদেশ পর্যন্ত সর্বাংগ হয়েছে ফুল্ল-ফুলময়। তথাগতের পূজা-মানসে শাল-কুসুমরাশি

বৃষ্টি বর্ষণের মতো নিরন্তর ঝরে পড়ছে আমার সর্ব শরীরে। অন্তরীক্ষ থেকে দিব্য-সৌরভময় দিব্য চন্দন-চূর্ণ, মন্দার ও পারিজাত পুষ্প বর্ষণ হচ্ছে, বাদল ধারার মতো। অন্তরীক্ষে মোহন-সুরে ধ্বনিত হচ্ছে দিব্য-বাদ্য ও দিব্য-সঙ্গীত। বিবিধ উপচারে অনুপম ও অসাধারণভাবে পূজা হচ্ছে তথাগতের।

কিন্তু আনন্দ, এরূপ অপ্রমাণ পূজা হলেও, তবুও আমি বলতে চাই—এ পূজা তথাগতের যথোপযুক্ত পূজা হতে পারে না। এতে তথাগতের প্রতি প্রদর্শন করাও হচ্ছে না যথোপযুক্ত সৎকার, সম্মান, গৌরব, অর্চনা ও আরাধনা। আনন্দ, তোমরা এরূপই শিক্ষা করবে—'যে কোনো ভিক্ষু-ভিক্ষুণী ও উপাসক-উপাসিকা যদি ধর্মানুধর্ম প্রতিপন্ন, সমীচীন প্রতিপন্ন ও অনুধর্মাচারী হয়ে অবস্থান করে, তবে এতেই করা হবে তথাগতের প্রতি যথার্থ সৎকার, সম্মান, গৌরব, অর্চনা ও আরাধনা। এটিই পরমপূজা নামে অভিহিত হয়।"

(দীঃ মহাপরিনির্বাণ সূত্র)

৪৩। অনুসন্ধিৎসা—

তখন মহামান্য অর্হৎ স্থবির উপবাণ বুদ্ধের সম্মুখে দাঁড়িয়ে তাঁকে ব্যজন করছিলেন। সম্বুদ্ধ তাঁকে গাঢ় স্বরে আদেশ করলেন—"হে উপবাণ, আমার সম্মুখ থেকে সরে যাও।"

তখনই উপবাণ সে স্থান থেকে চলে গেলেন। আনন্দের অন্তরে তখন জাগ্রত হলো অনুসন্ধিৎসা। তিনি ঔৎসুক্যে জিজ্ঞাসা করলেন—"ভগবন্, আয়ুষ্মান উপবাণ দীর্ঘদিন আপনার সেবা করে আসছেন। সতত ইনি আপনার সমীপেই অবস্থান করে আপনার আদেশ পালনে রত থাকেন। অথচ সুগতের এ অন্তিম সময়ে তাঁকে সম্মুখ থেকে সরিয়ে দিলেন, এর কারণ কি প্রভু?"

"আনন্দ, তথাগতকে শেষ দর্শন মানসে এস্থানে সমাগত হয়েছেন কোটি-শত সহস্র চক্রবালের দেবগণ। এ শালোদ্যানের চতুর্দিকে দ্বাদশ যোজন-দ্বাদশ যোজন পরিমিত স্থান মহাপ্রভাবশালী দেবগণ দ্বারা পরিপূর্ণ হয়েছে। এতদূর স্থানে কেশাগ্র প্রমাণ স্থানও অবশিষ্ট নেই। দেবগণ কিন্তু, এরূপ অসন্তুষ্টিই প্রকাশ করছেন---"তথাগতকে দর্শন ও পূজা করার মানসে আমরা বহুদূর থেকে এসেছি। সুদীর্ঘ কালের পর ক্বচিৎ কোনও এক শুভক্ষণে জগতে আবির্ভূত হয়ে থাকেন জগজ্জ্যোতিঃ অর্হৎ সম্যক্ সম্বুদ্ধ। অদ্য রাত্রির শেষ যামেই পরিনির্বাপিত হবেন তথাগত। অথচ এ অন্তিম সময়ে তাঁর দর্শন লাভে আমরা বঞ্চিত হচ্ছি। পরাভূত হচ্ছে আমাদের দিব্য-দৃষ্টি! যেহেতু, এ মহা শক্তিশালী অর্হৎ ভিক্ষু আমাদের দর্শন পথ রুদ্ধ করে ভগবানের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছেন।"

সুগত-বাক্য শ্রবণে আনন্দ হলেন অনুসন্ধিৎসু। সমুৎসুকে জিজ্ঞাসা করলেন---"প্রভু, এখন দেবগণের মনোভাব কিরূপ? তাঁরা কি ইচ্ছা করেন আপনার পরিনির্বাণ প্রাপ্তি?"

"আনন্দ, দেবগণ আকুল হয়ে ক্রন্দন করছেন। কেহ আলুলায়িত কেশে, কেহ মাথায় হাত দিয়ে, কেহ ছিন্ন তরুবৎ পতিত হয়ে, কেহ ইতস্ততঃ লুটিয়ে পড়ে রোদন করছেন। অত্যধিক শোকাভিভূত হয়েছেন দেবগণ, ত্যাগ করছেন দীর্ঘশ্বাস। বলছেন তাঁরা বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে---'অতি শীঘ্র পরিনির্বাপিত হবেন ভগবান, অতিশীঘ্র নির্বাপিত হবেন জগজ্যোতিঃ, অতি শীঘ্র চক্ষুষ্মান্ হবেন অন্তর্হিত।' অনাগামী ও অর্হৎ দেবতাগণ ধীর-চিত্তে চিন্তা করছেন---'সংস্কার মাত্রই অনিত্য, এখানে এর কিরূপে হবে ব্যতিক্রম?"

তখন দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে আনন্দ কাতর স্বরে বললেন---"প্রভু, ইতি-পূর্বে বর্ষান্তে আপনার দর্শন মানসে নানাদিক থেকে ভিক্ষুগণ সমাগত হতেন। শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞাগুণ-সমৃদ্ধ ভিক্ষুদের দর্শন, সান্নিধ্য লাভ ও সেবা-পরিচর্যা করে অন্তরে কতো প্রীতিলাভ করেছি এবং নিজকে কতো সৌভাগ্য-বান মনে করেছি। কিন্তু ভন্তে, তথাগতের পরিনির্বাণের পর এসব

সদ্‌গুণ সম্পন্ন ভিক্ষুদের আর দর্শন ও সান্নিধ্য লাভ ঘটবে না।"

(দীঃ মহাপরিনির্বাণ সূত্র)

৪৪। চার মহাস্থান—

অতঃপর বুদ্ধ বললেন---"আনন্দ, শ্রদ্ধাবানের পক্ষে চারটি স্থান দর্শনীয় ও সংবেগজনীয়। সে স্থান চতুষ্টয় কি কি? যথা---

(১) তথাগতের জন্মস্থান লুম্বিনী উদ্যান,

(২) সম্বোধি লাভের স্থান---গয়ায় বোধি-পালঙ্ক,

(৩) সারনাথ---ধর্মচক্র প্রবর্তনের স্থান,

(৪) মহাপরিনির্বাণ স্থান---কুশীনারার শালবন।

আনন্দ, শ্রদ্ধায় প্রণোদিত হয়ে পুণ্যপ্রসূ পুণ্যক্ষেত্র এ মহাস্থান চতুষ্টয় দর্শনেচ্ছায় ভিক্ষু-ভিক্ষুণী ও উপাসক-উপাসিকাগণ পর্যটন করবে। তখন এ তীর্থ ক্ষেত্রে অথবা পথে যদি কারও মৃত্যু হয়, শ্রদ্ধা ও চিত্তপ্রসাদ হেতু এ মৃত্যু ওর পক্ষে কল্যাণ প্রদই হবে। দেহ ত্যাগের পর নিশ্চয়ই সে ব্যক্তি সুগতি লাভ করবে।"

(দীঃ মহাপরিনির্বাণ সূত্র)

৪৫। মাতৃজাতির প্রতি কর্তব্য---

অনুসন্ধিৎসু আনন্দ জিজ্ঞাসা করলেন---"প্রভু, মাতৃজাতির প্রতি আমাদের কিরূপ ব্যবহার করা কর্তব্য?"

"আনন্দ, নারীজাতির প্রতি দৃষ্টিপাত না করাই কর্তব্য।"

"ভন্তে, যদি নয়ন গোচর হয়, তবে তখন কিরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা কর্তব্য?"

"আলাপ করবে না।"

"প্রভু, ওরা যদি আলাপ করে, তবে তখন কি করা কর্তব্য?"

"আনন্দ, স্বীয় মাতা বা ভগ্নীর সহিত যেন আলাপ করছো, এরূপই চিত্তোৎপাদন করা কর্তব্য।"

আনন্দ শাস্তার অনুশাসন নতশিরে মেনে নিলেন।

দীঃ মহাপরিনির্বাণ সূত্র)

৪৬। বুদ্ধের দেহ-সৎকারে কিংকর্তব্য---

আনন্দ কাতর স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন---"ভগবন্, তথাগতের দেহ-সৎকারের ব্যবস্থা কিরূপ করা কর্তব্য?"

বুদ্ধ স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন---"আনন্দ, তজ্জন্য তোমরা ব্যস্ত হয়ো না। আত্মকর্তব্য সম্পাদন করো। অর্হত্ব লাভের জন্যই প্রচেষ্টা করো। অপ্রমত্ত ও বীর্যবান্ হয়ে এবং শরীর ও জীবনের প্রতি নিরপেক্ষ হয়ে ভব-দুঃখের অবসান করো। আনন্দ, এমন ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ ও গৃহপতিগণ আছেন, যাঁরা তথাগতের প্রতি একান্ত প্রসন্ন, শ্রদ্ধা প্রবণ ও সদ্ধর্মে অভিজ্ঞ, তাঁরাই করবেন তথাগতের শরীর পূজা।"

"প্রভু, কোন্ প্রণালীতে করতে হয় তথাগতের শরীর-পূজা?"

"আনন্দ, রাজচক্রবর্তীর শরীরের প্রতি যেরূপ করা হয়, তথাগরে শরীরের প্রতিও তদনুরূপ করা কর্তব্য।"

"প্রভু, রাজচক্রবর্তীর শরীরের প্রতি কিরূপ ব্যবস্থা করা হয়?"

"আনন্দ, রাজচক্রবর্তীর মৃতদেহ প্রথম একবার নূতন সূক্ষ্ম কৌষিক (রেশমী) বস্ত্রে পরিবেষ্টন করে তৎপর সুধূনিত কার্পাস দ্বারা একবার বেষ্টন করা হয়। এ নিয়মে পঞ্চশত বার কৌষিক বস্ত্রে এবং পঞ্চশত বার কার্পাস দ্বারা বেষ্টনের পর স্বর্ণময় তৈলাধারে এ পূতদেহ সুরক্ষা করা হয়। তদুপরি স্বর্ণময় মুখাবরণ দ্বারা আচ্ছাদন করা হয়। অগুরু-চন্দনাদি সর্ববিধ সুগন্ধ দ্রব্য-সম্ভারে চিতা সজ্জিত করা হয়। এমন শ্রেষ্ঠতম মহার্হ চিতায় সগৌরবে সৎকার করা হয় রাজচক্রবর্তীর পূতদেহ। চার মহাপথের

মিলন স্থানে রাজচক্রবর্তীর স্তূপ নির্মাণ করা হয়। আনন্দ, রাজচক্রবর্তীর দেহ-সৎকার এরূপেই করা হয়।

আনন্দ, তদনুরূপই তথাগতের শরীর সৎকার করা কর্তব্য। চার মহাপথের মিলন স্থানে তথাগতের শারীরিক ধাতু (পূতাস্থি) নিধান করে তদুপরি স্তূপ করা একান্ত প্রয়োজন। কারণ, যে সব শ্রদ্ধাবান সে স্তূপে পূজা করবে, ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন এবং তৎপ্রতি চিত্ত প্রসন্ন করবে, এতেই তাদের মহাপুণ্য অর্জন হবে। এ পুণ্যই আনয়ন করবে দীর্ঘকালের হিত-সুখ এবং নিয়ামক হয়ে দাঁড়াবে দুঃখ-মুক্তির।

আনন্দ, চারজন ব্যক্তিই স্তূপের যোগ্য। যথা---(১) তথাগত অর্হৎ সম্যক্ সম্বুদ্ধ, (২) পচ্চেক বুদ্ধ, (৩) সুগত-শ্রাবক (স্রোতাপন্ন, সকৃদাগামী, অনাগামী ও অর্হৎ) এবং (৪) রাজচক্রবর্তী। এ চতুর্বিধ স্তূপ মহাপুণ্য-ক্ষেত্র। এ পুণ্যতীর্থ স্তূপগুলি দর্শনেও চিত্তপ্রসাদ উৎপন্ন হয়; এতেও জনগণ দেহ-ত্যাগের পর সুগতি লাভ করে। তদ্ধেতু আনন্দ, এ চার জনই স্তূপের যোগ্য।"

(দীঃ মহাপরিনির্বাণ সূত্র)

৪৭। খেদোক্তি—

জিনরাজ বুদ্ধের শ্রীমুখ নিঃসৃত অন্তিম-বাণী আনন্দ অভিনিবেশ সহকারে শুনলেন। তীর্থ দর্শনের স্বার্থকতা, মাতৃজাতির প্রতি ব্যবহার-বিধি, বুদ্ধের দেহ-সৎকারে অবলম্বনীয় ব্যবস্থা-পদ্ধতি ও স্তূপের প্রয়োজনীয়তা; এ সব কথার মাধ্যমে মনীষী আনন্দ সম্যক্ উপলব্ধি করলেন---"আজ রাত্রে তথাগত নিশ্চয়ই পরিনির্বাপিত হবেন।" একথা মনে উদয় হতেই আনন্দ প্রবল শোকে অভিভূত হয়ে পড়লেন। পারলেন না আর অশ্রু সম্বরণ করতে। সুগতের সম্মুখে অশ্রু-বর্ষণ অনুচিত মনে করে সেখান থেকে চলে গেলেন।

শোকগ্রস্ত আনন্দ সাশ্রুনয়নে ভিক্ষুদের উপবেশন-গৃহের দ্বারে উপনীত

হলেন। তথায় দ্বার-অর্গল সদৃশ বৃক্ষ অবলম্বন করে দাঁড়িয়ে তিনি রোদন করতে লাগলেন। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে তিনি খেদোক্তি করছেন---"এখনও আমি শিক্ষার্থী, এখনও শেষ হয়নি আমার করণীয়। যিনি আমার অনুকম্পাকারী, যিনি আমার নিয়ামক, বিনায়ক, শাসক ও শিক্ষক, তিনি চলে যাবেন আমায় ত্যাগ করে, নিরাশ্রয় করে, সর্বহারা করে। তিনি পাবেন নির্বাণ, নির্বাপিত হবেন চিরতরে।"

এমন সময় সমন্তচক্ষু বুদ্ধ ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করলেন---"ভিক্ষুগণ, আনন্দ কোথায়?"

"ভন্তে, তিনি আসন-শালার দ্বারে দাঁড়িয়ে রোদন করছেন, বহু প্রকার করছেন খেদোক্তি।"

"ওকে এদিকে আসতে বলো।"

বুদ্ধের আদেশ শুনে আনন্দ তৎক্ষণাৎ সুগত সমীপে উপস্থিত হয়ে বন্দনার পর একান্তে উপবিষ্ট হলেন। বুদ্ধ করুণার্দ্র কণ্ঠে বললেন---"আনন্দ, রোদন করছো তুমি? কেন করবে রোদন? কোনও সার্থকতা আছে কি এ রোদনের? আমি তো বারংবারই বলে আসছি---'প্রিয়-মনোজ্ঞ সব কিছু থেকে একান্তই বিচ্ছিন্ন হতে হবে। ভবান্তরে হতে হবে বিরুদ্ধ সম্পর্ক। এ সত্যের ব্যতিক্রম এখানে কিরূপে সম্ভব হবে?"

আনন্দ, দীর্ঘদিন তুমি তথাগতের সেবা করে আসছো। কায়িক, বাচনিক ও মানসিক সুখ দানের ইচ্ছায়, হিতকামনায় এবং সম্মুখে বা পরোক্ষে দ্বিধাহীন অপ্রমাণ মৈত্রীচিত্তে তথাগতের পরিচর্যা করেছো। আনন্দ, তুমি কৃতপুণ্য। প্রবলভাবে সাধনায় রত হও, অতন্দ্রিত হয়ে আপন কর্তব্য সম্পাদন করো। তোমার মনোরথ নিশ্চয়ই পূর্ণ হবে। অচিরেই তুমি সাক্ষাত করবে অর্হত্বফল।"

অতঃপর বুদ্ধ ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে উদাত্ত কণ্ঠে বললেন---"ভিক্ষুগণ, অতীতের প্রত্যেক সম্যক্ সম্বুদ্ধের এক এক জন করে প্রধান সেবক ছিলো, যেমন আমার আনন্দ। ভবিষ্যতেও যত সম্যক্ সম্বুদ্ধ উৎপন্ন হবেন, তাঁদেরও এক এক জন থাকবে প্রধান সেবক, যেমন আমার আনন্দ।

ভিক্ষুগণ, আনন্দ পণ্ডিত ও মেধাবী। ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, উপাসক, উপাসিকা, রাজা, মহারাজা, তীর্থঙ্কর ও তীর্থঙ্কর-শ্রাবক প্রভৃতি জনগণের মধ্যে কার কোন্ সময়ে তথাগতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা উচিত, আনন্দের নিকট সে কাল-জ্ঞান আছে, তদ্বিষয়ে সে খুব অভিজ্ঞ।

ভিক্ষুগণ চতুর্বিধ আশ্চর্য-গুণে আনন্দ বিভূষিত ও পরিশোভিত। দর্শকবৃন্দ ওর দর্শন লাভে প্রসন্ন ও হর্ষোৎফুল্ল হয়, দর্শনে কারো তৃপ্তি মিটে না। ওর ধর্ম দেশনা শুনে শ্রোতৃবৃন্দ চমৎকৃত, উৎসাহিত ও অভিরমিত হয়, শ্রোতাদের শোনার তৃপ্তি মিটে না, আরো শুনতে ইচ্ছা হয়।"

(দীঃ মহাপরিনির্বাণ সূত্র)

৪৮। সুদূর অতীতের কুশীনগর---

একনিষ্ঠ সেবক আনন্দ তথাগতকে কাতর স্বরে অনুরোধ করলেন--- "প্রভু ভগবন্, এরূপ ক্ষুদ্র, উপজঙ্গল, বন্ধুর ও শাখানগরে আপনি শেষ-নিশ্বাস ত্যাগ করবেন না। এখানে পরিনির্বাপিত হবেন না। চম্পা, সাকেত, কৌশাম্বী, শ্রাবস্তী, বারাণসী, রাজগৃহ ও বৈশালী এবং আরো বিদ্যমান আছে কতো মহানগর। এসব প্রসিদ্ধ স্থানের যে কোনো নগরে আপনি পরিনির্বাণ লাভ করুন। এসব স্থানে মহাধনাঢ্য ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ ও গৃহপতিগণ আছেন, তাঁরা আপনার প্রতি অচলা শ্রদ্ধা সম্পন্ন। তাঁদের ক্ষমতা অসাধারণ। তাঁরাই সুগত-দেহের যথোপযুক্ত সৎকার করবেন।"

তখন চক্ষুষ্মান্ বুদ্ধ গাঢ়স্বরে বললেন---"এরূপ বলো না আনন্দ, এরূপ বলো না। 'এ নগর ক্ষুদ্র, উপজঙ্গল ও শাখানগর মাত্র' এমন কথা আর বল্‌বে না, কখনও এরূপ ধারণা পোষণ করবে না। আনন্দ, সুদূর অতীতে এ কুশী-নগর কুশাবতী নামে সুপ্রসিদ্ধা নগরী ছিলো। সুজলা, সুফলা, শস্য, শ্যামলা কুশাবতী সপ্তরত্নে ছিলো পরিপূর্ণ, রত্নগর্ভা। এখানে ছিলেন মহাসুদর্শন নামে এক চক্রবর্তী রাজা। তিনি ছিলেন ধর্মরাজ, ধর্মানুসারে করতেন রাজ্য শাসন। তিনি ধর্মতঃ জয় করেছিলেন চার মহাদ্বীপ। এ কুশাবতী ছিলো রাজাধিরাজ মহাসুদর্শনের রাজধানী।

এ নগরী ছিলো সর্বতোভাবে সমৃদ্ধা, আনন্দদায়িকা ও বহুজনাকীর্ণা। এটি পূর্ব-পশ্চিমে দ্বাদশ যোজন এবং উত্তর-দক্ষিণে সপ্ত যোজন বিস্তৃত ছিলো। চক্ররত্ন, হস্তীরত্ন, অশ্বরত্ন, মণিরত্ন, স্ত্রীরত্ন, গৃহপতিরত্ন ও পরিনায়ক রত্ন, এবম্বিধ সুদুর্লভ সপ্ত রত্নের অধীশ্বর ছিলেন রাজচক্রবর্তী মহাসুদর্শন।

আনন্দ, চতুর্বিধ পুণ্যঋদ্ধি সম্পন্ন ছিলেন মহারাজ মহাসুদর্শন। যথা— (১) তিনি ছিলেন সকলের চেয়ে অপেক্ষাকৃত অভিরূপ, দর্শনীয়, মনোমোহন লাবণ্যমণ্ডিত ও পুণ্যলক্ষণ বিভূষিত। (২) তিনি ছিলেন দীর্ঘায়ু, তখনকার জনসাধারণ থেকে অধিক পরমায়ু সম্পন্ন। (৩) নীরোগ ও দৈহিক ক্লেশমুক্ত এবং (৪) জনগণের প্রিয়-মনোজ্ঞ ছিলেন, জনগণও ছিলো তাঁর প্রিয়-মনোজ্ঞ।

সার্বভৌম রাজাধিরাজ মহাসুদর্শনের বহু সংখ্যক দানশালা ছিলো। তথায় প্রত্যহ বিতরণ হতো অন্ন, বস্ত্র, হিরণ্য ও সুবর্ণাদি দানীয় বস্তু। পুণ্যশ্লোক মহাসুদর্শনের মহাপুণ্য প্রভাবে এবং দেবতার দিব্যানুভাব বলে 'ধর্মপ্রাসাদ' নামক একখানা বৈচিত্র্যময় বাসভবন তাঁর জন্য নির্মিত হয়েছিলো। এ চমৎকার প্রাসাদ স্বর্ণ, রৌপ্য, বৈদুর্য ও স্ফটিকময়। প্রাসাদে স্থাপিত পালঙ্ক সমূহ স্বর্ণ, রৌপ্য, বৈদুর্য, গজদন্ত, স্ফটিক ও সারময়। প্রাসাদের শোভা-বর্দ্ধন করেছিলো চতুর্দিকে পরিবেষ্টিত স্বর্ণময় ও রৌপ্যময় দু'টি বেদিকা। স্বর্ণময় বেদিকায় রৌপ্যময় চারুশিল্পে পরিশোভিত স্বর্ণময় স্তম্ভ। রৌপ্যময় বেদিকায় স্বর্ণময় কারুকার্য-খচিত রৌপ্যময় স্তম্ভ। স্বর্ণময় ও রৌপ্যময় দু'টি কিঙ্কিনী জালে প্রাসাদ পরিবেষ্টন করা হয়েছিলো। এ অসাধারণ প্রাসাদ পূর্ব-পশ্চিমে এক যোজন ও উত্তর-দক্ষিণে অর্ধযোজন বিস্তৃত। মহারাজ বৃহত্তম কূটাগারদ্বারে দিবা-বিশ্রাম মানসে সর্ব-সুবর্ণময় এক তালোদ্যান নির্মাণ করিয়েছিলেন।

আনন্দ, অতঃপর রাজেন্দ্র মহাসুদর্শন ধর্মপ্রাসাদের সম্মুখে 'ধর্ম' নামক এক রাজসরোবর খনন করিয়েছিলেন। তা পূর্ব-পশ্চিমে এক যোজন এবং উত্তর-দক্ষিণে অর্ধ যোজন বিস্তৃত। স্বর্ণ, রৌপ্য, বৈদুর্য ও স্ফটিকময় ইষ্টকে সরোবর-তীর বিচিত্র সজ্জায় সজ্জিত করা হয়েছিলো। চতুর্দিকে

পরিশোভিত হয়েছিলো স্বর্ণ, রৌপ্য, বৈদুর্য ও স্ফটিকময় সোপান শ্রেণী। তীরের চতুঃপার্শ্ব স্বর্ণ, রৌপ্য, বৈদুর্য, স্ফটিক, লোহিতক, মরকত ও সর্বরত্ন-ময় সাত পংক্তি তালবৃক্ষে বিভূষিত করা হয়েছিলো। এ বৈচিত্র্যময় সরোবরের খনন কার্য পরিসমাপ্ত হলে মহাসুদর্শন চক্রবর্তীরাজোচিত মহাদানে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। দান কার্যের অবসানে তিনি ধর্মপ্রাসাদে অধিরোহণ করেছিলেন সাড়ম্বরে।

আনন্দ, ধর্মপ্রাসাদের নির্মাণ কার্য সমাপ্ত হবার পর তদ্দিকে দৃষ্টিপাত করা দুঃসাধ্য হয়েছিলো। শারদ সময়ে মেঘমুক্ত নির্মল আকাশে উদীয়মান সূর্য যেমন দুর্নিরীক্ষ হয়, তাদৃশ আনন্দ, ধর্মপ্রাসাদও দুর্দর্শনীয় হয়েছিলো।

অতঃপর আনন্দ, একদিন মহারাজ ধীরচিত্তে চিন্তা করলেন---'আমি যে এখন এরূপ মহাবিভব, মহানুভাব ও মহাপরাক্রমশালী হয়েছি, এটা কোন্ কর্মের ফল? নিশ্চয়ই এটা দান, শীল ও ষড়েন্দ্রিয় সংযমের মহাফল।' এ চিন্তার পর মহাসুদর্শন আরো মহীয়ান-কুশল, ব্রহ্মচর্য ও চিত্তশুদ্ধির মানসে ধর্মপ্রাসাদের মহাব্যূহ-কূটাগারের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হয়ে এরূপ প্রীতিবাক্য উচ্চারণ করলেন---'নিবৃত্ত হও কামবিতর্ক, ব্যাপাদ বিতর্ক ও বিহিংসা বিতর্ক। আর নয় কামবিতর্ক, ব্যাপাদবিতর্ক ও বিহিংসা-বিতর্ক।'

তৎপর আনন্দ, রাজামহাসুদর্শন কূটাগারে প্রবেশ করে সুবর্ণ-পালঙ্কে সমাসীন হলেন। কামাসক্তির প্রতি বিরাগ উৎপাদন ও অকুশল কর্ম ত্যাগ করে ধ্যানে নিবিষ্ট হলেন। অচিরেই তিনি চতুর্থ ধ্যান লাভ করলেন। অনন্তর তিনি এ কূটাগার থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে স্বর্ণ-কূটাগারে প্রবেশ করলেন। সেখানে রৌপ্যময় পালঙ্কে সমাসীন হয়ে মৈত্রী ভাবনায় মগ্ন হলেন। অখিল ব্রহ্মাণ্ডের সকল প্রাণীর প্রতি নিরবচ্ছিন্ন মৈত্রী সহগত চিত্তে অপ্রমাণ অবৈর-অহিংসা ভাবনায় তন্ময় হলেন। তদনন্তর রাজর্ষি মহাসুদর্শন অনুক্রমে করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা ভাবনায় সকল দিক বিস্ফারিত করে অবস্থান করতে লাগলেন।

অতঃপর আনন্দ, চতুরশীতি সহস্র বৎসরের অবসানে মহারাজের প্রধানা

মহিষী সপ্তরত্নের অন্যতম স্ত্রীরত্ন সুভদ্রাদেবীর অন্তরে এরূপ ভাবোদয় হলো---'সুদীর্ঘ দিন আমি মহারাজের দর্শন লাভে বঞ্চিতা। তাঁকে দর্শন করতে যাবো।' এ চিন্তা করে তিনি অন্তঃপুরিকাগণকে বল্‌লেন--- "মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করতে যাবো, তোমরা স্নানান্তে পীতবস্ত্র পরিধান করে এসো।"

রাজমহিলাগণ প্রধানা মহিষীর আদেশ যথাযথ প্রতিপালন করলো। সুভদ্রাদেবী চতুরঙ্গিনী সেনার সুরক্ষায় পুরনারী পরিবৃতা হয়ে ধর্মপ্রাসাদে উপনীত হলেন। দেবী কূটাগারের বহির্ভাগে দ্বারপ্রান্তে দাঁড়ালেন। মহা-জনতার শব্দ শুনে মহারাজ দ্বার খুল্‌লেন। দ্বার সম্মুখে দণ্ডায়মানা সুভদ্রা দেবীকে দেখে তিনি গাঢ়স্বরে বললেন---"দেবি, সেখানেই স্থিতা হও, প্রাসাদে প্রবেশ করো না।"

তখন রাজর্ষি কর্মচারীকে আদেশ করলেন---"তোমরা কূটাগার থেকে সুবর্ণ-পালঙ্ক বের করে সর্ব-স্বর্ণময় তালবনে স্থাপন করো।" তৎক্ষণাৎ রাজাদেশ প্রতিপালিত হলো। মহাসুদর্শন পালঙ্কোপরি দক্ষিণ পার্শ্ব হয়ে সিংহ-শয্যায় শয়ন করলেন। তখন সুভদ্রাদেবী মহারাজকে নিরীক্ষণ করে চিন্তা করলেন---'রাজার সর্বাঙ্গ দেখছি শান্ত, বিশুদ্ধ ও শ্বেতবর্ণ হয়েছে, এটা মৃত্যুর পূর্বলক্ষণ হলেও, রাজার যেন মৃত্যু না হয়।'

দেবী তখন ব্যগ্র কণ্ঠে রাজাকে বললেন---"দেব, রাজধানী কুশাবতী প্রমুখ আপনার চুরাশি হাজার নগর, এতে প্রবৃত্তি উৎপাদন করুন, কামনা করুন বেঁচে থাক্‌বার।

ধর্মপ্রাসাদ প্রমুখ আপনার চুরাশি হাজার প্রাসাদ, হস্তীরত্ন প্রমুখ চুরাশি হাজার হস্তী, এতে প্রবৃত্তি উৎপাদন করুন, দীর্ঘদিন বেঁচে থাক্‌বার কামনা করুন।"

এরূপ বাক্যে তৎসংখ্যক অশ্ব, মণি, স্ত্রী, ধেনু, পালঙ্ক ও পরিচ্ছদ ইত্যাদি বহুবিধ প্রধান ঐশ্বর্যের নামোল্লেখ করে রাণী মহাসুদর্শনের অন্তরে কামনা ও বাসনাময় উৎসাহ-উদ্দীপনার সঞ্চার করার যথেষ্ট প্রয়াস পেলেন।

কিন্তু রাজা তাঁকে ধীর কণ্ঠে বললেন---"দেবি, তুমি সুদীর্ঘকাল

আমার সহিত আচরণ করে আস্‌ছো---ইষ্ট, কান্ত ও মনোজ্ঞ। কিন্তু, এখন আমার অন্তিম কালে তোমার এ আচরণ বড়ো অনিষ্টকর, অশোভন ও অমনোজ্ঞ।''

তখন মহিষী সজল-নয়নে বেদনা-বিধুর অন্তরে বললেন---'দেব, তবে আমি কিরূপ আচরণ করবো, দয়া করে বলুন।''

''দেবি, তুমি এরূপই বলো---''যা কিছু আমাদের প্রিয়-মনোজ্ঞ, তা থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন হতে হবে, সব কিছুই ত্যাগ করে যেতে হবে। দেব, আপনি অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী মহাভাগ্যবান রাজচক্রবর্তী মহাসুদর্শন''

আনন্দ, চিন্তা করে দেখো, অতীত হয়ে গেছে সে সমস্ত অপূর্ব বিভব। ধ্বংস হয়ে গেছে দেবৈশ্বর্যসম সেই বিভূতি-মণ্ডিত মহৈশ্বর্য। অনিত্যত্বে পর্যবসিত হয়েছে সেই রাজত্ব, প্রভুত্ব, বশিত্ব ও ঈশিত্ব। এরূপই আনন্দ, সংস্কার মাত্রই অনিত্য। তা এতোই অধ্রুব; এতোই অবিশ্বাস্য। সুতরাং আনন্দ, সকল সংস্কারের প্রতিই বিরাগ উৎপাদন করো। সংস্কার থেকে একান্ত ভাবেই পৃথক, নির্লিপ্ত ও বিমুক্ত হও।

আনন্দ, ইতিপূর্বে অতীত জন্মে কুশীনগরের এ স্থানেই আমি ছয়বার দেহত্যাগ করেছিলাম। তাও ধর্মপরায়ণ ধর্মরাজ সপ্তরত্নের অধিকারী সসাগরা পৃথিবীর একাধীশ্বর মহাসুদর্শন হয়ে। এবার এখানে এই আমার সপ্তম দেহ ত্যাগ। আনন্দ, দেব-ব্রহ্ম অথবা মনুষ্যলোকে এমন কোনও স্থান দেখছি না, যেখানে আমি অষ্টমবার দেহ-ত্যাগ করবো।''

(দীঃ মহাপরিনির্বাণ ও মহাসুদর্শন সূত্র)

৪৯। *মল্লগণকে সংবাদ দান---*

অতঃপর বুদ্ধ আনন্দকে আদেশ করলেন---''আনন্দ, তুমি গিয়ে কুশী-নগরবাসী মল্লগণকে সংবাদ দাও যে—আজ রাত্রির শেষ যামে তথাগত পরিনির্বাপিত হবেন। আপনারা এসে তাঁকে দর্শন করুন, অন্তিম দর্শন। পরে এ বলে আপনাদের যেন অনুতাপ করতে না হয় যে---'আমাদের

গ্রামেই তথাগত পরিনির্বাপিত হলেন, অথচ আমরা তাঁর অন্তিম দর্শন লাভে বঞ্চিত হলাম।''

বুদ্ধের আদেশানুসারে আনন্দ অবিলম্বে গিয়ে মল্লগণকে এ সংবাদ দিলেন। সংবাদ শুনে কুশীনগরবাসী শোকে অভিভূত হলেন। রাজা-প্রজা, আবাল-বৃদ্ধবনিতা রোদন পরায়ণ হয়ে শালবনে এসে আনন্দের নিকট উপস্থিত হলেন। স্থবির মল্লদের এক এক কুলের নর-নারীকে সমবেত করিয়ে ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করালেন এবং প্রত্যেক কুলের পরিচয় প্রদান করলেন। বিচক্ষণ আনন্দ এ উপায়ে রাত্রির প্রথম যামেই বন্দনা কার্য সমাপ্ত করালেন।

(মহাপরিনির্বাণ সূত্র)

৫০। আনন্দ ও সুভদ্র---

তখন পরিব্রাজক সুভদ্র কুশীনারায় অবস্থান করছিলেন। কয়েকটা বিষয়ে সুভদ্র সন্দিগ্ধ ছিলেন। তাঁর দৃঢ়-ধারণা, একমাত্র তথাগত বুদ্ধই এ সন্দেহের নিরসন করতে সমর্থ হবেন। এযাবৎ তিনি বুদ্ধের সাক্ষাৎ লাভের সুযোগ পাননি। 'ভগবান আজ পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হবেন' এ সংবাদ শুনে তাড়াতাড়ি ছুটে এলেন আনন্দের নিকট। বললেন ব্যগ্র কণ্ঠে---''বন্ধু আনন্দ, আমি ভগবৎ গৌতমের দর্শন প্রত্যাশী। শোনলাম, আজ রাত্রির শেষ প্রহরে তিনি নির্বাণ প্রাপ্ত হবেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তিনিই আমার সন্দেহের নিরাকরণ করতে পারবেন। তাই বন্ধু, বুদ্ধের সাক্ষাৎ লাভ আমার একান্ত প্রয়োজন। অনুমতি দিন, আমি তাঁকে দর্শন করি।''

বুদ্ধগত প্রাণ, শোক-কাতর আনন্দ সুভদ্রের প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করে বললেন---''বন্ধু সুভদ্র, আর নয়; তথাগতকে আর কষ্ট দেবেন না। তিনি ক্লান্ত হয়েছেন।''

সুভদ্র দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার প্রার্থনা করলেন। আনন্দ কিন্তু, প্রতিবারে

একইরূপ প্রত্যুত্তর দিলেন। বিনায়ক বুদ্ধের শ্রুতিগোচর হলো আনন্দ ও সুভদ্রের বাক্যালাপ। তিনি আনন্দকে আদেশ করলেন---"আনন্দ, আসতে দাও সুভদ্রকে, বারণ করো না।" সুগতের আদেশ পেয়ে আনন্দ সুভদ্রকে অনুমতি দিলেন। সুভদ্র এসে বুদ্ধকে প্রশ্ন করলেন---"ভগবৎ গৌতম, যশস্বী পূরণকশ্যপাদি তীর্থঙ্করগণ বিমুক্ত কি না? তাঁদের ধর্ম মুক্তিপ্রদ কি না?"

শাস্তা তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন---"ক্ষান্ত হও সুভদ্র, তাদের বিষয় এখন ত্যাগ করো। আমি যা বলছি, তা'ই মনোযোগ দিয়ে শোনো---"হে সুভদ্র, যেখানে আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ নেই; সেখানে শ্রমণ নেই। যেখানে আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গের উপলব্ধি নেই, সেখানে প্রথম শ্রমণ স্রোতাপন্ন, দ্বিতীয় শ্রমণ সকৃদাগামী, তৃতীয় শ্রমণ অনাগামী ও চতুর্থ শ্রমণ অর্হৎ নেই। যথায় চার শ্রেণীর শ্রমণ নেই, সেখানে মুক্তির মার্গও নেই।

সুভদ্র, আমি সর্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভের পর পঁয়তাল্লিশ বৎসর যাবৎ আর্যমার্গ ধর্মপ্রদেশে বিদর্শনমার্গ প্রবর্তন করেছি। এর বহির্ভাগে শ্রমণ নেই, শ্রমণত্ব লাভের উপায়ও নেই। এমার্গে সম্যক্‌রূপে বিহরণ করলে, পৃথিবী অর্হৎ শূন্য হবে না।"

সম্বুদ্ধের এ সংক্ষিপ্ত সারগর্ভ বাণী শুনে পুণ্য সংস্কার বিমণ্ডিত সুভদ্রের অন্তর-দ্বার খুলে গেলো, উপলব্ধি করলেন ত্রিরত্নের মহিমা, তিনি রত্নত্রয়ের শরণাপন্ন হলেন এবং সুগত সমীপে প্রার্থনা করলেন প্রব্রজ্যা। পরিব্রাজক সুভদ্র অন্যপথের অনুসারী, তাই তাঁর থেকে চার মাস কঠোর-ব্রত উদ্‌যাপনের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করে শাস্তা আনন্দকে আদেশ করলেন----"আনন্দ, তা হলে সুভদ্রকে প্রব্রজ্যা দাও।"

তখন সুভদ্র আনন্দকে প্রীতি বাক্যে বললেন---"বন্ধু আনন্দ, আপনাদের পরমলাভ ও পরম সৌভাগ্য; যেহেতু বন্ধু, আপনারা জিনরাজ কর্তৃক অন্তেবাসিক অভিষেকে অভিষিক্ত।"

আনন্দ সুভদ্রের কেশ-শ্মশ্রু ছেদন করে পরিধানের জন্য চীবর দান করলেন। চীবর পরিধানের পর তাঁকে ত্রিশরণে প্রতিষ্ঠাপিত করে প্রব্রজ্যা

প্রদানের পর সুগত সন্নিধানে নিয়ে গেলেন। পুণ্যবান সুভদ্র সম্বুদ্ধের নিকট লাভ করলেন উপসম্পদা। সুগত তাঁকে বলে দিলেন ধ্যান-বিধি। বুদ্ধের অন্তিম-শিষ্য সুভদ্র অচিরেই অর্হত্ব ফল সাক্ষাৎ করলেন।

(মহাপরিনির্বাণ সূত্র)

৫১। বুদ্ধের অন্তিম বাণী---

পুণ্যপুরুষ শাস্তা আনন্দকে বললেন---"আনন্দ, তথাগতের পরিনির্বাণের পর তোমাদের মনে এরূপ উদয় হতে পারে---"আমাদের প্রবক্তা-শাস্তা আর নেই, শাস্তার উপদেশও শেষ হয়েছে।" আনন্দ, আমি যা ধর্ম-বিনয় দেশনা ও প্রজ্ঞাপ্ত করেছি, আমার অবর্তমানে তা'ই হবে তোমাদের শাস্তা ও নিয়ামক।

আনন্দ, ভিক্ষুগণ এযাবৎ পরস্পর পরস্পরকে 'বন্ধু' বলেই সম্বোধন করে আস্‌ছে। আমার অবর্তমানে কিন্তু সেরূপ করো না। স্থবির ও মহাস্থবিরগণ অল্প বয়স্ক ভিক্ষুগণকে 'নাম-গোত্র' অথবা 'বন্ধু' বলেই সম্বোধন করবে এবং অল্প বয়স্ক ভিক্ষুগণ অধিক বয়স্ক ভিক্ষুগণকে 'ভন্তে' (প্রভু) অথবা 'আয়ুষ্মান্' বলে সম্বোধন করবে।

আনন্দ, আমার অবর্তমানে সংঘ ইচ্ছা করলে, ক্ষুদ্র ও অপ্রধান বিধি সমূহ বর্জন করুক।

আনন্দ, আমার দেহান্তে ছন্ন ভিক্ষুকে 'ব্রহ্মদণ্ড' দিতে হবে।"

"প্রভু, ব্রহ্মদণ্ড কিরূপ?"

"আনন্দ, ভিক্ষুদের প্রতি ছন্ন যথেচ্ছা বাক্য প্রয়োগ করে, তদ্ধেতু ওর সঙ্গে যেন ভিক্ষুগণ কোনো কথাই না বলে, কোনো উপদেশও যেন না দেয়, অনুশাসনও যেন না করে।"

অতঃপর তথাগত ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বললেন ---"হে ভিক্ষুগণ, তোমাদের মধ্যে কারও যদি ত্রিরত্নে বা আর্যমার্গে অথবা বিধি সমূহে কোনও প্রকার সন্দেহ বা বিমতি থাকে, এখন আমাকে তা জিজ্ঞাসা করো, পরে যেন অনুতাপ করতে না হয় যে, শাস্তা আমাদের সম্মুখেই ছিলেন, অথচ

আমরা তাঁকে কোনো প্রশ্নই করিনি।"

ভিক্ষুগণ নীরব রইলেন। বুদ্ধ দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার জিজ্ঞাসা করলেন। তবুও তাঁরা নীরব রইলেন। সুগত পুনরায় বললেন---"হে ভিক্ষুগণ, আমার প্রতি গৌরব বশতঃ তোমরা যদি প্রশ্ন করতে সঙ্কোচ মনে করো, তবে তোমরা পরস্পর পরস্পরের নিকট, সহচর সহচরের নিকট নিঃসংকোচে প্রকাশ করো।"

ভিক্ষুগণ তবুও নীরব রইলেন। তখন আনন্দ মুগ্ধ-বিস্ময়ে বললেন---"আশ্চর্য, আশ্চর্য ভন্তে! একজন ভিক্ষুও সন্দেহ বা বিমতি পোষণ করেন না! বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘে, আর্যমার্গে অথবা বিধি সমূহে প্রত্যেক ভিক্ষুই নিঃসন্দেহ! প্রভু, এ মহাজ্ঞানী ভিক্ষুগণের প্রতি আমি অত্যধিক প্রসন্ন ও বিমুগ্ধ হয়েছি।"

"আনন্দ, তোমার শ্রদ্ধার গভীরতায় এরূপ বলছো। কিন্তু আনন্দ, আমি সর্বজ্ঞতা অভিজ্ঞানে সম্যক্ জ্ঞাত আছি যে, রত্নত্রয়ে, মার্গে অথবা বিধি সমূহে এখানে একজন ভিক্ষুর অন্তরেও সন্দেহ বা বিমতি নেই; থাকেতও পারে না। যে হেতু আনন্দ, এই বস্ত্র-বেষ্টনীর অভ্যন্তরে উপবিষ্ট পঞ্চশত ভিক্ষুর মধ্যে যে ভিক্ষু জ্ঞানে সর্বকনিষ্ঠ, সেও স্রোতাপন্ন ১, অপায় বিমুক্ত ও সম্বোধি পরায়ণ।"

অতঃপর দেব-মানবের শাস্তা তথাগত ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে তাঁর অন্তিম-বাণী উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন---"হে ভিক্ষুগণ, সংস্কার মাত্রই ধ্বংসশীল। আপন কর্তব্য অপ্রমাদের সহিত সম্পাদন করো।" পুণ্য-পুরুষ সম্যক্ সম্বুদ্ধের এটাই শেষ উপদেশ।

বিশ্বমাতার সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান তথাগতের এ অন্তিম-বাণী পরিসমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ধ্যানে নিমগ্ন হলেন। প্রথম ধ্যান থেকে আরম্ভ ক'রে অনুক্রমে নৈবসংজ্ঞা নাসংজ্ঞায়তন ধ্যানে উপনীত হয়ে অতঃপর সম্প্রাপ্ত

১। আনন্দকে লক্ষ্য করেই বলেছেন। এখানে আনন্দই একমাত্র স্রোতাপন্ন, অপর সমস্ত ভিক্ষুই ত্রিবিদ্যা ও ষড়ভিজ্ঞা সম্পন্ন অর্হৎ।

হলেন 'সংজ্ঞা-বেদয়িত নিরোধধ্যান'। আনন্দ তখন মহামান্য অনুরুদ্ধ স্থবিরকে কাতর-স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন---"ভন্তে, ভগবান কি নির্বাপিত হলেন?"

দিব্যচক্ষুর অগ্রগণ্য পূজার্হ অনুরুদ্ধ প্রত্যুত্তরে বললেন---"না বন্ধু আনন্দ, এখনও তিনি নির্বাণ প্রাপ্ত হন নি। 'সংজ্ঞা-বেদয়িত নিরোধ-ধ্যান' সম্প্রাপ্ত হয়েছেন তিনি।"

সম্বুদ্ধ অনুলোম-প্রতিলোম বশে লৌকিক্ ও লোকোত্তর সমস্ত ধ্যান অনুক্রমে সম্প্রাপ্ত হয়ে, পরমামৃতের সঙ্গে উপমিত অদ্বিতীয় ধ্যান-সুখ তাঁর অন্তিম কালে সম্যক্‌রূপে উপভোগ করলেন। এটিই তাঁর চরম উপভোগ। পরিশেষে প্রথম থেকে ক্রমশঃ চতুর্থধ্যান সম্প্রাপ্ত হয়ে, তা সমাপ্ত করার পরই চিত্ত ভবাঙ্গে উপগত হবার সঙ্গে সঙ্গেই ভগবানের আয়ু-সংস্কার নিঃশেষ হলো, জীবন প্রবাহের অবসান ঘটলো, নিরোধ হলো। নিরোধই উপশম, নিবৃত্তি, নির্বাপিত। জগজ্যোতিঃ চিরতরে হলেন নির্বাপিত, নিবে গেলো দীপ্তোজ্জ্বল ষড়রশ্মির আলোক-মালা, মহাচক্ষু হলেন অন্তর্হিত। *

সম্যক্ সম্বুদ্ধের পরিনির্বাণ প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই মনীষী আনন্দ বেদনা-বিধুর অন্তরে এ গাথাটি ভাষণ করলেন---

'তদাসি যং ভিংসনকং—তদাসি লোম-হংসনং,
সব্বকার বরূপেতে সম্বুদ্ধে পরিনিব্বুতে।'

সর্বগুণশ্রেষ্ঠ সম্বুদ্ধের পরিনির্বাণ প্রাপ্তির
সঙ্গে সঙ্গেই সংঘটিত হলো লোমহর্ষকর
ভূমিকম্প, ধ্বনিত হলো বজ্র-নির্ঘোষ, দৃষ্টি-
গোচর হলো বিদ্যুৎ-রেখা, বর্ষিত হলো ঘন-বৃষ্টি।

(দীঃ মহাপরিনির্বাণ সূত্র)

* গ্রীসে রক্ষিত চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণের রেকর্ড মতে বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ ৫৪৫ খ্রীঃ পূর্বাব্দের ২২শে এপ্রিল, বৈশাখী পূর্ণিমা।

৫২। শোকে মুহ্যমান---

তথাগত বুদ্ধের পরিনির্বাণ প্রাপ্তিতে শোকে মুহ্যমান হলেন একনিষ্ঠ সেবক আনন্দ। শুকিয়ে গেছে যেন তাঁর অশ্রুবারি। আবার কখনও কখনও ঝরতে আরম্ভ করে বর্ষার বাদল-ধারার মতো চোখের জল। থামতে চায় না যেন তাঁর দুঃসহ শোক-কান্না। তাঁর হৃদয় যেন বিদীর্ণ হয়ে গেছে; ভেঙ্গে বিচূর্ণ হয়ে গেছে যেন বক্ষঃ-পঞ্জর। তিনি যেন নিঃস্ব, সর্বহারা, দিশাহারা হয়ে গেছেন। সকল দিক্ যেন তিনি দেখতে লাগলেন অন্ধকার। তাঁর অন্তরে কেমন না জানি এক দুর্বিষহ দাহ উৎপন্ন হয়েছে। মর্মন্তুদ বেদনায় তিনি যেন হয়ে গেছেন বিধ্বস্ত, স্তব্ধীভূত ও অভিভূত।

এমন সময়ে আনন্দপ্রমুখ শোকগ্রস্ত ভিক্ষুগণকে মহামান্য অনুরুদ্ধ সান্ত্বনা বাক্যে এরূপ উপদেশ দিলেন---"আয়ুষ্মান্‌গণ, কোনো প্রকার শোক করবেন না, রোদন করবেন না; শোক ও রোদন করা নিরর্থক। শাস্তা তো বলেছেন---'সমস্ত মনোজ্ঞ ও প্রিয়জন থেকে একান্তই বিচ্ছিন্ন হতে হবে। জন্ম হলেই মৃত্যু অনিবার্য, এটা জগতের অলংঘ্য বিধান।' বন্ধুগণ, আপনাদের এ আচরণ দেখে দেবগণ নিন্দা করছেন।"

তখন আনন্দ উৎসুক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন---"ভন্তে, দেবগণের বর্তমান অবস্থা কিরূপ? তাঁরা শোকবেগ সম্বরণ করতে পারছেন তো?"

দিব্যদর্শী অনুরুদ্ধ বললেন---"সৌম্য আনন্দ, দেবগণ ক্রন্দন করছেন। শোকাতিশয্যে কেউ আলুলায়িত কেশে, কেহ মাথায় হাত দিয়ে, কেউ ছিন্নবৎ-পতিত হয়ে, আর কেউ লুটিয়ে পড়ে বিলাপ করছেন। অনাগামী ও অর্হৎ দেবগণের অন্তরে উৎপন্ন হয়েছে ধর্ম সংবেগ। স্মৃতি সম্প্রযুক্ত জ্ঞানে চিন্তা করছেন তাঁরা---'সংস্কার মাত্রই অনিত্য। এখানে কিরূপে সম্ভব হবে এর অন্যথা ভাব?"

প্রজ্ঞাবান অনুরুদ্ধ ও পণ্ডিত আনন্দ সে রাত্রির অবশিষ্ট সময় ধর্মালোচনায় অতিবাহিত করলেন। প্রত্যূষে আয়ুষ্মান্ অনুরুদ্ধ আনন্দকে আদেশ করলেন---"যাও আনন্দ, কুশীনগরের মল্লদের সংবাদ দাও যে---'ভগবান

পরিনির্বাণ লাভ করেছেন, এ সময়ে তাঁদের যা কর্তব্য, তা যেন সম্পাদন করেন।"

এদিকে কুশীনগরবাসী মল্লগণ মন্ত্রণাগারে সমবেত হয়ে---"বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর তাঁদের কি কর্তব্য " সেটাই পরামর্শ করছেন। এমন সময় সভাগৃহে আনন্দ উপস্থিত হলেন। তিনি সকলকেই তথাগতের পরিনির্বাণ সংবাদ জানালেন এবং তাঁদের কর্তব্য বিষয়েও অবহিত হবার জন্য বললেন।

(দীঃ মহাপরিনির্বাণ সূত্র)

৫৩। প্রখর কর্তব্য জ্ঞান---

আনন্দের মুখে বুদ্ধের পরিনির্বাণ-সংবাদ শুনে সমগ্র কুশীনগরবাসী অত্যধিক শোকাভিভূত হলেন। আবালবৃদ্ধ-বনিতা সকলেই ক্রন্দন পরায়ণ হয়ে পূজোপচার হস্তে শালবনে উপনীত হলেন। ছয়দিন যাবৎ আপামর সর্বসাধারণ নির্বাণগত বুদ্ধের পূত-দেহ অসাধারণ ভাবে পূজা করলেন। সপ্তম দিবসে নগরের পূর্বপার্শ্বে 'মুকুট-বন্ধন' নামক মল্লরাজাদের প্রসাদন-মঙ্গল শালায় এ পবিত্র দেহ সযত্নে নিয়ে রাখলেন।

মল্লরাজ-প্রধান আনন্দকে জিজ্ঞাসা করলেন---"ভন্তে আনন্দ, তথাগতের দেহ-সৎকার সম্বন্ধে আমাদের কি কর্তব্য?"

আনন্দ বললেন---"রাজচক্রবর্তীর দেহ সম্বন্ধে যা করা হয়, তথাগতের দেহ সম্বন্ধেও তা'ই করা কর্তব্য।"

"ভন্তে, রাজচক্রবর্তীর শরীরের প্রতি কিরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়?"

প্রত্যুত্তরে আনন্দ সুগতোক্ত নির্দেশই ব্যক্ত করলেন। আনন্দের সুযুক্তি পূর্ণ কথা শুনে মল্লগণ অত্যধিক সন্তুষ্ট হলেন।

বুদ্ধের দেহত্যাগের পূর্বে কিংবা পরে শোকাতুর আনন্দ কখনও কর্তব্য ভ্রষ্ট হননি। যে কোনও বিষয়, তিনি নির্ভুলভাবেই সম্পাদন করে এসেছেন।

এটাই আনন্দের কৃতিত্ব। তথাগতের দেহ-সংকার সম্বন্ধে বুদ্ধের নিকট তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন বলেই, মল্লরাজের প্রশ্নের সম্যক্ উত্তর প্রদানে সক্ষম হয়েছিলেন। আনন্দের বিচার-বুদ্ধির প্রখরতার এটা সবিশেষ পরিচায়ক।

(মহাপরিনির্বাণ সূত্র)

৫৪। সংগীতিতে আনন্দের স্থান লাভ—

জগজ্জ্যোতিঃ বুদ্ধ পরিনির্বাপিত হয়েছেন দু'সপ্তাহ অতীতের মুখে। চিন্তাযুক্ত হলেন মহামান্য মহাকশ্যপ। তাঁর মর্মস্থল বিদ্ধ করেছে নাপিত বংশজাত অন্যতর বৃদ্ধকালে প্রব্রজিত সুভদ্রের বিষময় উক্তি, বিষদিগ্ধ শরের মতো। সুভদ্র কি বলেছিলো? নির্বাণপ্রাপ্ত বুদ্ধকে লক্ষ্য করে শোকগ্রস্ত ভিক্ষুগণকে সে বলেছিলো---"ক্ষান্ত হও আয়ুষ্মান্‌গণ, কেন করবে শোক আর বিলাপ? মহাশ্রমণের কঠোর শাসন থেকে এখন আমরা মুক্ত হয়েছি। 'এটা করা উচিত, এটা অনুচিত' ব'লে কতো না করতেন জ্বালাতন---নিপীড়ন। তা থেকে এখন তো রক্ষা পেয়েছি। এবার থেকে যা কিছু করা---না করা, আমাদেরই ইচ্ছাধীন।"

মহাকশ্যপ চিন্তা করলেন---"হীনমতি ভিক্ষুরা সুভদ্রের একথা সমর্থন ও পক্ষাবলম্বনও করতে পারে। আহা, মনে হয়, অচিরেই লুপ্ত হয়ে যাবে সদ্ধর্ম। ভগবান এক সময় বলেছিলেন---'মহাকশ্যপই সদ্ধর্ম প্রতিষ্ঠাপন করবে।' সুতরাং আমাকেই যত্নশীল হতে হবে, যা'তে চিরস্থায়ী হয় ধর্ম-বিনয়।" এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে আহ্বান করলেন ভিক্ষুসংঘকে। তখন বুদ্ধের পরিনির্বাণ স্থানে সমাগত হয়েছিলেন সাতলক্ষ ভিক্ষু। এ মহাপরিষদে মহাকশ্যপ প্রকাশ করলেন সুভদ্রের অন্যায় উক্তি।

মহাকশ্যপের মুখে সুভদ্রের অজ্ঞোচিত উক্তি শ্রবণে ভিক্ষুসংঘ যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হলেন। এর বিরুদ্ধে মহাসংঘের মধ্যে প্রবলভাবে

সমালোচনা হলো। সকলকে সম্বোধন করে মহাকশ্যপ গাঢ় স্বরে বললেন---"-আয়ুষ্মান্ গণ, সুগত-দেশিত ধর্ম-বিনয় সংগ্রহ করবার এখন উপযুক্ত সময়। আমরা ধর্ম-বিনয় বিচয়ন করবো।"

মহাকশ্যপের এ কল্যাণকর প্রস্তাব সমবেত ভিক্ষুসংঘ সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করলেন। ভিক্ষুগণের অনুরোধে সংগীতির উপযুক্ত ভিক্ষু নির্বাচনে মহাকশ্যপ প্রবৃত্ত হলেন। ভিক্ষুদের মধ্যে যাঁরা ত্রিপিটক বিশারদ, ধর্ম-বিনয়ে গভীর জ্ঞানী, প্রতিসম্ভিদাপ্রাপ্ত, সুদক্ষ, বুদ্ধ-প্রদত্ত উপাধিমণ্ডিত, ত্রিবিদ্যা ও ষড়ভিজ্ঞাদি গুণযুক্ত মহানুভাব সম্পন্ন, তাদৃশ একূন পঞ্চশত অর্হৎ ভিক্ষু তিনি নির্বাচন করলেন। কিন্তু, তিনি আনন্দ স্থবিরের নাম উল্লেখ করলেন না। ভিক্ষুগণ মহাকশ্যপকে বিশেষভাবে অনুরোধ করলেন---"ভন্তে, আয়ুষ্মান্ আনন্দ ভগবানের সঙ্গে ছায়ার মতো বিচরণ করতেন। তিনি শাস্তার নিকট উত্তমরূপে ধর্ম-বিনয় শিক্ষা করেছেন। ধর্ম-বিনয়ে তিনি সুদক্ষ ও পণ্ডিত। তিনি তথাগতের প্রশংসালাভী ও অভিধামণ্ডিত। 'ধর্মভাণ্ডারাধ্যক্ষ' নামেই তিনি সর্বত্র প্রসিদ্ধ। সুতরাং তাঁকেও গ্রহণ করুন।" অতঃপর সর্বসম্মতিক্রমে স্থবির আনন্দকেও গ্রহণ করা হলো। এরূপে সংগীতিকারক মাত্র পাঁচশত ভিক্ষুই নির্দিষ্ট হলেন।

বিনয় চুল্লবর্গ)

৫৫। অর্হত্ব লাভ—

মহামহিম মহাকশ্যপের নির্দেশানুসারে মহারাজ অজাতশত্রু রাজগৃহের বেভার পর্বত-পার্শ্বে সপ্তপর্ণী গুহাদ্বারে অতি চমৎকার সুবৃহৎ এক ধর্ম-মণ্ডপ নির্মাণ করালেন। তথায় পঞ্চশত মহার্ঘ-আসন সজ্জিত করা হলো। মণ্ডপের মধ্যস্থলে বিচিত্র ধর্মাসন স্থাপন করা হলো, চারুশিল্প সমলঙ্কৃত মহার্হ গরিষ্ঠ সিংহাসনের মতো। সংগীতি মণ্ডপের সর্বকার্য সুসম্পন্ন হলে রাজা মহাকশ্যপকে একথা নিবেদন করলেন। তিনি ভিক্ষুগণের নিকট ঘোষণা করলেন---"আয়ুষ্মানগণ, সংগীতি মণ্ডপ সম্পন্ন হয়েছে, আগামী

কল্য যথাসময়ে সংগীতি আরম্ভ হবে। তজ্জন্য সকলেই প্রস্তুত থাক্‌বেন।"

ভিক্ষুগণ আনন্দকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে বললেন---"আয়ুষ্মান আনন্দ, আগামী কল্য থেকে সংগীতির অধিবেশন আরম্ভ হবে। আপনার কিন্তু, এখনও শেষ হয়নি করণীয় কাজ। অর্হৎ না হয়ে ধর্ম-সভায় যোগদান করা আপনার পক্ষে উচিত হবে কি? বন্ধু, বীর্যবানের পক্ষে সবই সম্ভব।"

ভিক্ষুদের একথা আনন্দের মর্ম-স্পর্শ করলো। তখন কেঁপে উঠ্‌লো তাঁর অন্তর। ব্যগ্র চিত্তে তিনি চিন্তা করলেন---"কাল তো আমাকে ধর্মসভায় যোগদান করতে হবে। সমীচীন হবে কি এ অবস্থায় যোগদান করা? নিশ্চয়ই আমাকে অর্হৎ হয়ে যোগদান করতে হবে। আমার সম্মুখে এখনও পড়ে রয়েছে মহাকর্তব্য। আমাকে ব্রতী হতে হবে কঠোর সাধনায়, নিতে হবে দৃঢ়বীর্যের আশ্রয়। সময় তো মাত্র একরাত্রি। এরি মধ্যে করতে হবে তৃষ্ণাক্ষয়।" এ চিন্তা করেই আনন্দ 'কায়গত-স্মৃতি' ভাবনায় মনোযোগী হলেন। ধেয় বিষয়ে গভীর মন-সংযোগ করে চঙ্ক্রমণে রত হলেন। তদ্‌গত চিত্তে পূর্ণোদ্যমে তৎপর রন সারারাত্রি অবিশ্রান্ত সাধনায়। সে যে কী প্রচেষ্টা, কী তন্ময়তা, তা অনির্বচনীয়! এরূপ উদ্যম তাঁর জীবনে এ'ই প্রথম।

নিশা অবসান প্রায়। ক্ষণকাল পরেই হবে ঊষার আবির্ভাব। স্থবির তন্ময় হয়েই আছেন গভীর ধ্যানে। অবসান হয়ে এলো বিনিদ্র-রজনী। তবুও অজ্ঞাত রয়ে গেলো সাধনার চরম সীমা। অহো দুঃখ, মর্ম-বেদনায় তাঁর হৃদয় যেন বিদীর্ণ হতে চায়। অসীম দুঃখের সহিত চিন্তা করলেন তিনি---"আর কতক্ষণ? সময় যে আসন্ন প্রায়। কিছুক্ষণ পরেই তো সংগীতির অধিবেশন আরম্ভ হবে। এখনও তো আমি অনাসব হতে পারলাম না! পরমারাধ্য ভগবান বলেছিলেন---'আনন্দ, অচিরেই তুমি তৃষ্ণাক্ষয় করবে।' তবে আর কখন? কখন সার্থক হবে সে অমোঘবাণী? অহো, বড়ো লজ্জা! কোন্ মুখে আমি সভায় গিয়ে বসবো? বড়ো শ্রান্ত হয়ে পড়েছি। খুব ক্লান্তি বোধ হচ্ছে, একটু বিশ্রাম করে নিই।"

তখন আনন্দ হতাশার মর্ম-বেদনা নিয়ে চঙ্ক্রমণস্থান ত্যাগ করলেন।

চোখে শীতল জলের ঝাপ্‌টা দিয়ে ভালোরূপে ধৌত করলেন হস্ত-পদ। শীতল-বারি স্পর্শে শরীর ও মনের অবসাদ অনেকটা বিদূরিত হলো। তিনি একটু শান্তি অনুভব করলেন। ভাবনার প্রতি আবার চিত্ত নমিত হয়ে পড়লো। প্রবলভাবে বর্ধিত হলো একাগ্রতা। গাঢ়তররূপে ভাবনায় চিত্ত সংযোগ রেখে প্রবেশ করলেন শয়ন-প্রকোষ্ঠে।

তখন আবির্ভূত হলো উষা। মধুর পিউ পিউ রবে পাপিয়া গাইতে লাগলো উষার আগমনী। সুকণ্ঠ পিকের প্রাণ-মাতানো সুতান লহরীতে চারদিক মুখর হয়ে উঠলো। রাজগৃহে যেন অকাল-বসন্ত নেমে এলো। তখন আনন্দের যেন মনে হচ্ছে—কোনো অচিন-দেশের প্রাণ-জুড়ানো মোহন-সুর অমৃতের শতধারা বহন করে বায়ু-তরঙ্গে ভেসে আসছে। শান্ত-স্নিগ্ধ পরমামৃতের পরশ লাগলো যেন তাঁর মর্মস্থলে। অপূর্ব আলোর আকুল করা রশ্মিসম্পাতে তাঁর হৃদয়-গুহা যেন আলোকময় হয়ে ওঠছে। এমন সময়ে গভীর ধ্যান-তন্ময় আনন্দ অর্ধনিমীলিত চোখে এসে বসলেন মঞ্চোপরি। শয়নোদ্দেশ্যে ভূমিতল হতে পদদ্বয় ওঠাচ্ছেন, হেলে পড়ছেন উপাধানে শির রাখার ইচ্ছায়, ঠিক এমন সময়েই তাঁর চিত্ত হলো তৃষ্ণামুক্ত। ষড়াভিজ্ঞায় হলেন বিমণ্ডিত। অপূর্ব আলোকে উদ্ভাসিত হলো হৃদয়-কন্দর। প্রীতি-প্রশান্তিতে অন্তর হলো পরিপূর্ণ। মহাশূন্যের মাধ্যমে তিনি উপলব্ধি করলেন মহাপূর্ণতা। নির্বাপিত হলো ক্লেশাগ্নি; সন্তাপ হলো উপশান্ত।*

ত্যাগের চরম সীমা বড়োই মধুর। ক্ষয়-বিরাগের পূর্ণপরিণতি পরমামৃতের উৎস। ভোগের যে আস্বাদ বা আনন্দ, তা যে কতো ক্ষণিক, কতোই অকিঞ্চিৎকর, নব নব তৃষ্ণা সৃজনের পরিণাম যে কতোই ভীষণ, আজ তা সম্যক্ উপলব্ধি করলেন আনন্দ। দুঃখের জনয়িত্রী লেলিহান তৃষ্ণা-রাক্ষসীকে প্রজ্ঞাস্ত্রে সংহার করে অর্হৎ-আনন্দের অন্তরে আজ কী যে সুখ, কী যে শান্তি, কী যে আনন্দ উৎপন্ন হয়েছে, তা অনির্বচনীয়! একমাত্র তা উপলব্ধি করতে পারেন সম পর্যায়ের সাধকগণ। এবম্বিধ সুখ-শান্তি একমাত্র নির্বাণ ব্যতীত আর অন্য কোথাও মিলে না।

* আনন্দের অর্হত্ব লাভ খ্রীষ্ট পূর্ব ৫৪৫ অব্দের শ্রাবণী পূর্ণিমা।

আনন্দের অর্হত্ব লাভ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, অপূর্ব ও অদ্বিতীয়। শায়িত অবস্থায়ও নয়, উপবিষ্ট অবস্থায়ও নয়, স্থিতাবস্থায়ও নয় এবং গমনাগমন অবস্থায়ও নয়। এই ঈর্যাপথ চতুষ্টয়ের কোনও এক অবস্থার আশ্রয় না নিয়ে অর্হৎ হয়েছেন একমাত্র আনন্দ স্থবির। অন্য কারও এরূপ বৈচিত্র্যময় অর্হত্ব লাভের কথা এ বুদ্ধ-শাসনে দৃষ্ট হয় না। তৃষ্ণাক্ষয়ের পর আনন্দের অন্তরে প্রবলভাবে তরঙ্গায়িত হতে লাগলো অনুপম প্রীতিলহরী। উচ্ছ্বসিত হলো প্রীতি-বেগ। এমন সময়েই তাঁর মধুর কণ্ঠে ধ্বনিত হলো এ প্রীতি-গাথা---

১। "বহুশ্রুত, বিচিত্র কথিক, বুদ্ধের সেবক
গৌতম-গোত্রীয় আনন্দ শয়ন-মুহূর্তে
চকিতে অর্হৎ হলেন। পঞ্চ স্কন্ধ-ভার,
যোগ চতুষ্টয়* হতেও বিমুক্ত হলেন।

২। ক্ষীণাসব, যোগছিন্ন, ক্লেশ-নির্বাপিত,
তৃষ্ণা-মুক্ত ও জন্ম-মৃত্যুর পরপার প্রাপ্ত
আনন্দ হয়েছেন অন্তিম-দেহে উপনীত।"

মহামান্য আনন্দের অর্হত্ব লাভে সহম্পতি মহাব্রহ্মা সন্তোষ প্রকাশ মানসে এ প্রীতি-গাথা ভাষণ করলেন---

"আদিত্য-বন্ধু বুদ্ধের ধর্ম যিনি জ্ঞাত,
গৌতম-গোত্রীয় সে আনন্দ হয়েছেন
অনুপাদিশেষ নির্বাণ-পদে অধিষ্ঠিত।"

(বিনয় চুল্লবর্গ ও থেরগাথা বর্ণনায় আনন্দ)

---

* কাম, ভব, মিথ্যাদৃষ্টি ও অবিদ্যাযোগ।

৫৬। সংগীতি মণ্ডপে আনন্দ—

এক

মহামহিম মহাকশ্যপের নির্দেশে যথাসময়ে সংগীতি মণ্ডপে সংগীতি-কারক ভিক্ষুগণ সমবেত হলেন। অনুক্রমে যথোপযুক্ত আসনে প্রত্যেকে উপবিষ্ট হলেন। একমাত্র আনন্দের আসনই শূন্য রয়ে গেলো। তিনিই একমাত্র অনুপস্থিত। সভায় প্রশ্ন ওঠলো---"কার এ শূন্য আসন?" উত্তর হলো---"আনন্দ স্থবিরের।" আবার প্রশ্ন হলো---"কোথা গেলেন তিনি?"

দিব্যজ্ঞানী আনন্দ তখনই তা জ্ঞাত হয়ে চিন্তা করলেন---"সংগীতি সভায় উপস্থিত হবার এ'ই উপযুক্ত সময়। আমার তৃষ্ণাক্ষয় সম্বন্ধে সকলকে জানাতে হবে।" এ চিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ধ্যানশক্তির প্রভাবে জলে মগ্ন হওয়ার মতো সেখানেই মৃত্তিকাগর্ভে মগ্ন হয়ে পলকের মধ্যে সংগীতি মণ্ডপে নির্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হয়ে নিজকে প্রকাশ করলেন। আনন্দের প্রসঙ্গ উত্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেলো, তাঁর আসনে তিনি সমাসীন হয়েই আছেন। এতেই সকলে বিদিত হলেন---"আনন্দ অভিজ্ঞান সম্পন্ন অর্হৎ হয়েছেন।"

'ধ্যানীর ধ্যান-বিষয় অচিন্তনীয়' এটা তথাগত বুদ্ধের বাণী। আনন্দ যখন সুদূর অতীতে রাজকুমার সুমনরূপে জন্মেছিলেন, তখন পদুমোত্তর বুদ্ধের প্রধান সেবক সুমন স্থবিরকে ধ্যানবলে পৃথিবীগর্ভে নিমগ্ন হতে দেখে তিনি বিস্ময়াবিষ্ট হয়েছিলেন। এ আশ্চর্য ঘটনাই তাঁর অন্তরে গভীর রেখাপাত করেছিলো, জাগিয়ে তুলেছিলো তীব্র প্রেরণা, খুলে দিয়ে-ছিলো সৌভাগ্য-দ্বার, ঊর্ধ্বমুখী করে ফিরিয়ে দিয়েছিলো কর্ম-চক্রের গতিবেগ। সে মুহূর্তেই তিনি কামনা করেছিলেন গভীর শ্রদ্ধান্বিত চিত্তে---"আমিও যেন একদিন হতে পারি এরূপ মহাশক্তির অধিকারী।"

যে আশ্চর্য দৃশ্য একদিন তাঁর অন্তরে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিলো, আজ কিন্তু, তাঁর পক্ষে সেই জটিল বিষয়টা অতি সহজ হয়েই দাঁড়িয়েছে। অসাধ্য

হয়েছে সাধ্যায়ত্ত। একদিন তাঁকে আলো দান করেছিল যেই অচিন্তনীয় ঋদ্ধিশক্তি, আজ অর্হৎ হয়ে সর্বপ্রথম তা'ই অবলম্বন করে তিনি আত্মপরিচয় দান করলেন। জগতে সাধনার শক্তি অতুলনীয়। সাধনাই মানুষকে শ্রেষ্ঠত্বের চরম সীমায় উপনীত করে।

স্বীয় আসনে আত্মপ্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গেই আনন্দ মধুর কণ্ঠে এই প্রীতি-গাথা ভাষণ করলেন---

১। 'স্রোতাপন্ন অবস্থায়---
ছিলাম আমি পঁচিশ বছর।
এরি মাঝে কোনো দিন কামরাগ-দ্বেষ,
অন্তরে আমার হয়নি উদয়।
দেখুন,
নৈর্বাণিক ধরমের মহিমা কেমন!

২। বছর পঁচিশ অবধি---
বুদ্ধের করিনু সেবা।
কায় বাক্য মনে, মৈত্রীময় চিতে,
সতত ছিলাম সেবায় নিরত।
বিচরণ করেছি সদা তাঁর সনে,
অনুগামিনী ছায়ার মতো।

৩। দেশ-বিদেশের মানুষেরা যবে,
বুদ্ধ-দরশনে হন্ সমাগত,
আমার অনুরোধে---
তাঁদের সবারে তথাগত দিয়েছেন দেখা।
চক্ষুষ্মান্ সুগত অনুরোধ আমার
উপেক্ষা করেন নি কোনো দিন।

৪। সুগতের চঙ্ক্রমণ কালে,
তাঁর পিছনে পিছনে,
আমিও করেছিলাম অনুচঙ্ক্রমণ।

বুদ্ধের অমৃত-বাণী শুনেছি তখন,
সত্য-ধর্মে লাভ হলো জ্ঞান।
৫। পেয়েছি এখন---
সম্বুদ্ধের সম্যক্ পরিচয়।
সুগত-শাসনে---
কৃতকার্য হয়েছি এখন;
হয়েছি বিমুক্ত---
পঞ্চ-স্কন্ধের গুরুভার থেকে।
জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহ আমার
চিরতরে রুদ্ধ হয়েছে এবার।

অর্হৎ আনন্দের প্রীতি-বাণী শুনে সংগীতিকারক ভিক্ষুগণ অত্যধিক প্রসন্ন হলেন। তাঁর মর্ম-বাণী সকলেই সাধুবাক্যে অনুমোদন করলেন। সেই সাধু-ধ্বনির শব্দতরঙ্গ সংগীতি-মণ্ডপ মুখর করে তুল্‌লো।

দুই

অতঃপর পূজার্হ মহাকশ্যপ ধর্মসভায় সমাগত ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন---"আয়ুষ্মান্‌গণ, এই শুভক্ষণে সংগীতির কার্য আরম্ভ করা হোক। এ পবিত্র অবিস্মরণীয় সংগীতির উপরই নির্ভর করবে সদ্ধর্মের আয়ু ও বিশুদ্ধতা। তৎপ্রতি সকলেই অবহিত হোন। এ সংগীতি মণ্ডপে সমাগত পঞ্চশত ভিক্ষু সকলেই ষড়ভিজ্ঞ অর্হৎ; সুবুদ্ধ দেশিত ও প্রজ্ঞাপিত ধর্ম-বিনয়ে সকলেই সুদক্ষ ও বিশেষজ্ঞ। যা'তে এ সংগীতি হয় সুষ্ঠুরূপে সাফল্য মণ্ডিত, তৎপ্রতি সকলেই হবেন মনোযোগী। আমাদের সুশৃংখলার সহিত চয়ন করতে হবে ধর্ম ও বিনয়। প্রথম আমরা সংগ্রহ করবো বিনয়। সমবেত ভিক্ষুসংঘ যদি অনুমোদন করেন, তা হলে আমি তথাগতের প্রশংসা লাভী এবং 'বিনয় ধরের অগ্রগণ্য' উপাধি-ভূষিত আয়ু-

শ্মান্ উপালি স্থবিরকে বিনয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করতে পারি।'' *

নায়ক মহাস্থবির মহাকশ্যপের প্রস্তাব সকলে সর্বান্তঃকরণে অনুমোদন করলেন। সর্ব-সম্মতিক্রমে তিনি স্থবির উপালিকে বিনয়ের এক একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন। উপালিও নিপুণ কণ্ঠে সুষ্ঠুরূপে প্রদান করলেন প্রত্যেক প্রশ্নের সম্যক্ উত্তর। এরূপে বিনয় চয়ন সুসম্পন্ন হলে সকলেই সানন্দে তিনবার সাধুবাক্যে অনুমোদন করলেন।

তদনন্তর মহাকশ্যপ সংগীতি কারক ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বললেন--''আয়ুষ্মান্গণ, আপনারা যদি অনুমোদন করেন, তা হলে আমি সম্বুদ্ধের প্রশংসা লাভী এবং 'বহুশ্রুত ও স্মৃতিমানের অগ্রগণ্য' অভিধামণ্ডিত ধর্মরত্ন-কোষের প্রধান অধ্যক্ষ আয়ুষ্মান্ আনন্দ স্থবিরকে ধর্ম সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারি।''

মহাকশ্যপের এ উত্তম প্রস্তাব সকলেই সর্বান্তঃকরণে অনুমোদন করলেন। তথা আনন্দ স্থবিরও গ্রহণ করলেন সকলের অনুমোদন। সর্বসম্মতিক্রমে প্রজ্ঞাবান্ মহাকশ্যপ মহাপণ্ডিত আনন্দকে ধারাবাহিকরূপে সুচিন্তিত প্রশ্ন সমূহ জিজ্ঞাসা করতে আরম্ভ করলেন---''বন্ধু আনন্দ, কোথায় ভাষিত হয়েছিল 'ব্রহ্মজাল' সূত্র?''

প্রত্যুত্তরে আনন্দ বললেন---''ভন্তে, নালন্দা ও রাজগৃহের মধ্যপথে, রাজগৃহের অন্তর্গত আম্রলষ্ঠিকায়।'' ;

মহাকশ্যপ---কা'কে উপলক্ষ করে?

আনন্দ---সুপ্রিয় পরিব্রাজক ও তার শিষ্য ব্রহ্মদত্তকে।

তৎপর অনুক্রমে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি ব্রহ্মজাল সূত্রের নিদানাদি সর্ববিষয়। আনন্দও প্রদান করলেন সুন্দর-সম্যক্ প্রত্যুত্তর। এ উপায়ে মহাকশ্যপ জিজ্ঞাসা করলেন 'শ্রামণ্যফল' সূত্রাদি পঞ্চনিকায়ের সমস্ত বিষয় এবং তৎসঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে সংশ্লিষ্ট জটিল তত্ত্বপূর্ণ বিশিষ্টধর্ম অভিধর্ম।

* বুদ্ধের পরিনির্বাণের তিন মাস পরে, বর্ষাবাসের দ্বিতীয় মাসে, শ্রাবণী পূর্ণিমায় সংগীতির কর্ম আরম্ভ হয়। খ্রীষ্টপূর্ব ৫৪৫ অব্দ।

আনন্দ অতি বিচক্ষণতার সহিত প্রদান করলেন প্রতি-প্রশ্নের সম্যক্ উত্তর।

এরূপে ধর্ম ও বিনয় সংগ্রহ করতে সাতমাস সময়ের প্রয়োজন হয়েছিলো। সপ্ত মাসান্তে সংগীতির পূর্ণ পরিসমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই ভিক্ষুগণ বারত্রয় সাধুবাক্যে অনুমোদন করলেন। এই সুগম্ভীর পুণ্য-পূত সাধু-ধ্বনি সংগীতি-মণ্ডপ মুখর করে তুলল। সে মুহূর্তে থর-থর কম্পিত হলো মহাপৃথিবী, দেব-দুন্দুভি হলো নিনাদিত। ইতিহাসের বুকে গাঢ়তর রেখাপাত করল এই অবিস্মরণীয় দীপ্তোজ্জ্বল পুণ্যাবদান।

মহামনীষী আনন্দের অর্হত্ব লাভে এবং ধর্ম ভাষণে বিচক্ষণতা, বাক্-পটুতা ও সুকণ্ঠের মধুরতায় প্রসন্ন হয়ে সংগীতিকারক স্থবিরগণ তাঁর এরূপ প্রশংসা কীর্তন করলেন---

১। "ত্রিলোকের মহাচক্ষু মহর্ষি বুদ্ধের
ধর্ম-রত্নকোষের অধ্যক্ষ, বহুশ্রুত,
ও ধর্মধর আনন্দ তৃষ্ণামুক্ত হয়ে
বিদূরিত করেছেন অবিদ্যান্ধকার।
২। অসদৃশ জ্ঞান-গতিমান্, স্মৃতিমান্,
ধৃতিমান্ ও সদ্ধর্ম-ধারক যে ঋষি,
সে আনন্দই সদ্ধর্ম-রত্নের আকর।"

তিন

অপরাধ স্বীকার—

১। আয়ুষ্মান্ আনন্দ সংগীতি কারক স্থবিরগণকে বললেন—"ভন্তে সংঘ, তথাগত পরিনির্বাণ প্রাপ্তির পূর্বক্ষণে আমায় বলেছিলেন---'আনন্দ, আমার অবর্তমানে সংঘ যদি ইচ্ছা করে, তা হলে ক্ষুদ্র ও অপ্রধান বিধিসমূহ বর্জন করুক।"

তখন স্থবিরগণ জিজ্ঞাসা করলেন---"বন্ধু আনন্দ, তুমি কি শাস্তাকে

জিজ্ঞাসা করেছিলে, কোন্‌গুলি ক্ষুদ্র ও অপ্রধান বিনয়-বিধি? *

"না ভন্তে, আমি জিজ্ঞাসা করি নি।"

"বন্ধু আনন্দ, এটা তোমার দুষ্কৃতি হয়েছে। যেহেতু, তুমি সুগতের নিকট জিজ্ঞাসা করো নি—কোন্‌গুলি ক্ষুদ্র ও অপ্রধান বিনয়-বিধি। তোমার এ অপরাধ স্বীকার করো।"

আনন্দ বিনম্রবাক্যে বললেন—"ভন্তে, তখন তা' অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করতে পারি নি বলে জিজ্ঞাসা করি নি। এতে তো আমার দুষ্কৃতি দেখ্‌ছি না; তবুও ভন্তে, ভক্তির সহিত স্বীকার করছি অপরাধ, আমার দুষ্কৃতি হয়েছে।"

২। "বন্ধু আনন্দ, তুমি ভগবানের বর্ষা-বাসিক চীবর পায়ের নীচে আটক করে শেলাই করেছিলে, এটাও তোমার দুষ্কৃতি হয়েছে। তোমার সে অপরাধ স্বীকার করো।"

"ভন্তে, আমি যে অগৌরব করে এরূপে শেলাই করেছি, তা' নয়। সুতরাং এতে আমার দোষ দেখছি না; তবুও নতশিরে স্বীকার করছি অপরাধ।"

৩। "সৌম্য আনন্দ, তথাগতের পবিত্র-দেহ বন্দনার জন্য প্রথমেই তুমি স্ত্রীলোকদের সুযোগ দান করেছিলে। ক্রন্দন পরায়ণা নারীদের চোখের জলে তথাগতের দেহ অবলিপ্ত হয়েছিলো। এটাও দুষ্কৃতি হয়েছে তোমার। সে অপরাধ তুমি স্বীকার করো।"

"ভন্তে, তখন অসময় বলে এরূপ করেছিলাম। এতে আমার দোষ

* ক্ষুদ্র ও অপ্রধান বিনয়-বিধি নিয়ে সংগীতি-সভায় বিবিধ মতের সৃষ্টি হলে, তখন মহাকশ্যপ সংঘকে জ্ঞাপন করলেন—"সৌম্য ভিক্ষুসংঘ, ভগবান তথাগত ভিক্ষুসংঘের শৃংখলা বিধান কল্পে এবং সংযম ও আত্মশুদ্ধির উৎকর্ষ সাধন মানষে যে সব বিনয়-বিধি প্রজ্ঞাপ্ত করেছেন, তাঁর সুচিন্তিত প্রজ্ঞাপিত বিধি-সমূহ বর্জন করা উচিত হবে না এবং অপ্রজ্ঞাপ্ত বিধিও প্রজ্ঞাপ্ত করা ন্যায় সংগত হবে না। বরং তথাগতের প্রজ্ঞাপিত বিধি সমূহ সগৌরবে প্রতিপালন করাই উচিত হবে।" মহাকশ্যপের এবম্বিধ যুক্তিপূর্ণ বাক্য সর্বান্তঃকরণে অনুমোদন করলেন মহাসংঘ।

দেখ্‌ছি না। তথাপি ভক্তি-নতশিরে স্বীকার করছি অপরাধ।"

৪। "বন্ধু আনন্দ, ভগবান তোমাকে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করেছিলেন, প্রকাশ্যরূপে দিয়েছিলেন আভাস, তবুও তুমি তাঁকে কল্পকাল অবস্থানের জন্য প্রার্থনা করো নি। অনুরোধ করোনি যে---'ভগবন্, বহুজনের হিত-সুখার্থ ও জগতের প্রতি অনুকম্পা করে কল্পকাল স্থিত থাকুন।" এটাও তোমার দুষ্কৃতি হয়েছে। সে অপরাধ তুমি স্বীকার করো।"

"ভন্তে, তখন মারের প্রভাবে আমার চিত্ত অভিভূত হয়েছিলো। তাই প্রার্থনা করতে পারি নি। এতে আমার দোষ দেখ্‌ছি না, তবুও ভক্তি-নতশিরে স্বীকার করছি অপরাধ।"

৫। "সৌম্য আনন্দ, তথাগত প্রবেদিত ধর্ম-বিনয়ে মাতৃজাতিকে প্রব্রজ্যা দানের জন্য সুগতকে প্রার্থনা করেছিলে এবং তজ্জন্য তাঁকে উৎসাহিত ও নিয়োজিত করেছিলে। এটাও তোমার দুষ্কৃতি হয়েছে। সে অপরাধ তুমি স্বীকার করো।"

"ভন্তে সংঘ, মহাপ্রজাপতী গৌতমী সুগতের মাতৃষ্বসা, পোষণ কারিণী, স্তন্যদায়িনী, শরীর বর্ধনকারিণী। তাই ভন্তে, মাতৃজাতিকে প্রব্রজ্যা দানের জন্য তাঁকে আমি উৎসাহিত ও নিয়োজিত করেছিলাম। এতে আমার দোষ দেখ্‌ছি না। তবুও ভন্তে সংঘ, ভক্তিপূর্ণ-নতশিরে অপরাধ স্বীকার করছি।"

চার

ছন্নকে ব্রহ্মদণ্ড দানের প্রস্তাব—

অতঃপর আনন্দ সংগীতিকারক স্থবিরগণকে বল্‌লেন---"তথাগত পরিনির্বাণ লাভের পূর্বক্ষণে আমায় বলেছিলেন---'হে আনন্দ, আমার দেহত্যাগের পর সংঘ যেন ভিক্ষু ছন্নকে* ব্রহ্মদণ্ড প্রদান করে।"

* ইনি গৃহীকালে 'ছন্দক' নামে পরিচিত ছিলেন। ইনিই ছিলেন সিদ্ধার্থ কুমারের রথের সারথি।

প্রশ্ন হলো---"সৌম্য আনন্দ, ভগবানকে তা জিজ্ঞাসা করেছো কি, ব্রহ্মদণ্ডের কিরূপ বিধান?"

"হ্যাঁ ভন্তে, জিজ্ঞাসা করেছি। সুগত বলেছেন--'আনন্দ, ছন্নভিক্ষু যথেচ্ছা বাক্য প্রয়োগ করলেও, ভিক্ষুরা যেন ওকে কিছুই না বলে, না দেয় যেন উপদেশ, না করে যেন অনুশাসন।"

স্থবিরগণ বললেন---"তা হলে বন্ধু আনন্দ, ছন্ন ভিক্ষুকে তুমিই ব্রহ্মদণ্ডের আদেশ করো।"

"ভন্তে, ছন্ন ভিক্ষুর স্বভাব বড়ো চণ্ড ও পরুষ। সুতরাং তাকে কি প্রকারে আদেশ করবো?"

"তা হলে বন্ধু আনন্দ, বহু সংখ্যক ভিক্ষু সঙ্গে নিয়ে যাও।"

তখন ছন্নভিক্ষু কৌশাম্বীতে অবস্থান করছিলেন। স্থবির আনন্দ পাঁচশত ভিক্ষু সঙ্গে নিয়ে নৌকা যোগে কৌশাম্বী অভিমুখে যাত্রা করলেন। যথাসময়ে কৌশাম্বী সম্প্রাপ্ত হয়ে সকলেই নৌকা থেকে অবতরণ করলেন এবং গন্তব্য স্থান অভিমুখে অগ্রসর হলেন। তাঁরা কিছুদূর গিয়ে বিশ্রাম করার মানসে উদয়ন রাজার প্রমোদ কাননের সন্নিকটে কোনও এক বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট হলেন।

৫৭। উত্তরীয় বস্ত্রলাভ—

তখন কৌশাম্বীর অধিপতি মহারাজ উদয়ন অন্তঃপুরিকা সমভিব্যাহারে প্রমোদ উদ্যানে পরিভ্রমণ করছিলেন। রাজাঙ্গনাগণ শুনতে পেলেন, মহামান্য মহাপণ্ডিত আনন্দ উদ্যানের অনতিদূরে এক বৃক্ষমূলে সমাসীন আছেন। তাঁরা রাজাকে অনুরোধ করলেন---"মহারাজ, মহাজ্ঞানী আনন্দ বহু ভিক্ষুসহ ওই অদূরে বৃক্ষ-ছায়ায় বসে আছেন। দেব, আমরা আর্য আনন্দের দর্শন লাভের ইচ্ছা করি।"

রাজা বললেন---"ইচ্ছা করলে যেতে পারো।"

রাজার অনুমতি পেয়ে রাজমহিলাগণ সন্তুষ্ট মনে আনন্দ সমীপে উপনীত

হলেন। বন্দনান্তে তাঁরা একান্তে উপবেশন করলে স্থবির তাঁদের ধর্মোপদেশ পরিবেষণ করলেন। রাজমহিষীরা আনন্দকে দর্শনে ও প্রাণস্পর্শী তাঁর ধর্ম শ্রবণে অত্যধিক প্রসন্ন হলেন। বলবতী শ্রদ্ধায় অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁরা আনন্দকে মহার্ঘ পঞ্চশত উত্তরীয় বস্ত্র * দান করলেন।

অতঃপর মহিলাগণ প্রত্যাবর্তন করলে নৃপতি জিজ্ঞসা করলেন---"তোমরা আনন্দের দর্শন পেয়েছো তো?"

"হাঁ মহারাজ, পেয়েছি।"

"তাঁকে কিছু দান করলে না?"

"হাঁ মহারাজ, করেছি বৈ কি, তাঁকে আমরা পঞ্চশত, উত্তরীয় বস্ত্র দান করেছি।"

রাজা সবিস্ময়ে ললাট কুঞ্চিত করে বললেন---"পঞ্চশত উত্তরীয় বস্ত্র! এতো গুলি বস্ত্র কেন তিনি গ্রহণ করলেন? ব্যবসা করবেন না কি?"

রাজা উদয়ন কৌতূহলী হয়ে তখনই স্থবির আনন্দের নিকট উপস্থিত হলেন এবং যা প্রশ্ন করলেন, আনন্দও যা উত্তর দিলেন, তা প্রাগুক্ত 'বস্ত্র লাভ' (৮) নিবন্ধে কোশল রাজ ও আনন্দের প্রশ্নোত্তর অনুরূপ জ্ঞাতব্য।

নৃপতি উদয়ন মতিমান্ আনন্দের অপূর্ব ভাষণ শুনে অত্যধিক চমৎকৃত ও বিমুগ্ধ হলেন। এতে রাজার প্রবল দান-চেতনা উৎপন্ন হলো। তিনিও পঞ্চশত মূল্যবান বস্ত্র দান করলেন।

পুণ্যশ্লোক আনন্দ স্রোতাপন্ন অবস্থায় একবার লাভ করেছিলেন কোশলরাজ ও তদীয় মহিষীদের প্রদত্ত সহস্রখণ্ড বস্ত্র, অর্হত্ব লাভের পর পুনরায় আজ প্রথম লাভ করলেন সহস্রখণ্ড বস্ত্র। আনন্দের এ সৌভাগ্য---নিশ্চয়ই তাঁর প্রাক্তন পুণ্যকর্মের অপরিহার্য প্রভাব।

পুণ্যবানগণ স্বভাবতই এবম্বিধ পুণ্যঋদ্ধি সম্পন্ন হয়ে থাকেন। পুণ্যসম্পদ অপরে কখনও আত্মসাৎ করতে পারে না; চোরেও পারে না অপহরণ করতে। ছায়ার মতোই সতত কুশল-কর্মীর অনুসরণ করে।

* মনে হয়, রাজাঙ্গনাগণ কোনো দিকে যাবার সময় গায়ের উপর যেই মূল্যবান উড়ানী কাপড় খানা দিয়ে যায়, তা-ই উত্তরীয়।

পুণ্যাশ্রয়ীকে স্বতঃই দিব্য-শক্তিতে শক্তিশালী করে তোলে। সুখানন্দে ভবিষ্যৎ জীবনকে করে সমুজ্জ্বল। পরিশেষে দান করে অচ্যুত নির্বাণের পরা-শান্তি।

বিঃ চুল্লবর্গ)

৫৮। ছন্নকে ব্রহ্মদণ্ড দান—

নরপতি উদয়নের প্রস্থানের পর স্থবির আনন্দ ভিক্ষুগণসহ ঘোষিতারামে উপনীত হলেন। আনন্দের দর্শন পেয়ে ছন্নভিক্ষু অতিশয় সন্তুষ্ট হলেন। বন্দনান্তে তিনি আনন্দের অতি নিকটে এসেই বসলেন। স্থবির তাঁকে বললেন—"বন্ধু ছন্ন, ভিক্ষুসংঘ তোমার প্রতি ব্রহ্মদণ্ডের অনুজ্ঞা করেছেন।"

ছন্ন ব্যগ্র হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"ভন্তে, ব্রহ্মদণ্ড কিরূপ?"

আনন্দ বললেন—"তোমার বাক্যাবলী অন্যায় ও অযুক্তিকর। কর্কশ, নিষ্ঠুর ও উদ্ধত বাক্য বলে অন্যকে মনঃপীড়া দিয়ে থাকো। সুতরাং আজ থেকে তুমি যথেচ্ছা বাক্য প্রয়োগ করলেও, তজ্জন্য ভিক্ষুসংঘ তোমায় কিছুই বলবেন না, কোনও উপদেশ বা অনুশাসনও করবেন না।"

সংঘের এ আদেশ শল্যসম বিদ্ধ করলো ছন্নের মর্মস্থল। তিনি দুঃসহ মর্ম-বেদনায় হলেন ব্যথিত, পীড়িত ও মর্মাহত। ক্ষোভে, দুঃখে, অপমানে হলেন জর্জরিত। তাঁর দু'গণ্ড বেয়ে অশ্রু ঝরতে লাগলো। তিনি বাষ্প-রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন—"ভন্তে আনন্দ, আমায় হত করবেন না। যেহেতু, ভিক্ষুসংঘ এখন থেকে আমাকে কিছুই বলবেন না, কোনও উপদেশ অথবা অনুশাসন করবেন না।" এতদূর বলেই তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে ভূতলে পড়ে গেলেন।

তারপর কি হলো? ব্রহ্মদণ্ডে দণ্ডিত, বিচলিত ও মর্মাহত ছন্ন নিজকে দিলেন শত ধিক্কার। আত্মগ্লানিতে তাঁর অন্তর হলো ভারাক্রান্ত। সংক্ষুব্ধ হৃদয়ে তিনি চিন্তা করলেন—"সিদ্ধার্থ আমার সহজাত, বাল্যবন্ধু, অন্তরঙ্গ,

প্রাণাধিক প্রিয়, মমতা ছিলো তাঁর প্রতি প্রগাঢ়। তাঁরই ছিলাম আমি রথের সারথি। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে বিচরণ করেছি, ছায়ার মতো। তাঁর অভিনিষ্ক্রমণের আমিই একমাত্র সহায়। তাঁর সংসার ত্যাগে— আমিও হয়েছি সংসার ত্যাগী। আমার বন্ধুই 'সম্যক্ সম্বুদ্ধ', জগৎপূজ্য। তাই আত্মশ্লাঘায় পূর্ণ হয়েছিলো আমার অন্তর; আত্মাভিমানে হয়েছিলাম স্ফীত-উচ্ছ্বসিত। এ'ই আমার পরিহানির মূল কারণ। এ হেতুই আমি তথাগত প্রবেদিত সত্য-ধর্ম উপলব্ধি করতে পারি নি। আমার একান্ত হিতৈষী ও আশ্রয়স্থল ভগবানও এখন নির্বাপিত। আমি হয়েছি এখন সর্বহারার মতো। তদুপরি দণ্ডিত, লাঞ্ছিত, বিধ্বস্ত ও অবজ্ঞাত। ধিক্ এ জীবনে। সাধন করতে হবে আত্মকর্তব্য। আমি চাই মুক্তি, আসক্তির চিরমুক্তি।"

ছন্ন ভিক্ষুর চিত্তগতি হলো পরিবর্তিত। দৃঢ়তার সহিত সম্যক্ সঙ্কল্পে চিত্ত করলেন নিবদ্ধ। ষড়েন্দ্রিয় সংযমে হলেন যত্নশীল। আধ্যাত্মিক ধ্যানে হলেন নিমগ্ন। সংযমের চরম পরিণতিতে অচিরেই হলেন তিনি তৃষ্ণা-মুক্ত। দুর্বহ ও সন্তপ্ত জীবন হলো শান্ত-মুক্ত। বিক্ষুব্ধ চিত্ত হলো অচঞ্চল, অশোক, বিরজ, ক্ষেম।

অর্হৎ ভিক্ষু ছন্ন আনন্দের নিকট উপনীত হয়ে প্রশান্ত কণ্ঠে বললেন--- "ভন্তে আনন্দ, এখন অপনোদন করুন আমার ব্রহ্মদণ্ড।"

আনন্দ বললেন প্রসন্ন মুখে---"বন্ধু ছন্ন, যে সময় তুমি অর্হৎ-ফল সাক্ষাৎ করেছো, তখনই ব্রহ্মদণ্ড থেকে মুক্ত হয়েছো।"

(বিঃ চুল্লবর্গে পঞ্চশতিক স্কন্ধ)

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

অন্তিম জীবন

১। ধর্ম সংবেগ---

মহামান্য আনন্দের জীবনে এক এক সময় এক একটা কারণ বশত তাঁর অন্তরে জেগে উঠেছিল বিবিধ প্রকার ধর্ম-সংবেগ। তাই তিনি সংবেগ পূর্ণ অন্তরের ভাবোচ্ছ্বাসে ব্যক্ত করেছিলেন এরূপ মর্মবাণী---

একদা দেবদত্তের পক্ষাবলম্বী ষড়বর্গীয় ভিক্ষুকে লক্ষ্য করে তিনি বলেছিলেন---

১। "পরদ্রোহী, ক্রূরভাষী, ভেদসৃষ্টিকারী, ক্রোধ ও মাৎসর্য পরায়ণ এবং তদ্বিষয়ে উৎসাহশীল, এরূপ অজ্ঞদের সহিত সংসর্গ বা বন্ধুত্ব করা পণ্ডিত ব্যক্তির উচিত নয়।

২। শ্রদ্ধাবান, প্রিয়শীল, প্রজ্ঞাবান ও বহুশ্রুতের সহিত পণ্ডিতদের সংসর্গ করা উচিত, সৎপুরুষ সংসর্গই শ্রেয়স্কর।"

এক সময় উত্তরা উপাসিকাকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন---

১। "যে দেহ বিচিত্র বস্ত্রালঙ্কারে সুন্দর দেখায়, সে দেহ নয় দ্বার বিশিষ্ট, অস্থি আশ্রিত, সতত ব্যাধি-কবলিত, নিত্য নব অনুরাগ-রঞ্জিত, অনিত্য ও অধ্রুব। এরূপ দেহের প্রতি সম্যকরূপে দর্শন করো।

২। এ দেহের অভ্যন্তরস্থ অস্থি ও ঘৃণিত পদার্থ সমূহ মসৃণ ত্বকাবৃত হয়েই সুন্দর দেখায় মাত্র, তাও ক্ষণিক। মনশ্চক্ষে ইহা প্রত্যক্ষ করো।

এ দেহ মণিকুণ্ডল বিভূষিত ও বিচিত্র বস্ত্রাচ্ছাদিত হয়েই শোভা পাচ্ছে।

৩। অলক্তক বিলেপিত চরণ, সুগন্ধচূর্ণমাখা মুখখানা অজ্ঞানীকে মোহিত করে মাত্র, নির্বাণ অন্বেষক ও কায়ে অশুভ দর্শীকে নয়।

৪। গণ্ডদেশে লম্বিত সুদৃশ্য কেশরাশি, অঞ্জনশোভিত নেত্র, কেবল অনুরাগীকেই মুগ্ধ করে, দুঃখ-পারাবার উত্তীর্ণ-কামীকে নয়।

৫। যেমন নূতন অঞ্জন-পাত্র বহির্ভাগেই কেবল দর্শনীয় চারুশিল্প-শোভিত, অথচ অভ্যন্তরভাগ কালিমাময়। সেরূপ পূতি-দেহ অলঙ্কৃত হলেই বহির্ভাগ মাত্র সুন্দর দেখায়, কিন্তু অভ্যন্তরভাগ বিষ্ঠা-মূত্রাদি বিবিধ ঘৃণিত অশুচি পদার্থে পরিপূর্ণ। এমন জঘন্য দেহ অনুরাগী অজ্ঞানীকেই মোহিত করে মাত্র, কিন্তু তৃষ্ণা-সমুদ্রের পরপার-যাত্রী সংসার-বিরাগীকে নয়।

৬। ব্যাধ জাল পেতে, লোভনীয় খাদ্যবস্তু তথায় রেখে মৃগের অপেক্ষায় আত্মগোপন করে থাকে; কিন্তু, সুচতুরমৃগ জাল স্পর্শ না করেই সেই সুখাদ্য আহারান্তে ব্যাধের ক্রন্দন উপেক্ষা করে চলে যায়।

৭। যদিও বা কোনো শক্তিশালী মৃগ জালাবদ্ধ হয়, তথায় কিন্তু, প্রদত্ত সুখাদ্য খেয়ে, জাল ছিন্ন করে মৃগ প্রস্থান করে, ব্যাধের অনুশোচনার প্রতি দৃক্‌পাত করে না।

অন্যত্র স্থবির গোপক ব্রাহ্মণের প্রশ্নোত্তরে বলেছেন---

১। "আমি তথাগত হতে শিক্ষা করেছি বিরাশি হাজার ধর্মস্কন্ধ এবং শারীপুত্রাদি শ্রাবকগণ থেকে শিক্ষা করেছি দু'হাজার ধর্মস্কন্ধ। এ চতুরশীতি সহস্র ধর্মস্কন্ধ আমার কণ্ঠে বিরাজ করছে।"

এক সময় বিদর্শন ও গ্রন্থধূর বিহীন প্রমাদ পরায়ণ জনৈক ভিক্ষুকে লক্ষ্য করে বলেছেন---

১। "ভাবনাবিহীন ও সদ্ধর্মে অশিক্ষিত প্রমাদ পরায়ণ ভিক্ষু বলীবর্দের মতো স্বীয় দেহ-মাংস বৃদ্ধি করে মাত্র, অথচ ওর প্রজ্ঞা বৃদ্ধি পায় না।"

একদা জনৈক হীনবীর্য ভিক্ষুকে লক্ষ্য করে বলেছেন--

১। "হেয় প্রতিপন্ন বা পরাভূত করার মনোবৃত্তি নিয়ে যে ভিক্ষু

অল্পশ্রুত ভিক্ষুকে অহঙ্কার বশে ধর্মোপদেশ প্রদান করে, সে ভিক্ষু ধর্মাচরণ-বিমুখ। যদিও বা সে বহুশ্রুত হয়, তবুও তাকে আমি প্রদীপধারী অন্ধতুল্য মনে করি।

২। বহুশ্রুতের সেবা ও পরিচর্যা করবে, হৃদয়ে ধারণ করবে শ্রুত বিষয়, এটা যেন ভুলে না যাও; ইহাই ব্রহ্মচর্যের মূল, এতেই হবে তুমি সদ্ধর্মের অধিকারী।

৩। ধর্ম-দেশককে পূর্বাপর বিষয়ে অভিজ্ঞ, অর্থজ্ঞ ও পদ-ব্যঞ্জনে হতে হবে সুদক্ষ। শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞায় অর্জন করতে হবে যথার্থ জ্ঞান এবং অভিনিবেশ সহকারে সবিচারে সম্যক্‌রূপে তা দর্শন করতে হবে।

৪। নিরন্তর হৃদয়ে জাগ্রত রাখবে ক্ষান্তি ও বিদর্শন ভাবনার ইচ্ছা। নাম-রূপে অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম-সংজ্ঞা উৎপন্ন করবে এবং তৎপ্রতি সর্বদা উৎসাহিত থাক্‌বে। নাম-রূপ যাতে সম্যক্ উপলব্ধি করতে পারো, তজ্জন্য যত্নবান হবে। চিত্তকে প্রগ্রহ (স্মৃতিরূপ রশ্মি-বদ্ধ) ও নিগ্রহ করবে। এতেই চিত্ত আধ্যাত্মিক বিষয়ে অভিনিবিষ্ট হয়ে থাকে।

৫। সম্বুদ্ধের শ্রাবকসংঘ ধর্ম ও বিজ্ঞান আকাঙ্ক্ষী এবং বহুশ্রুত, ধর্মধর ও প্রজ্ঞাবান। তাঁদের নিয়ত ভজনা করবে। মহর্ষি বুদ্ধের ধর্ম-কোষ রক্ষক বহুশ্রুত, ধর্মধর ভিক্ষু ত্রিলোকের চক্ষু স্বরূপ। ধর্মেরমিত, ধর্মরত, ধর্ম-চিন্তায় অভিনিবিষ্ট ও ধর্মানুসারী ভিক্ষু কখনও সদ্ধর্ম-চ্যুত হন না।

৬। কায়িক সুখে নিমগ্ন ভিক্ষু শীল-পূরণে উদ্যমহীন হয়। স্বীয় দেহের প্রতি আসক্তি পরায়ণ ভিক্ষু কিরূপে শ্রামণ্য-সুখ উপভোগ করবে?"

অগ্রশ্রাবক শারীপুত্র স্থবিরের পরিনির্বাণ সংবাদ শুনে তিনি এরূপ শোক প্রকাশ করেছিলেন---

১। "আমার পরম কল্যাণমিত্র শারীপুত্র স্থবিরের পরিনির্বাণ প্রাপ্তিতে আমার নিকট সমগ্র জগৎ অন্ধকারবৎ প্রতীয়মান হচ্ছে। আমি সদ্ধর্মের কোনও বিষয় উপলব্ধি করতে পারছি না। চিরাভ্যস্ত ধর্মও আমার স্মৃতিপথে জাগ্রত হচ্ছে না।

২। যার পরম সহায়রূপ শাস্তা গত বা পরিনিবৃত্ত হয়েছেন, তার

পক্ষে কায়গত-স্মৃতির মতো আর অন্য মিত্র নেই।''

অন্য সময় তিনি কল্যাণ-মিত্রের অভাবে এরূপ মর্মস্পর্শী অন্তর্নিহিত ভাব ব্যক্ত করেছিলেন---

১। ''প্রাচীন ও প্রবীণ কল্যাণ-মিত্রগণ অতীত হয়েছেন; নূতন ভিক্ষুদের সহিত আমার চিত্ত-সমতা হচ্ছে না। তাই আমি এখন বর্ষা-কালীন নীড়গত পক্ষীর মতো নির্জনে একাকী ধ্যানে নিরত রয়েছি।''

(থেরগাথায় আনন্দ বর্ণনা)

২। *পরিনির্বাণ লাভ—*

মহামহিম আনন্দ স্থবিরের বয়স এক শ' বিশ বৎসর পূর্ণ হতে চলল। তিনি অভিজ্ঞান প্রভাবে জানতে পারলেন—তাঁর পরমায়ু পরিক্ষীণ হয়ে এসেছে। আর মাত্র সপ্তাহ কাল। জনসাধারণের নিকট প্রকাশ করলেন তিনি একথা। যথাসত্বর এবার্তা প্রচারিত হল সর্বত্র। সকল দিক থেকেই কেবল শোনা যেতে লাগল শোক সূচক কাতর হাহাকার ধ্বনি; মর্মন্তুদ ক্রন্দন রোল। আপামর সর্বসাধারণের কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে কেবল একই প্রকার খেদোক্তি---''মহামান্য আনন্দ আমাদের অনাথের নাথ, অশরণের শরণ, গতিহীনের গতি, নিরানন্দের আনন্দ, মর্মদাহের স্নিগ্ধ-সুধা, দুঃখিতের শান্তি-নির্ঝর, করুণার মূর্তপ্রতীক, বুদ্ধের পরিবর্তে বুদ্ধ স্বরূপ। তাঁর বিচ্ছেদে আমরা হবো সর্বহারা দিশাহারা, দীপহারা, চক্ষুহারা।''

পূজার্হ আনন্দ তখন অবস্থান করছিলেন রোহিণী নদীর* তীর সন্নিধান জনপদে। নদীর উভয় তীরস্থ জনপদবাসী তাঁদের অবাঞ্ছিত মর্মবিদারক এ সংবাদ শ্রবণে হলেন মুহ্যমান। আনন্দ অবস্থান করছেন যে স্থানে, সেখানকার লোকেরা এরূপ আলোচনায় হলেন প্রবৃত্ত---''আনন্দ-নির্ঝর

* রোহিণী নদীর বর্তমান নাম 'কোহন' নদী। শাক্যরাজ্য ও কোলীয় রাজ্যের মধ্যস্থলে প্রবাহিত হচ্ছে রোহিণী নদী। এ স্রোতস্বিনী উভয় রাজ্যকে করেছে সমৃদ্ধ। এর এক তীরে হল আনন্দের পিতৃবংশ, অপর তীরে মাতৃবংশ।

আনন্দ ছিলেন আমাদের কল্যাণ-নিদান, মহা উপকারী। আমরাও তাঁর হিতকামী ও উপকারী। সুতরাং তিনি আমাদের গ্রামেই পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হবেন। আমরাই তাঁর পূত-দেহের সম্পাদন করবো যথোপযুক্ত সৎকার। মহাচৈত্যে সগৌরবে নিধান করবো তাঁর শারীরিক ধাতু।" অপর তীরবাসীরাও ঠিক একইরূপ আলোচনায় হলেন প্রবৃত্ত।

দিব্যদর্শী আনন্দ উভয় তীরবাসী জনবৃন্দের আলোচনা ও ঐকান্তিক বাসনা সম্বন্ধে অবগত হয়ে চিন্তা করলেন---"সত্যই, উভয় কুলের উপাসক-উপাসিকাগণ আমার মহোপকারক। এখানে যদি আমি পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হই, তা হলে অপর তীরবাসীরা আমার শারীরিক-ধাতু গ্রহণের জন্য বিবাদ সৃষ্টি করবে। পরতীরে নির্বাণ প্রাপ্ত হলেও একই অবস্থা সংঘটিত হবে। আমাকে হেতু করে কলহের সৃষ্টি হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। সমদর্শী হয়ে আমাকে ন্যায় পথ অবলম্বন করতে হবে। এ মহা পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠে এমন কোনও স্থান নেই, যেখানে আমার একাধিকবার মৃত্যু এবং শ্মশান হয় নি। *

---

* মৃত্যু সম্বন্ধে এরূপ কথা বহুস্থানে দৃষ্ট হয়। ধর্মপদার্থকথায়---একদা বুদ্ধ পর্বত-শিখরে দাঁড়িয়ে অর্হৎ শ্রামণ বনবাসী তিষ্যকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন---"তিষ্য, এই গিরি-কন্দরে অবস্থান সময়ে তোমার মনে কিরূপ ভাবোদয় হয়?" "প্রভু, অতীত জন্মে এখানে আমার মতদেহ কতোবার যে, নিক্ষিপ্ত হয়েছিল, তার ইয়ত্তা নেই। এ কথা ভেবে আমার অন্তর সংবেগ-ক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে।" বুদ্ধ সপ্রশংসবাক্যে বললেন---"সাধু, সাধু তিষ্য, এরূপই। এ মহাপৃথিবীতে এমন কোনো স্থান নেই, যেখানে তোমার মৃত্যু বা শ্মশান হয়নি।"

থেরী গাথায়---কোশল রাজের অন্যতমা মহিষী উবিরী একমাত্র শিশুকন্যা জীবার মৃত্যুতে শোকাকুলা হয়ে প্রত্যহ শ্মশানে গিয়ে 'মা জীবা, মা জীবা' বলে বিলাপ করতে লাগলেন। একদা বুদ্ধ শ্মশানে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন---"রাজমহিষি, কেন তুমি 'মা জীবা, মা জীবা' বলে কেঁদে বেড়াচ্ছো? শান্ত হয়ে আমার কথার উত্তর দাও---এ শ্মশানে তোমার সহস্র সহস্র জীবা নাম্নী কন্যা ভস্মীভূতা হয়েছে, তোমার কোন জীবার জন্য কাঁদছো?" একথা শুনেই রাণীর অর্ন্তদৃষ্টি ফুটে ওঠল।

উপসার জাতকে (১৬৬) জনৈক শ্মশান-শুদ্ধিক ব্রাহ্মণ ও উপসার নামক ব্রাহ্মণের শ্মশান-নির্বাচন প্রসঙ্গে বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের উক্ত প্রকারের উক্তিই দৃষ্ট হয়।

এ জগতে ভূপৃষ্ঠ নিয়েই যত সব বাদ-বিসম্বাদ। এবিবাদের হেতুও হচ্ছে তাই। সুতরাং ধরাপৃষ্ঠ বর্জন করে আমাকে শূন্যের আশ্রয় নিতে হবে; যেখানে ইতিপূর্বে কোনও দিন আমার মৃত্যু বা শ্মশান হয় নি। এতেই উৎপাটিত হবে কলহের মূল কারণ এবং সাম্য ও শান্তি ভাবের মধ্য দিয়েই সংঘটিত হবে আমার নির্বাণ প্রাপ্তি।" এ সিদ্ধান্তের পর উভয় তীরের জনপদবাসীকে আহ্বান করে তিনি করুণাসিক্ত বাক্যে বললেন---"হে উভয় তীরবাসী উপাসক-উপাসিকাগণ, আপনারা সপ্তম দিবসে আপনাদের গ্রাম সন্নিহিত তটভূমিতে পরস্পর মৈত্রীচিত্তে সম্মিলিত হবেন। দীর্ঘদিন আপনাদের শিক্ষা দিয়েছি, তথাগত বুদ্ধের প্রশংসিত---মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষাধর্ম। আপনারা গরিষ্ঠ মুক্তিপ্রদ সদ্ধর্মের উপাসক। আমার অন্তিম দিবসে আপনাদের দেখতে চাই সত্য-সুন্দর নৈর্বাণিক-ধর্মের পূজারীরূপে। আপনারা আমার অন্তিম নির্দেশ সুরক্ষায় অবহিত হোন্।" এ বলে তিনি মৈত্রীর অপূর্ব মহিমা সম্বন্ধে বর্ণনা করলেন। মহামান্য আনন্দের মৈত্রীময় অন্তিম-বাণী শুনে সমবেত জনসংঘের অন্তরে পরস্পরের প্রতি মৈত্রীভাবের সঞ্চার হল। অনুপম মৈত্রীর অমিয-ধারায় তাঁদের হৃদয় সিক্ত-প্লাবিত হল। অন্তর হল সংবেগ-কাতর, চক্ষু হল সজল।

* * * * *

অনুক্রমে সমাগত হল সেই সপ্তম দিবস। ক্ষীণাস্রব আনন্দের আজ অতি শুভদিন। আজ হবেন তিনি পঞ্চ স্কন্ধের ভারমুক্ত। চিরতরে হবেন নির্বাপিত। শূন্য, অচ্যুত, অসংস্কৃত ও অনন্তে হবেন উপনীত। তাই তাঁর পক্ষে আজ বড়ো শুভদিন, পরম আনন্দের দিন।

কিন্তু, আজ জনসাধারণের পক্ষে অতি দুর্ভাগ্যের দিন, বড়ো শোক-পরিতাপের এবং নিরানন্দের দিন বলেই মনে হচ্ছে। তাই আজ

সকলের মুখই বিমর্ষ। সকলেই কেঁদে কেঁদে ছুটে আসছেন রোহিণী-নদীর তীর-ভূমিতে। তাঁদের পরমারাধ্য কারুণিক, ধর্মগুরু, নিয়ামক, মহামান্য আনন্দ স্থবিরকে আজ দর্শন করবেন শেষবারের তরে। শোকাকুল অন্তরে বিদায় দেবেন, চির-বিদায়।

নদীর উভয় তীরে হল অগণিত লোকের ভিড়। স্বদেশ-বিদেশ, দূর-দূরান্তরের ভক্তবৃন্দ আবালবৃদ্ধ-বনিতা আপামর সর্বসাধারণের সমাগমে নদীর উভয় দিক প্রতীয়মান হচ্ছে জন-সমুদ্রের মতো। সকলেই সজল-নেত্রে, আকুল-অন্তরে, নিশ্চল-নিস্তব্ধ হয়ে অবস্থান করছেন সেই হৃদয়-বিদারক অন্তিম মুহূর্তের প্রতীক্ষায়।

যথাসময়ে শান্ত, সুসংযত, মহিমাময় ও প্রিয়দর্শন ক্ষীণাস্রব আনন্দ ধ্যানবলে আকাশ-পথে এসে নদীর ঠিক মধ্যস্থলে সপ্ততাল পরিমাণ উচ্চে নভোমণ্ডলে স্থির হয়ে পদ্মাসনে সমাসীন হলেন। তখন সকলেই অন্তিম বন্দনা করলেন অষ্টাঙ্গ লুটিয়ে। উজ্জ্বল প্রভামণ্ডিত প্রসন্নমুখে মধুর-স্বরে তিনি সকলকে করলেন আশীর্বাদ। তারপর স্নিগ্ধ-মধুর উদাত্তকণ্ঠে মর্ম-স্পর্শী অন্তিম-বাণী পরিবেষণ করলেন---সংক্ষিপ্ত অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্মের সাবলীল হৃদয়গ্রাহী নিগূঢ়-তত্ত্ব। দেশনা-বিলাসের মাধ্যমে সকলের নিকট তিনি বিদায় নিলেন চিরতরে, শেষ বিদায়।

এ অন্তিম সময়ে তিনি তাঁর অন্তর্নিধি তথাগত বুদ্ধকে স্মরণ করে স্বগত বলে ওঠলেন---"অনন্যসাধারণ শাক্যমুনি এখন আমার সুপরিচিত; শাস্তা-শাসনে আমি হয়েছি কৃতকার্য, হয়েছি চিরমুক্ত পঞ্চস্কন্ধের গুরুভার বহন থেকে, চিরতরে নিরবশেষ নিরুদ্ধ হয়ে গেছে আমার পুনর্জন্ম।"

এবার নীরব হলেন মহামান্য আনন্দ। সমাহিত চিত্তে করলেন এরূপ অধিষ্ঠান---"আমার দেহের ঠিক মধ্যস্থলে সমভাগে বিভক্ত হয়ে শারীরিক ধাতু উভয় তীরে পতিত হোক।" এ সংকল্পের পর তিনি ধ্যানে নিমগ্ন হলেন। পরিশেষে 'তেজঃকসিন' ভাবনায় চিত্ত সংযোগ করলেন। ধ্যানের অচিন্তনীয় মহাশক্তির প্রভাবে অগ্নি জ্বলে ওঠল। অনল প্রাদুর্ভূত হবার প্রারম্ভেই তিনি পরিনির্বাপিত হলেন। সংযোগ মাত্রই বিয়োগের

অধীন। 'অনুপাদিশেষ* পরিনির্বাণে নির্বাপিত হলেন পূজার্হ আনন্দ।

তখন ভিক্ষুসংঘ সংবেগপূর্ণ অন্তরে বলে ওঠলেন ---"বহুশ্রুত, ধমধর, মহর্ষি বুদ্ধের জ্ঞানভাণ্ডার-রক্ষক, ত্রিলোকের চক্ষু আনন্দ পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হলেন।"

অপূর্ব ও অচিন্তনীয় অবস্থায় দগ্ধ হল মহামান্য আনন্দের পুণ্য-পূতদেহ। সঙ্কল্পানুযায়ী দেহের ঠিক মধ্যস্থলে দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে সমুজ্জ্বল পবিত্র পুণ্যময় শারীরিক ধাতু+ পতিত হল আশ্চর্যরূপে উভয় তীরে। সুসজ্জিত-সুবাসিত স্বর্ণাধারে এসে অধিষ্ঠিত হল পুণ্য-ঋদ্ধ প্রভাবশালী শারীরিক ধাতু।

---

* "রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান" এ পঞ্চস্কন্ধের নিরবশেষ নিবৃত্তি বা অবিদ্যমানতা।

+ধাতু চতুর্বিধ, যথা---পৃথিবী, অপ্, তেজঃ ও বায়ু ধাতু। এর অপর নাম চতুর্মহাভূত। মানবদেহ, তথা প্রাণীজগৎ ও জড়জগতের সব কিছুই চার ধাতুর সমষ্টিমাত্র। যে কোনো একটা ধাতুর অবিদ্যমানে জগতে কিছুরই অস্তিত্ব সম্ভব নয়। সম্যক্ সম্বুদ্ধ, পচ্চেকবুদ্ধ ও অর্হৎ, এ তিন পুণ্যপুরুষের পূতদেহ দগ্ধ হয়ে ভস্মের পরিবর্তে এক প্রকার যা উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় পদার্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বর্তুলাকারে পরিণত হয়, তা'ই 'শারীরিক ধাতু' নামে অভিহিত হয়। সুতরাং এ বস্তুকে আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে 'ধাতু' বলাই বিধেয়। বুদ্ধের ভাষায় একে 'ধাতু' বলা হয়েছে। 'ধাতু' বলতে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব মূলক একটা ভাব এসে চিত্তকে ভাব-প্রবণ করে তুলে। ধাতু অথবা অষ্ট-কলাপের বিশ্লেষণ করতে গেলে, কতো যে গভীর-তত্ত্বে উপনীত হতে হয়, তা তত্ত্ব-জ্ঞানীদেরই উপলব্ধির বিষয়। এমন আধ্যাত্মিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সাধারণ জ্ঞানের অনেক ঊর্ধ্বে। অতএব শারীরিক ধাতুকে অস্থি বা পূতাস্থি বলা ঠিক নয়। ধাতু যে অস্থি নয়, কেবল তা নয়; অস্থির অস্তিত্ব লোপ পেয়ে ভিন্ন পদার্থে পরিণত হয়েছে। দুধ যেমন দধি, ঘোল, মাখন ও ঘৃতাদিতে পরিণত হয়, একে যেমন আর দুধ বলা হয় না, ঠিক সেরূপ ত্রিবিধ ক্ষীণাস্রবের দৈহিক যাবতীয় পদার্থ দগ্ধ হয়ে, যেই অসাধারণ বিস্ময়কর বস্তুর সৃষ্টি হয় একে 'ধাতু' না বলে, অস্থি বলা কতদূর সমীচীন, সত্য-সন্ধানী অভিজ্ঞ ব্যক্তিদেরই তা বিচার্য। ভগবান বুদ্ধের অখণ্ড-ধাতু সাতটা, যথা—চারটা দন্ত ধাতু, দু'টা অক্ষক ১ ধাতু ও একটা উষ্ণীষধাতু। অন্যসব খণ্ডধাতু।

১। পালিতে—অক্খক, ইংরেজীতে—Collar-bone, বাংলায়—কণ্ঠাস্থি।

তখন জনসমুদ্রের মধ্যে গভীর ক্রন্দন-ধ্বনি উত্থিত হল, সমুদ্রের কল্লোল-ধ্বনির মতো। উঃ, সে কী ক্রন্দন, পৃথিবী যেন বিদীর্ণ হতে চায়! আকাশে-বাতাসে ধ্বনিত হল মেঘমন্দ্রসম ক্রন্দন-রোল। বুদ্ধের পরিনির্বাণ সময়ে যেরূপ উত্থিত হয়েছিল মহাক্রন্দনের রোল, আনন্দ স্থবিরের পরিনির্বাণ দিবসে ততোধিক হয়েছিল শোকোচ্ছ্বাসপূর্ণ বিলাপ-ধ্বনি; হয়েছিল তদপেক্ষা অধিকতর করুণ ও হৃদয়-বিদারক। চারমাস অনবরত কেঁদে কাটিয়েছেন ভক্তবৃন্দ। কাতরকণ্ঠে তাঁরা করেছিলেন এরূপ পরিদেবন---"ভগবান বুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে ছায়াসম বিচরণকারী, প্রধান সেবক আনন্দ বিদ্যমান ছিলেন যতদিন, ততদিন আমাদের মনে হয়েছিল বুদ্ধই যেন স্বয়ং বিদ্যমান আছেন। কিন্তু, আনন্দের তিরোধানে এখন মনে হচ্ছে, সত্যই নির্বাপিত হয়েছেন শাক্যমুনি, নিবে গেছেন চিরতরে। সে সঙ্গে আমরাও হয়েছি---অনাথ, নিরাশ্রয়।"

আনন্দের পরিনির্বাণ প্রাপ্তির এরূপ উজ্জ্বল নিদর্শন জগতে অপূর্ব ও অদ্বিতীয়। একমাত্র পূজার্হ আনন্দ ব্যতীত আকাশে পরিনির্বাণ লাভ করেছেন, এমন আর কাঁ'কেও এ বুদ্ধ-শাসনে দেখা যায় না। যে শূন্যে আমিত্বের ছাপ পড়েনি, সে শূন্যের আশ্রয় নিয়ে শূন্য-পদ প্রাপ্ত আনন্দ অতি সূক্ষ্ম বুদ্ধিরই পরিচয় দিয়েছেন। মৈত্রীর মূর্ত-প্রতীক, সমদর্শী, শান্ত, মুক্ত ও শূন্যাশ্রয়ী আনন্দ ধরাপৃষ্ঠ ত্যাগ করে সকল দিক দিয়েই সাম্য, মৈত্রী ও কল্যাণ বিধান করলেন।

জনসাধারণ চার মহাপথের মিলন-স্থানে অর্হৎ আনন্দের পবিত্র শারীরিক-ধাতু মহাসমারোহে নিধান করলেন। তদুপরি নির্মাণ করলেন সুদৃশ্য মহা-চৈত্য। পুণ্যকামী জনগণ প্রতিদিন বিবিধ পূজোপচারে পুণ্যপ্রসূ পবিত্র ধাতুচৈত্য পূজায় রত হলেন।

(ধর্মপদার্থকথায় বনবাসী তিষ্য স্থবিরের কাহিনী)

৩। অর্হতের দেহাবশেষ---

'অরি'কে যিনি হত-নিহত করেছেন, তিনিই অর্হৎ নামে অভিহিত হন। কোন্ অরি? নির্বাণ পথের প্রধান অন্তরায় অবিদ্যা-প্রসূত ক্লেশরাশি। যে ক্লেশরাশির পট-ভূমিকা হতে মানুষ সকল প্রকার পাপানুষ্ঠানে আত্মনিয়োগ করে। সে ক্লেশরাশি হল---লোভ, দ্বেষ, মোহ, মান, মিথ্যা-দৃষ্টি, সন্দেহ, স্ত্যান, ঔদ্ধত্য, পাপে নির্লজ্জতা ও নির্ভয়তা। এই অরি সমূহ প্রজ্ঞোস্ত্রে যিনি হত করেছেন, তিনিই অর্হৎ। এসব অরি অবিদ্যা-প্রসূত। অবিদ্যাই জাগতিক সর্ব দুঃখের মূলাধার। অবিদ্যা থেকে যিনি বিমুক্ত হয়েছেন, তিনিই অর্হৎ আখ্যায় আখ্যায়িত হন।

এবম্বিধ গুণ-গরিমা মণ্ডিত অর্হৎই আহ্বনীয়, প্রাপণীয়, দাক্ষিণ্য ও প্রাঞ্জলিক বন্দনার যোগ্যপাত্র। এমন বিশুদ্ধাত্মা অর্হতের দেহাবশেষ বা শারীরিক ধাতুও পবিত্র এবং পুণ্য-প্রসূ। অর্হতের শারীরিক ধাতু, যা বর্তমান জগতে পূতাস্থিরূপে পূজিত হচ্ছে, সেই ধাতুকে পূজা ও বন্দনায় মহাপুণ্য সঞ্চিত হয়।

অর্হতের পবিত্র দেহাবশেষ পূজা করার সময়ে, অর্হতের গুণাবলী স্মরণ করতে হয়। শুদ্ধাত্মা মহাপুরুষের সদ্‌গুণরাশি স্মরণে, অন্ততঃ সে সময়ের জন্য হলেও চিত্ত হয় অলোভ, অদ্বেষ ও অমোহ-পরায়ণ এবং অনাবিল আনন্দে হয় অন্তর পরিপূর্ণ। এরূপ মননে হয় চিত্তশুদ্ধি, অঞ্জলি কর্মে হয় হস্ত-শুদ্ধি, প্রীতি-নেত্রে দর্শনে হয় চক্ষুশুদ্ধি, গুণাবলী উচচারণে ও ভাষণে হয় বাণী ও কণ্ঠশুদ্ধি এবং বন্দনায় হয় আপাদমস্তক সর্বাঙ্গ শুদ্ধি। এরূপ বিশুদ্ধ ও পুণ্যময় শরীরই হয় নীরোগ, নিরাময়, সুন্দর ও সুলক্ষ্মণযুক্ত। পুণ্য-প্রভাব মণ্ডিত মানুষই শ্রদ্ধার পাত্র। তাঁদের জীবনেই আসে অনাবিল সুখ-শান্তি। তাঁরাই হন সুগতি এবং নির্বাণের অধিকারী।

সমাপ্ত

With bad advisors forever left behind,
From paths of evil he departs for eternity,
Soon to see the Buddha of Limitless Light
And perfect Samantabhadra's Supreme Vows.

The supreme and endless blessings
of Samantabhadra's deeds,
I now universally transfer.
May every living being, drowning and adrift,
Soon return to the Pure Land of Limitless Light!

⁕ The Vows of Samantabhadra ⁕

I vow that when my life approaches its end,
All obstructions will be swept away;
I will see Amitabha Buddha,
And be born in His Western Pure Land of
Ultimate Bliss and Peace.

When reborn in the Western Pure Land,
I will perfect and completely fulfill
Without exception these Great Vows,
To delight and benefit all beings.

⁕ The Vows of Samantabhadra Avatamsaka Sutra ⁕

DEDICATION OF MERIT

May the merit and virtue
accrued from this work
adorn Amitabha Buddha's Pure Land,
repay the four great kindnesses above,
and relieve the suffering of
those on the three paths below.

May those who see or hear of these efforts
generate Bodhi-mind,
spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
and finally be reborn together in
the Land of Ultimate Bliss.
Homage to Amita Buddha!

NAMO AMITABHA

南無阿彌陀佛

《孟加拉文：阿難的生平》

財團法人佛陀教育基金會 印贈
台北市杭州南路一段五十五號十一樓
Printed and donated for free distribution by
The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation
11F., 55 Hang Chow South Road Sec 1, Taipei, Taiwan, R.O.C.
Tel: 886-2-23951198 , Fax: 886-2-23913415
Email: overseas@budaedu.org
Website: http://www.budaedu.org

This book is strictly for free distribution, it is not for sale.
এই বই সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বিতরণের জন্য, বিক্রয়ের জন্য নহে।

Printed in Taiwan
3,000 copies; April 2011
BA007 - 9256